১ম খণ্ড

ড. রাগিব সারজানি

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস



অনুবাদ

আবু মুসআব ওসমান

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

ড. রাগিব সারজানি

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শুরু থেকে ত্রিপোলির পতন

অনুবাদ

আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
মূল গ্রন্থ : কিস্‌সাতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ (قصة الحروب الصليبية)
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ-১৪৪১/জুলাই-২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জিলকদ-১৪৪১/জুলাই-২০২০

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
প্রচ্ছদ : গ্রাফিক্স টিম মাকতাবাতুল হাসান
ISBN : 978-984-8012-53-6

মূল্য : ৬০০/- টাকা মাত্র

Crusade Juddher Itihash [1st part]
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

।। অর্পণ ।।

হে নাবিক!
তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি-মাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর-জলে।

বিষয় সূচি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপ পরিস্থিতি-৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম ক্রুসেড অভিযানের প্রচারণা-৯৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে ক্রুসেডার বাহিনী-১২৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোমান সেলজুকদের সঙ্গে সংঘর্ষ-১৪৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক!-১৭৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এবার লক্ষ্যবস্তু আল-কুদস!-২২১

নবম পরিচ্ছেদ

বাইতুল মুকাদ্দাস পতনপরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ-২৬৯

দশম পরিচ্ছেদ
সহায়ক ক্রুসেডার বাহিনী-২৯৩

একাদশ পরিচ্ছেদ

উত্তর ইরাকের দিগন্তে আলোর উদ্ভাস!-৩৪৩

মানচিত্র সূচি

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে অবশেষে '*ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*'-এর প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে আমরা প্রত্যেকে এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, প্রতিটি কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হয়। সবাই মিলে শত চেষ্টা করলেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা সম্পাদন করতে পারে না; পুরো পৃথিবী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেও নির্ধারিত সময়ের পর তা আটকে রাখতে পারে না। তিনি না চাইলে গাছের পাতাও নড়ে না; তিনি হুকুম করলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তাই আমরা মনে করি, '*ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*' তার নির্ধারিত সময়েই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।

ক্রুসেড যুদ্ধ মানে খ্রিষ্টধর্মের প্রতীক ক্রুশের মর্যাদা তথা ধর্মের মর্যাদা রক্ষার লড়াই। কিন্তু আসলে কি তাই?! সম্ভবত এটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ প্রতারণা! ইতিহাস-পাঠকদের প্রিয় লেখক ড. রাগিব সারজানি তার স্বভাবসুলভ বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা বা ক্রুশ প্রতীকের মর্যাদা রক্ষা নয়; বরং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চাহিদা ও ক্ষমতার লিপ্সা চরিতার্থ করতেই মূলত ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুগে যুগে ক্রুসেডের দোহাই দিয়ে ইসলামি ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়েছে। প্রতিটি সচেতন মুসলমানের এ ইতিহাস জানা জরুরি। কারণ, ইতিহাস শুধু অতীতের ভালো-মন্দ ঘটনার বিবরণ পরিবেশন করে না, আমাদের আগামী দিনের সঠিক কর্মপন্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

এখন পর্যন্ত মূল আরবি গ্রন্থটির কেবল প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কিছু সময়ের আলোচনা এসেছে। বইটির অনুবাদ বেশ আগে শুরু হলেও ১৪৩৯ হিজরি সনের রমজান মাসে (২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে) আমরা জানতে পারি, ড. রাগিব সারজানি পরবর্তী ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর ইতিহাস সংকলনের কাজও দ্রুত শেষ করবেন এবং

মোট 'পাঁচ খণ্ডে' বইটি প্রকাশ করবেন।[১] তখন পাঠকদের হাতে পুরো বইটি একসঙ্গে তুলে দেওয়ার ইচ্ছায় আমরা প্রথম খণ্ডটির কাজ স্থগিত রাখি। কিন্তু ড. সারজানি তার চলমান প্রকল্প *'কিসসাতুস সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ'*-এর কাজে ধারণার চেয়েও অনেক বেশি সময় ব্যয় করায় গত দুই বছরেও ক্রুসেডের কাজটি সমাপ্ত করতে পারেননি।[২] এদিকে মাকতাবাতুল হাসানের শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ এবং বাংলা ভাষাভাষী ইতিহাস-অনুরাগী পাঠকবৃন্দ বইটি প্রকাশ করার জন্য বারবার আমাদের তাগাদা দিয়ে আসছিলেন এবং বিভিন্নভাবে অনুবাদক, প্রকাশক ও মাকতাবাতুল হাসান-সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে বইটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। সন্দেহ নেই, তাদের এই আস্থা ও ভালোবাসায় আমরা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

অবশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ব্যাপক চাহিদার প্রতি লক্ষ করে আপাতত মূল গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের অনুবাদ দুই ভলিয়মে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, বাকি খণ্ডগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর সেগুলোর অনুবাদও মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষ থেকে দ্রুততম সময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে তার আগ পর্যন্ত পাঠক যেন পরবর্তী ক্রুসেডগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেতে পারেন, এ লক্ষ্যে মাকতাবাতুল হাসানের সম্পাদনা-পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরবর্তী ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 'পরিশিষ্ট' শিরোনামে দ্বিতীয় ভলিয়মের শেষে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এটি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা মাত্র!

এ ছাড়াও সম্পাদনা-পর্ষদের পক্ষ থেকে বইয়ের শেষে দুটি নির্ঘণ্ট যুক্ত করা হয়েছে। পুরো বইয়ের বিভিন্ন স্থানে যেসব স্থানের পরিচিতি আলোচনা করা হয়েছে, প্রথম নির্ঘণ্টে সেগুলোর একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে যেকোনো অনুসন্ধানী পাঠক কাঙ্ক্ষিত স্থানের পরিচয় দ্রুত অতি সহজে বের করতে পারবেন। দ্বিতীয় নির্ঘণ্টে পুরো বইয়ে

---

১. ড. রাগিব সারজানি তার এক সরাসরি সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। পুরো সাক্ষাৎকারটি এ লিংকে পাওয়া যাবে : https://bit.ly/3bMV6z8 ।

২. বইটি *'মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ'* নামে শীঘ্রই মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। বইটির শুরুতে ড. রাগিব সারজানি তার এ কাজে বিলম্বের কারণও উল্লেখ করেছেন।

বারবার আলোচিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে বইটি অধ্যয়ন করার সময় হঠাৎ কোথাও কোনো ব্যক্তির নাম আসার পর তার পরিচয় মনে না আসলে পাঠক নির্ঘন্টটির সহায়তায় দ্রুত বিষয়টি জানতে পারবেন। আরবি কিতাবাদিতে এ জাতীয় 'ফাহারিস' বা নির্ঘন্ট প্রদান অতি স্বাভাবিক হলেও বাংলায় এখনো প্রচলিত নয়। আশা করি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের এ প্রয়াসকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন।

ইতিহাসগ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও স্থানের নামে সঠিক উচ্চারণ তুলে আনা সব সময়ই একটি জটিল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা এ বিষয়ে যথাসম্ভব সঠিক থাকার চেষ্টা করেছি। এরপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া একান্তই স্বাভাবিক। আমাদের প্রত্যাশা, প্রিয় পাঠকবৃন্দ আমাদের অন্যান্য বইয়ের মতো '*ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*'-এর ক্ষেত্রেও আলোচনা-সমালোচনা, মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন।

বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন সময়ের জনপ্রিয় তরুণ লেখক-অনুবাদক সাদিক ফারহান। আল্লাহ তাআলা অনুবাদকদ্বয়, প্রকাশক ও সম্পাদনা-পর্ষদসহ বইটি প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে ইখলাস ও একনিষ্ঠতার গুণ দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অতীত ইতিহাস হতে শিক্ষা নিয়ে আদর্শ আগামী বিনির্মাণের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দান করুন। রাব্বে কারিম সবাইকে সুস্থ-সুন্দর জীবন দান করুন। আমিন।

—আবু মুসআব ওসমান

২৭ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরি

লেখকের ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রই জানেন যে, কোনো একটি চিন্তাধারা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার বা কোনো একটি মর্মকে পাঠক ও শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঘটনা বর্ণনার ধারা অন্যতম মৌলিক রীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। পবিত্র কুরআনের চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, কুরআনে যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো না কোনো শিক্ষা-উপদেশ বা কল্যাণবার্তা ধারণ করেই উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন বিভিন্ন ঘটনাকে এমনভাবে চিত্রায়িত করেছে যে, ঘটনাগুলোকে আমাদের যাপিত জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়। পাঠক ভাবতে থাকেন—তিনি যেন স্বচক্ষে ঘটনাপ্রবাহ অবলোকন করছেন। মনে হয়—আরে! এদেরকে তো আমি চিনি! ব্যক্তিজীবনে তো এদের সঙ্গেই আমার ওঠা-বসা, সহাবস্থান; নামগুলোই শুধু ভিন্ন! আমাদের সমাজের অমুক ব্যক্তির আচরণ তো এই ঘটনার ফেরাউনের ন্যায়! অমুকের আচরণ কারুনের ন্যায়! আচরণে-উচ্চারণে অমুক যেন তালুতেরই প্রতিচ্ছবি আর অমুকের চরিত্রে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে জুলকারনাইনের কর্মধারা! জীবনের নির্দিষ্ট একটি অঙ্গনে অমুক জাতির কর্মকাণ্ড যেন বনি ইসরাইলের মতো আর অমুক গোষ্ঠীর মাঝে যেন পাওয়া যাচ্ছে কুরআনে বর্ণিত ছামুদ জাতির আচার-আচরণ!

আমাদের বাস্তব জীবন ও জীবনযাত্রায় আমরা যা কিছু দেখি, সবকিছুরই সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত রয়েছে আল-কুরআনে। তাই যে জীবনপদ্ধতি আমাদের অনুসরণ করা উচিত, আল-কুরআন তার সুস্পষ্ট দলিল ও নির্দেশক। আর সেই পদ্ধতির পুরোটাই কুরআনে বিবৃত হয়েছে ঘটনা বর্ণনার শৈলীতে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ঘটনা ও ইতিহাস বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾

সুতরাং আপনি (তাদেরকে) এসব ঘটনা শোনাতে থাকুন, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আ'রাফ : ১৭৬]

বিশ্ব মানবতার ইতিহাস এক অমূল্য জ্ঞানসম্পদ। মানব-ইতিহাসে আছে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার নির্যাস। একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জন্য এমন ভুল করা মোটেও সমীচীন নয়, যা পূর্ববর্তী কেউ করেছে। নিষ্কৃতির উপায় সামনে থাকা সত্ত্বেও জীবনে চলার পথে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়া বিবেচিত হয় মহা অন্যায় হিসেবে।

আপন ইতিহাস ও মানবেতিহাসকে তুচ্ছজ্ঞান করার কারণে মুসলিম উম্মাহ যুগে যুগে বহুবার পথ হারিয়েছে। বরং আরও অনুতাপের বিষয় হলো, জাতির কোমলমতি সন্তানরা যখন আপন জাতির ইতিহাস পাঠের মনস্থ করে, তখন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ইতিহাস বিকৃতকারী লেখকদের রচিত ইতিহাস; যাতে তারা যুক্ত করেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জাল-বানোয়াট গল্প-কাহিনি, বিকৃত করেছে তথ্য-উপাত্ত, বদলে দিয়েছে প্রকৃত ঘটনা ও ঘটনাপ্রবাহ। ফলে ইতিহাসের সৎ চরিত্র পরিণত হয়েছে অসৎ চরিত্রে, অন্যায়ের দোসর পরিণত হয়েছে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিতে! এভাবে ঘটনা ও ইতিহাসের শিক্ষা ও মর্ম বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে মূল উপদেশ ও দীক্ষার মর্মবাণী; মুসলিম উম্মাহ হারিয়ে ফেলেছে তাদের অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা ইসলামি ইতিহাসের প্রতিটি দিক নিয়ে সমৃদ্ধ অধ্যয়নের এক প্রচারণা ও আন্দোলন শুরু করব। এর মাধ্যমে আমরা উল্লিখিত সীমালঙ্ঘনসমূহের সংশোধন ও প্রতিকারবিধান করতে পারব এবং প্রতিটি বিষয়কে সঠিকভাবে জানতে পারব। আর ইনশাআল্লাহ এ পথ ধরেই আমরা এই সুবিশাল জ্ঞানসম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারব।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তেমনই একটি কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের সঠিক বিবরণ জানা এবং এ সম্পর্কিত ভুল ধ্যান-ধারণার অপনোদনের লক্ষ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস। 'ক্রুসেড যুদ্ধ' ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। অতীত ইতিহাস ও আমাদের যাপিত জীবনের বাস্তবতা—উভয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এ ইতিহাস অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। অর্থাৎ ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বর্তমান জীবনের গতিধারা অনুধাবনের জন্যও।

বেশ কিছু কারণে আমরা ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে বেছে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো—

[এক]

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস কেবল ইসলামি ইতিহাস নয় বরং মানবেতিহাসেরই একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের বিবরণ। এর ব্যাপ্তি দুইশ বছরেরও অধিক। অর্থাৎ ইসলামি ইতিহাসের এক-সপ্তমাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এই ইতিহাস। ইসলামি ইতিহাসের অধ্যয়ন যদি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তাহলে এই সময়ের ইতিহাস অধ্যয়ন নিশ্চিত করেই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

এ সময়ের ইতিহাস কেবল মুসলমানদের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল সমাজও একে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ক্রুসেড যুদ্ধ ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা এবং কবি-সাহিত্যিক ও আপামর জনসাধারণের মন-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল একটানা তিন শতাব্দীরও অধিক সময়কাল ধরে; নির্দিষ্ট করে বললে ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনাকাল ৪৮৮ হিজরি (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) হতে শুরু করে সমাপ্তিরও পূর্ণ একশ বছর পর ৮০২ হিজরি (১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত। বরং এখনো ইউরোপ-আমেরিকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাসের গুরুত্ব সগৌরবে অধিষ্ঠিত আছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নরম্যান ফ্র্যাঙ্ক ক্যান্টোরের[৩] এক জরিপ অনুযায়ী আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পাশ করা সাধারণ ছাত্ররা মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেবল একটি ঘটনার কথাই জানে—প্রথম ক্রুসেড অভিযানের ইতিহাস! তিনি জরিপে আরও জানতে পেরেছেন যে, এই

৩. কানাডা ও আমেরিকার যৌথ নাগরিক নরম্যান ফ্র্যাঙ্ক ক্যান্টোর (Norman Frank Cantor) ছিলেন নিজ যুগের একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখক। তার অধ্যয়ন ও গবেষণার মূল বিষয় ছিল মধ্যযুগের ইতিহাস। জন্ম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর কানাডার উইনিপেগে, মৃত্যু ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *Medieval history : the life and death of a civilization* আরবিতে *التاريخ الوسيط : قصة الحضارة-البداية والنهاية* নামে ড. কাসিম আবদুহু কাসিম কর্তৃক অনূদিত হয়েছে। [অনুবাদক]

অভিযান সম্পর্কে এসব ছাত্রের অনুভব-অনুভূতি অত্যন্ত ইতিবাচক।[৪]

[দুই]

যেহেতু কালগত দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেড ইতিহাসের ব্যাপ্তি বেশ দীর্ঘ, তাই এ ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিবাদমান পক্ষগুলোর নীতি-আদর্শও পর্যবেক্ষণ করতে পারব। সাময়িক ও অস্থায়ী বিষয়াদির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমাজের চিন্তাধারা এবং সামরিক, রাজনৈতিক ও আইনের অঙ্গনের নীতি-নির্ধারকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক সময়ই প্রচলিত ধারা হতে ব্যতিক্রমী হয়; কিন্তু ক্রুসেড যুদ্ধ তো কোনো সাময়িক বিষয় ছিল না। আর তাই ক্রুসেড-সংশ্লিষ্ট নীতি-আদর্শসমূহ টিকে ছিল দশকের পর দশক; বরং দুই শতাব্দী ধরে। এর অর্থ হলো—এসব নীতি ও আদর্শ সুদৃঢ় ও অটল বিশ্বাস-নির্ভর ছিল; কোনো অবিবেচক, হঠকারী বা নির্বোধের মস্তিষ্কপ্রসূত আকস্মিক পরিকল্পনা ছিল না।

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ইউরোপীয়দের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও পটভূমিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। মূলত এসব পটভূমিকে কেন্দ্র করেই প্রাচীনকালে (রোমান সাম্রাজ্যের) খ্রিষ্টান জাতি ও মুসলিম জাতির মাঝে লড়াই ও সংঘাত আবর্তিত হতো। পাশাপাশি আমরা অবগতি লাভ করতে পারব মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সেনানায়ক ও যোদ্ধাদের লড়াইয়ের পটভূমি, যুদ্ধনীতি, চুক্তিনীতি, অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণনীতি এবং সংস্কার ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত নীতি সম্পর্কেও।

আর তাই এ দাবি করা যায় যে, নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ মানবজাতির মনোবৃত্তি ও মানসিকতা, চরিত্র ও নৈতিকতা এবং বিরোধ ও সংঘাতকালের নীতি ও শিষ্টাচার—বিশেষত সংঘাতের এক পক্ষ যদি হয় ইসলামি পরিচয় ধারণকারী—ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অতি চমৎকার ও উৎকৃষ্ট এক গবেষণার নির্যাস।

---

৪. নরম্যান ফ্রান্স ক্যান্টোর, *আত-তারীখুল ওয়াসিত : কিসসাতুল হাযারা—আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/৩৯১-৩৯২।

[তিন]

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক ও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যখন আমরা দেখতে পাই যে, নয়শ বছরেরও অধিক সময় পূর্বের সেই কালের সঙ্গে আমাদের বর্তমানের যাপিত কালের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

নয়শ বছর পূর্বের সেই যুগসন্ধিক্ষণে যেমন ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে পুরো পশ্চিমা মিত্রশক্তি একজোট হয়েছিল, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে অগ্রসর হয়েছিল একটি যুদ্ধের জন্য; রাজনীতিবিদ, সমরবিদ, অর্থনীতিবিদ, ধর্মগুরু, বিত্তশালী ও জ্ঞানীসমাজ সকলে সেই অভিযানের সফল বাস্তবায়ন ও সমাপনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা করেছিল; আজকের পৃথিবীতেও নানা ভূখণ্ডে ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্য, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সেই একই দৃশ্য।

ইতিহাসের পাতায় আমরা যেমন দেখি শাম অঞ্চলে[৫], ফিলিস্তিনে,

---

[৫]. প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ মূলত তিনটি অঞ্চলকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। ১. এশিয়া মাইনর অঞ্চল ২. শাম অঞ্চল ৩. ফিলিস্তিন অঞ্চল। এখানে আমরা সংক্ষেপে অঞ্চল-তিনটির পরিচিতি তুলে ধরছি।

[এক] এশিয়া মাইনর অঞ্চল

এশিয়া মহাদেশের একটি বিশেষ অংশের নাম এশিয়া মাইনর। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি আনাতোলিয়া নামেও পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলটিই বর্তমানে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্র। অঞ্চলটির উত্তরে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, দক্ষিণে আধুনিক সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর। আর পূর্ব সীমান্তে আছে বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চল, যা আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় আর্মেনিয়া ও ইরানের মধ্যে পড়েছে।

মার্সিন (Mersin) নগরীর নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় এলাকা থেকে শুরু হয়ে উত্তর-পূর্বে আর্মেনিয়ান মালভূমির কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত তোরোস পর্বতমালা এশিয়া মাইনর অঞ্চলের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমানার প্রাকৃতিক প্রহরীরূপে কাজ করে বিধায় বাইজান্টাইন শাসকপরিবার এশিয়া মহাদেশের এই অঞ্চলটিকে নিজেদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি নির্বাচন করেছিল।

[দুই] শাম অঞ্চল

প্রাচীন শাম বা সিরিয়া একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম, যার বিস্তৃতি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হতে মেসোপটেমিয়া (Mesopotamia) অঞ্চল পর্যন্ত। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন (ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলসহ পশ্চিম তীর ও গাজা) এবং আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশ ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চল ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ১৯২১ সালে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত আঙ্কারা চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের যেসব এলাকা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়,=

তুরস্কের বিভিন্ন অংশে, মিশরে এমনকি হিজায-ভূমিতেও ক্রুসেডারদের আক্রমণ; এখনো আমরা দেখছি ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, কাশ্মীর, বসনিয়া-হার্জোগোভিনা ও কসোভাসহ বিভিন্ন ইসলামি ভূখণ্ডে অব্যাহত হামলা ও আগ্রাসন। আমরা দেখছি নবোদ্যমে নানাবিধ কৌশলে সুদান, সোমালিয়া, লেবানন ও সিরিয়ায় আক্রমণের আয়োজন। মিশর, ইরান, পাকিস্তান বা তুরস্কও নীলনকশা ও লক্ষ্যবস্তুর বাইরে নয়।

অতীতে ক্রুসেড যুদ্ধের কালে আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনে বহিরাগত এক রাষ্ট্রসত্তার বীজ রোপণ করা হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে The Kingdom

---

=সেগুলোও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুরস্কের সানজাকে ইসকানদার (The Sanjak of Alexandretta) অঞ্চলও শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও আধুনিক মিশরের সিনাই উপদ্বীপ ও ইরাকের মসুল অঞ্চলের কিছু অংশও শাম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে পুরো সিনাই উপদ্বীপ ও সাইপ্রাসও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ সালে রোমানরা শাম অধিকার করার বহু পূর্বে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল শাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অধিকারে চলে যায় এবং পরবর্তী সময়ে (পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত) সাসানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে শামের আয়তনে পরিবর্তন ঘটে এবং শাম ভূমধ্যসাগরের তীর হতে ফুরাত নদীর তীর পর্যন্ত এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বর্তমান সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশের অন্তর্গত দুমাতুল জান্দাল ছিল তৎকালীন শামের দক্ষিণ সীমান্ত আর উত্তর সীমান্ত ছিল দক্ষিণ তুরস্কের তোরোস পর্বতমালা। প্রাক-ইসলামি যুগ ও ইসলামি যুগে শাম বলে উল্লিখিত অঞ্চলকেই বোঝানো হতো।

বলাবাহুল্য, প্রাচীন শাম বা সিরিয়াকে আধুনিক সিরিয়া রাষ্ট্রের পরিসরে সীমাবদ্ধ মনে করলে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

[তিন] ফিলিস্তিন অঞ্চল

ফিলিস্তিন মূলত শাম অঞ্চলেরই একটি অংশ। তবে ঐতিহাসিক পটভূমিসহ বিভিন্ন গুরুত্ব বিবেচনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় অঞ্চলটি আলাদাভাবেও আলোচিত হয়। অতীতে ফিলিস্তিন শব্দটি শাম অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের জন্য ব্যবহৃত হতো। শামের এ অংশটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থল এবং ইসলামি বিশ্বের দুই ডানার মিলনস্থল বিবেচনা করা হয়। ১৯২০ থেকে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ব্রিটিশ দখলদারিত্বের সময়ের পূর্বে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের সীমানা কখনোই নিখুঁতভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না। বরং এর পূর্বে কালের পরিক্রমায় ফিলিস্তিনের সীমানায় বিভিন্ন সময়ই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে সাধারণত ফিলিস্তিন বলে পশ্চিমের ভূমধ্যসাগর হতে পূর্বের মৃত সাগর ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকেই বোঝানো হতো।

বিশ্বমানচিত্রে সবার উত্তরে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের অবস্থান, তার দক্ষিণে শাম অঞ্চল এবং সবার দক্ষিণে ফিলিস্তিন অঞ্চল। [অনুবাদক]

of Jerusalem বা বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। আমরা দেখেছি রোপিত সেই ক্রুসেড রাষ্ট্রকাঠামো বছরের পর বছর সগৌরবে টিকে থেকেছে এবং পশ্চিমা ক্রুসেডারদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতায় পুষ্ট হয়ে তার পরিধি ও প্রভাব দিনে দিনে বিস্তৃত হয়েছে। ঠিক তেমনই বর্তমানে আমরা দেখছি, সেই ফিলিস্তিন-ভূমিতেই এক ইহুদি রাষ্ট্রের বীজ রোপণ করা হয়েছে এবং পশ্চিমা ক্রুসেডারদেরই সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে তার আয়তন ও প্রভাব দিনে দিনে আরও বিস্তৃত ও ভয়ংকর হচ্ছে।

ইতিহাসের পাতায় আমরা পড়েছি—উপনিবেশনীতিই ছিল ক্রুসেড যুদ্ধের মূল চালিকাশক্তি; ইউরোপের খ্রিষ্টানসমাজের নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলে ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে ছুটে এসেছিল যুদ্ধে জয়লাভ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে নয়; বরং নিজেদের সুপ্রাচীন নাড়ি ও শেকড়ের পরিচয় পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে বিজিত ভূখণ্ডের ভূ-মালিকানা লাভ করে সেখানেই বসতি স্থাপন করতে। আজ আমরা দেখছি, ইহুদি জাতি ঠিক একই কাজ করছে এবং না-ফেরার-সংকল্প লালন করে নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ পবিত্র ভূমিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের সেই চরম ক্রান্তিকালে আমরা আরব ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকের মাঝেই দেখেছি হীনম্মন্যতা ও পরাভব মানসিকতা, দেখেছি এমন কিছু লাঞ্ছনাকর আচরণের বহিঃপ্রকাশ, যার একটাই অর্থ করা যেতে পারে—ক্রুসেড আগ্রাসনের মোকাবিলায় মুসলিম জাতির প্রতিরোধশক্তির আশঙ্কাজনক ক্ষয় ও পতন। ঠিক তেমনই বর্তমানেও আমরা দেখছি সেই একই ধরনের হীনম্মন্যতা ও চেতনাশূন্যতা; যেন একই দৃশ্যের পুনঃমঞ্চায়ন! সেদিনের মতো আজও ইসলামি বিশ্বের অধিকৃত রাষ্ট্র ও অঞ্চলগুলোর আক্রান্ত-নির্যাতিত মুসলমানদের সহযোগিতায় কোনো বাহিনীকে অগ্রসর হতে বা কোনো নেতাকে উদ্যোগী হতে দেখা যায় না।

অতীত ইতিহাসে আমরা যেমন দেখেছি, শাম অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো যেন এক ও ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, যেন একজোট হতে না পারে মিশর ও শাম, ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে কোনো দুই মুসলিম নেতা, সেজন্য ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা প্রাণান্তকর অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কেননা, তারা যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, মুসলিম

শক্তির অনৈক্যের মাঝেই তাদের টিকে থাকা ও বেঁচে থাকার রহস্য নিহিত। ঠিক তেমনই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের যাপিত যুগের পশ্চিমা ক্রুসেড শক্তিও। আর এ প্রচেষ্টায় তারা বলতে গেলে শতভাগ সফল। তাই তো বিশ্ব মানচিত্রে এমন দুটি প্রতিবেশী মুসলিম দেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যাদের মাঝে নেই কোনো বিরোধ ও সংঘাত!

এভাবে তুলনা করলে ক্রুসেডকাল ও বর্তমান কালের মাঝে অসংখ্য সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। আর তাই ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস আমরা যদি অধ্যয়ন করি বিস্তৃত পরিসরে, তাহলে অবশ্যই আমরা উপলব্ধি করব যে, আমরা যেন অতীতের কোনো ইতিহাস পাঠ করছি না; পাঠ করছি আমাদের যাপিত সময়ের বিবরণ, আমাদের বর্তমানের গল্প।

[চার]

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে আরও একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। আর তা হলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল একটি ইস্যুতেও মুসলিম উম্মাহর কাঠামোর অভ্যন্তরে ফিকর ও চিন্তাগত, ফিকহ ও বিধানগত এবং আকিদা ও বিশ্বাসগত মতানৈক্য; অন্যভাবে বললে শিয়া-সুন্নি বিরোধ। ক্রুসেড যুদ্ধ মূলত আবর্তিত হয়েছিল শাম ও মিশর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আর এ দুটি অঞ্চলে তখন একদিকে সুন্নি সেলজুক পরিবার ও অপরদিকে শিয়া উবায়দি পরিবারের কর্তৃত্ব ছিল। আর তাই আমাদের বর্তমান কালের এবং আগামীর পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যের কার্যকারণসমূহ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চিত করেই যথেষ্ট সহায়ক বিবেচিত হবে।

[পাঁচ]

ক্রুসেডারদের সঙ্গে সংঘাতের ইতিহাস অধ্যয়ন আমাদের বর্তমানের জন্যই কেবল উপকারী নয়; বরং আমাদের ভবিষ্যতের জন্যও পাথেয়রূপে গণ্য হবে। কেননা, এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, কোনো কালেই এই সংঘাত শেষ হবে না, বিরোধ ও লড়াইয়ের চেতনা বিস্মৃত হবে না। হ্যাঁ, কখনো হয়তো স্তিমিত হবে, আবার কখনো নবোদ্যমে জোরদার হবে। এ সংঘাত চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদিসে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদিসে

হিলাল ও ছালিবের[৬] পারস্পরিক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সম্পর্কের চিত্র অব্যাহত থাকার বিষয়টি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদিস উল্লেখ করছি। হজরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ : خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ : لَا، وَاللهِ لَا نُخَلِّيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ، لَا يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُوْنَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ إِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِيْ أَهْلِيْكُمْ. فَيَخْرُجُوْنَ؛ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَه لَانْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ؛ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِه، فَيُرِيْهِمْ دَمَه فِيْ حَرْبَتِه»

কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না রোমান সেনাবাহিনী (শামের অন্তর্গত) আ'মাক বা দাবিক নগরীতে অবতরণ করবে। তখন মদীনা হতে সমকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলায় বের হবে। উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর পর রোমানরা বলবে, 'তোমরা ওই সমস্ত লোকদের পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের বন্দি করেছে; আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' মুসলমানগণ উত্তর দেবে, 'না, আল্লাহর শপথ! আমরা কক্ষনো আমাদের ভাইদের তোমাদের জন্য পৃথক করে দেব না।' অতঃপর মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ পালিয়ে যাবে; আল্লাহ তাআলা কক্ষনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে; তারা আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম শহিদ বিবেচিত হবে। আর

৬. হিলাল, ক্রিসেন্ট বা নবচন্দ্র ইসলামের প্রতীক হিসেবে এবং ছালিব, ক্রুশ বা কাষ্ঠদণ্ড খ্রিষ্টবাদের প্রতীক হিসেবে প্রসিদ্ধ। [অনুবাদক]

'এক-তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে; জীবনে কখনো তারা (কুফরির) ফিতনার শিকার হবে না। তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারি যায়তুন গাছে ঝুলিয়ে রেখে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। ইত্যবসরে শয়তান তাদের মাঝে চিৎকার করে বলতে থাকবে, 'দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে চলে এসেছে।' এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ তা ছিল মিথ্যা সংবাদ (গুজব)। তারা যখন শামে পৌঁছবে, তখন তার (দাজ্জালের) আবির্ভাব হবে। মুসলিম বাহিনী যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে, তখন নামাজের সময় হবে। অতঃপর ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন এবং নামাজে ইমামতি করবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হতে শুরু করবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা তাকে এমনিই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে বিগলিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যেত। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ঈসার হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং সবাইকে তার বর্শায় দাজ্জালের রক্ত দেখিয়ে দেবেন।[৭]

---

৭. ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৯৭, হাকিম, *মুসতাদরাকে হাকিম*, হাদিস নং ৮৪৮৬ ও ইমাম ইবনে হিব্বান আল-বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৮১৩। আলোচ্য হাদিসটির কিছু কিছু অংশের মর্ম উপলব্ধি করা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিধায় শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তকি উসমানি দা. বা.-কৃত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ '*তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*' (৬/২৩১-২৩৫) হতে নির্বাচিত কিছু অংশের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলো। [অনুবাদক]

আ'মাক : এটি একটি স্থানের নাম। আল্লামা তীবি রহ. মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১০/৭৮) তুরিবিশতি রহ.-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, 'এটি মদিনার প্রান্তে অবস্থিত একটি স্থান।' অপরদিকে নববি রহ. উল্লেখ করেছেন, 'এটি আলেপ্পোর নিকটবর্তী একটি স্থান।' ইয়াকুত আল-হামাবির মত দ্বিতীয় উক্তিটিকে সমর্থন করে। তিনি বলেছেন, 'এটি আলেপ্পো ও এন্টিয়কের মাঝে অবস্থিত দাবিকের নিকটবর্তী ছোট একটি বসতি।' (*মুজামুল বুলদান*, ১/২২২)।

দাবিক : এটিও একটি স্থানের নাম। তুরিবিশতি রহ. এর পরিচিতি-ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'এটি মদিনার নিকটবর্তী খেজুরকুঞ্জবিশিষ্ট একটি বাজারের নাম।' কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ এর বিপরীত। ইয়াকুত আল-হামাবি *মুজামুল বুলদান* গ্রন্থে (৩/৪১৬) বলেছেন, 'এটি আলেপ্পোর নিকটবর্তী আযায অঞ্চলভুক্ত একটি গ্রাম। আলেপ্পো থেকে দাবিকের দূরত্ব চার ফরসখ।'=

=**তখন মদিনা হতে ... একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলায় বের হবে :** আবী রহ. বলেছেন, 'মদিনা শব্দটি দ্বারা মদিনাতুন্নবী উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, (আরবি) মদিনা শব্দটি উক্ত নগরীর নামে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে হাদিসের পূর্বাপর বর্ণনাধারা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য শামের কোনো নগরী।' আলি ক্বারি রহ. *মিরকাত* গ্রন্থে (১০/১৪৬) উল্লেখ করেছেন, "ইবনুল মালাক বলেছেন, 'এক মত অনুসারে এর (মদিনা) দ্বারা উদ্দেশ্য আলেপ্পো। আর আমাক ও দাবিক তো আলেপ্পোরই নিকটবর্তী দুটি স্থান। আরেক মতানুসারে এর দ্বারা উদ্দেশ্য দামেশক নগরী।' ইবনুল মালাক-ই *মাবারিকুল আযহার* গ্রন্থে বলেছেন, 'মদিনা দ্বারা মদিনাতুন্নবী উদ্দেশ্য হওয়ার মতটি দুর্বল। কারণ, হাদিসের শেষাংশে এ নির্দেশনা রয়েছে যে, রোম অভিমুখে বের হওয়া বাহিনী দ্বারা উদ্দেশ্য মাহদির বাহিনী।' ...।"

যারা আমাদের লোকদের বন্দি করেছে; আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব : আলোচ্য অংশের سبوا শব্দটিকে কেউ কেউ 'সীন' ও 'বা' অক্ষরে যবর চিহ্নযোগে কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে বাক্যটির অর্থ হলো, 'আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা ইতিপূর্বে আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং আমাদের সন্তানদের বন্দি করেছে।' মূলত তারা এ কথা বলে যেসব মুসলমান ইতিপূর্বে তাদের ভূখণ্ডে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের প্রতি কৃত্রিম হৃদ্যতা প্রকাশ করবে এবং তাদেরকে প্রবঞ্চিত করে মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে।

অন্যদের মতে হাদিসের উক্ত শব্দটি 'সীন' ও 'বা' অক্ষরে পেশ চিহ্নযোগে কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মতে বাক্যটির অর্থ হলো, 'আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই, যারা ইতিপূর্বে আমাদের দলভুক্ত ছিল, এরপর মুসলমানরা তাদের বন্দি করে নিয়ে এসেছে, এরপর কিছুদিন ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থান করে তারা মুসলমান হয়ে গেছে এবং পরবর্তী সময়ে তারা আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে শুরু করেছে।'

কাজি ইয়াজ রহ. প্রথম মতটিকে সঠিক বলেছেন। কিন্তু আল্লামা নববি রহ. বলেছেন, 'আমার মতে উভয় মতই সঠিক। কারণ, তারা প্রথমে বন্দি হয়েছে, এরপর কাফিরদের বন্দি করেছে। আমাদের বর্তমান যুগে এমন অনেক মানুষই আছে। বরং শাম অঞ্চল ও মিশরের ইসলামি বাহিনীসমূহের অধিকাংশ সদস্য প্রথমে বন্দি ক্রীতদাস ছিল; এখন তারাই (ইসলামে দীক্ষিত হয়ে) কাফিরদের বন্দি করছে। ....'

আল্লাহ তাআলা কক্ষনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না : অর্থাৎ মুসলিম জামাতের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য রোমকদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে যাবে। এরপর তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের গুনাহ থেকে তাওবার তাওফিক হবে না এবং আমলনামায় এ গুনাহ নিয়েই তারা মারা যাবে। আলি ক্বারি রহ. *মিরকাত* গ্রন্থে (১০/১৪৭) বলেছেন, 'হাদিসে এ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা কাফির অবস্থায় মারা যাবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।'

তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে : কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল। হাদিসের এ অংশটি বাহ্যত এ কারণে দুর্বোধ্য মনে হয় যে, ইতিহাস-বিখ্যাত উসমানি সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (বহু বছর পূর্বে) ৮৫৭ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে=

[ছয়]

উম্মাহর ইতিহাসের এই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি অধ্যয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ও কার্যকারণ হলো—ইতিহাসের এই অধ্যায়টিতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে। সে সময়কার ঘটনাপ্রবাহের সাহিত্যমূল্য এবং লেখক, সংকলক ও

=কনস্টান্টিনোপল জয় করেছেন এবং তখন থেকে এখনো পর্যন্ত সেখানে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বজায় আছে। কিন্তু কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর তো (দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও) এখনো দাজ্জাল আবির্ভূত হয়নি। অথচ হাদিসের বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গিতে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল জয় করে শামে ফেরার অব্যবহিত পরেই দাজ্জাল আবির্ভূত হবে?!

এই প্রশ্নের উত্তর দু-ভাবে দেওয়া যায়।

১. হাদিসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল আবারও কাফিরদের দখলে চলে যাবে। এরপর মুসলমানরা তা পুনঃবিজয় করবে। শায়খ সাহারানপুরি রহ. *বাজলুল মাজহুদ* গ্রন্থে (১৭/২০৯) এ দিকে ইঙ্গিত করেই লিখেছেন, 'কনস্টান্টিনোপল বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য মাহদি কর্তৃক বিজয়।'

২. নবীযুগ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে কনস্টান্টিনোপল ছিল রোমান কাফিরদের রাজধানী। কাজেই আলোচ্য হাদিসে কনস্টান্টিনোপল দ্বারা বর্তমানে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত কনস্টান্টিনোপল নগরী উদ্দেশ্য না হয়ে কাফির রাষ্ট্রসমূহের বড় কোনো রাজধানী উদ্দেশ্য হতে পারে। এ কারণেই হাদিসটির কোনো কোনো বর্ণনায় কনস্টান্টিনোপলের পরিবর্তে মদিনা (নগরী) শব্দটি এসেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে *সুনানে আবু দাউদ* গ্রন্থের ৪২৯৬ নং হাদিস। ...।

এখানে এ বিষয়টিও জ্ঞাতব্য যে, কিয়ামতের নিদর্শন-সংক্রান্ত হাদিসসমূহে কেবল সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা কিয়ামত সন্নিকটতার বিশেষ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসব নিদর্শন একটির পর আরেকটি এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাহ্যত মনে হবে, নিদর্শনগুলো কালের ব্যবধান ব্যতিরেকে অনবরত সংঘটিত হতে থাকবে। অথচ এমনটি ঘটা মোটেও অসম্ভব নয় যে, দুটি নিদর্শনের মাঝে বিরাট কালগত দূরত্ব থাকবে। ... সুতরাং আলোচ্য হাদিসের ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে এ দাবি করা যায় না যে, মহাযুদ্ধের পরপরই কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। বরং প্রত্যেক দুই ঘটনার মাঝে কয়েক বছরের বা কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানও হতে পারে।

তারা যখন শামে পৌঁছবে, তখন তার (দাজ্জালের) আবির্ভাব হবে : হতে পারে মুসলিম বাহিনীর শামে আগমন এবং দাজ্জালের আবির্ভাব কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরপরই হবে, আবার উভয় ঘটনার মাঝে কালগত বিরাট দূরত্বও হতে পারে; যেমনটি আমরা পূর্বে বলে এসেছি। বাহ্যত যদিও প্রথম সম্ভাবনাটি প্রকাশ পাচ্ছে; কিন্তু উভয় সম্ভাবনার কোনোটিকেই সুনিশ্চিত বলা যায় না।

সাহিত্যিকগণের এ বিষয়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে মুসলিম ও পাশ্চাত্য উভয় পক্ষ হতেই এ কাজটি হয়েছে।

এটি কারও অজানা নয় যে, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকগণ অনেক সময় ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতার প্রতি তেমন একটা গুরুত্বারোপ করেন না; বরং ঘটনাকে চমকপ্রদ করে তুলতে কাজে লাগবে বলে মনে হয়, এমন কিছু পেলেই তা কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দেন। অনেক সময় তারা কাল্পনিক চরিত্রও সৃষ্টি করেন; আবার বাস্তব চরিত্রের জন্য সৃষ্টি করেন কাল্পনিক কাহিনি। উদ্দেশ্য কোনো দাবিকে দৃঢ়মূল করা কিংবা কোনো চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এর ফলে পাঠকের সামনে কিছুতেই প্রকৃত বাস্তবতা ফুটে ওঠে না; বরং পাঠক ও শ্রোতা লেখক-সাহিত্যিকের চিন্তাধারার গণ্ডিতে বন্দি হয়ে যায়।

এর বাইরে ইসলামি আদর্শকে কলুষিতকরণ, ক্রুসেডীয় চেতনাকে সমুন্নতকরণ এবং বাস্তবতা-বিবর্জিত পক্ষপাতমূলক তথ্য উপস্থাপনের বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেসব জালিয়াতি ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিকৃতি করা হয়েছে, তা তো রয়েছেই।

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বড় জালিয়াতি করা হয়েছে তার নামকরণেই! যুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তী যুগসমূহে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। এ নামটি মূলত প্রসিদ্ধি লাভ করে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতক ও তৎপরবর্তী সময়ে। এর পূর্বে এ যুদ্ধের জন্য সবাই অন্যান্য বিভিন্ন নাম যেমন : অভিযান, তীর্থযাত্রীদের অগ্রযাত্রা, পবিত্র ভূমির সফর, পবিত্র যুদ্ধ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করত। অষ্টাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তীকালে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নতুন এ নামটি জনপ্রিয় করে তোলা হয়। যেহেতু 'ক্রুসেড' শব্দটি একটি মহৎ ও অভিজাত লড়াইয়ের ভাব ধারণ করে, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের চিত্র ফুটিয়ে তোলে এবং খ্রিষ্টান জাতির আত্মোৎসর্গের মর্ম প্রকাশ করে, তাই পরিকল্পিতভাবেই এ নামটি জনপ্রিয় করে তোলা হয়। অথচ নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ক্রুসেড অভিযানসমূহে কখনোই এসব চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি ছিল না। বরং প্রতিটি ক্রুসেড অভিযান ছিল হিংস্রতা ও কঠোরতা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা এবং নিপীড়ন ও মানবতালঙ্ঘনের হাজারো দাস্তানে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজের ব্যাপক ও গণ-অনুভূতি হলো—এ যুদ্ধ ছিল মহৎ ও উন্নত লক্ষ্য-

উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কৃত সম্পূর্ণ মহান এক যুদ্ধ, যাতে ব্যবহৃত হয়েছিল মহৎ ও কল্যাণকর বিভিন্ন উপকরণ-মাধ্যম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ যে ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনকে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে অভিহিত করেছেন, তার উদ্দেশ্যও এখান থেকে সহজে প্রতিভাত হয়।[৮] তিনি এই শব্দযুগল ব্যবহারের মাধ্যমে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন কোনো আক্রমণাত্মক বা বৈরিতাপূর্ণ প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তিনি নিজে এবং আমেরিকান ও অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী যে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অধিকারী, তারই বহিঃপ্রকাশ! এর মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিটি খ্রিষ্টান জাতিগোষ্ঠীর কাছে এই বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যে, এটি একটি মহৎ ও কল্যাণকর যুদ্ধ। আমেরিকা মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যেই এত ত্যাগ স্বীকার করে এ যুদ্ধ শুরু করেছে!

পরিভাষাগত এই মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিকৃতি সত্ত্বেও বাস্তবতা হলো, এর থেকে বের হয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত শেষ প্রজন্মের অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের অধ্যয়ন ও শিক্ষাগ্রহণ ইউরোপীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে হওয়ায় তারা কোনো প্রকার প্রতিরোধ করা ব্যতিরেকেই ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ, ইতিহাস-বিভাজন এবং ইতিহাস বর্ণনার ভাষা ও পরিভাষা সবকিছু গ্রহণ করে নিয়েছে। সুতরাং আমরা যদি প্রথম সাম্রাজ্যবাদী অভিযান, পশ্চিম ইউরোপের অভিযান, খ্রিষ্টানদের যুদ্ধ কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো পরিভাষা ব্যবহার করি, তা অনেকের কাছেই মোটেও বোধগম্য ও কার্যকর হবে না। 'ক্রুসেড যুদ্ধ' পরিভাষায় আচ্ছন্ন-মস্তিষ্ক এসব পরিভাষা শুনে নিশ্চিতভাবেই এমন কোনো যুদ্ধ-ইতিহাস বা ঘটনাপ্রবাহের প্রতি ধাবিত হবে, যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র এই কারণেই উক্ত নামকরণ আমাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা নিরুপায় হয়েই আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম '*ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*'-ই রেখেছি।

৮. প্রেসিডেন্ট বুশের এ জাতীয় উক্তিসমূহ সম্পর্কে জানতে দেখুন : https://bit.ly/2Zyl19m4। [অনুবাদক]

[সাত]

আলোচ্য বিষয় অধ্যয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো ক্রুসেডারদের এই হিংস্র আগ্রাসনের পেছনে কী কী কারণ, কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকা কার্যকর ছিল তার সঠিক বিশ্লেষণ করা। কারণ, ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ধর্মীয় চেতনাকেই ক্রুসেড অভিযানের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারও কারও মত হলো, অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নই ছিল ক্রুসেড অভিযানের মূল অনুপ্রাণিকা। তৃতীয় আরেক দলের মত হলো, প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধের মূল কার্যকারণ ছিল রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। চতুর্থ দলের বিশ্লেষকগণ নৈতিক ও চারিত্রিক বিভিন্ন অবক্ষয়কে এর কার্যকারণ সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ ছাড়াও ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষকগণের আরও কিছু দল-উপদল আছে, যারা ওপরের দুটি, তিনটি বা সবকটিকেই কার্যকারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধিকন্তু কোনটি প্রধান কারণ, আর কোনটি কার্যকারণ—তা নির্ণয়েও আছে নানা মুনির নানা মত।

অর্থাৎ ইতিহাস বিশ্লেষকগণের চিন্তা, মেধা ও প্রচেষ্টা এ যুদ্ধের কার্যকারণ নির্ণয়ে যথেষ্ট কাজ করেছে এবং প্রত্যেক বিশ্লেষক ও পাঠকের মেধাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় পটভূমির আলোকে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে।

[আট]

আমাদের এই গবেষণাকর্মের আরেকটি লক্ষ্য হলো ইসলামি ইতিহাসের মহান মনীষী ও মুজাহিদগণের অনেকের সংগ্রামী জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে সুস্পষ্ট করা। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যারা মোটামুটি ধারণা রাখে, তাদের সিংহভাগই মনে করে যে, ক্রুসেডীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সকল কৃতিত্ব একমাত্র মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের অনন্যসাধারণ এক সংগ্রামী মুজাহিদ, ক্ষণজন্মা এক সমরনায়ক; কিন্তু ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের অবিস্মরণীয় ইতিহাসে তিনিই একমাত্র অগ্রনায়ক নন। তার পূর্বে যেমন অনেক মহান বীরপুরুষ এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, আঞ্জাম দিয়েছেন তার পরেরও অনেকে। অথচ

অধিকাংশ মুসলমান তাদের নামও জানে না। মহান মুজাহিদ মওদুদকে কয়জন চেনে? কয়জন চেনে সুকমান বিন উরতুককে? কতজন জানে আক সুনকুর-এর পরিচয় ও ইতিহাস? এমন আরও কত মহান মুজাহিদ রয়েছেন, ক্রুসেড ইতিহাসে যাদের নিবেদন ও অবদান অবিস্মরণীয়। বরং ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ শাহসওয়ার যারা—ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন মাহমুদ বা নাজমুদ্দিন আইয়ুব প্রমুখ মুসলিম বীরদের জীবনবৃত্তান্তই জানা আছে কয়জনার?!

এই গবেষণাপত্র আমাদের সামনে এ বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত করবে যে, ইসলামি ভূখণ্ডকে ক্রুসেডারদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে কর্মপ্রচেষ্টা সাধিত হয়েছে, তা গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রচেষ্টা নয়; বরং একটি সম্মিলিত ও জাতীয় প্রচেষ্টা। এ বিষয়টিও সুপ্রমাণিত হবে যে, আমাদের ইতিহাসে এমন অনেক নিভৃতচারী ধর্মীয় ব্যক্তি রয়েছেন, কোনো মানুষ যাদের কথা ভাবেও না। প্রমাণিত হবে, মুসলিম উম্মাহ কল্যাণের পথে ছিল-আছে এবং থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

[নয়]

ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলমানদের ভূখণ্ড মুক্ত করতে আলিমসমাজেরও যে বিরাট ভূমিকা আছে, তা ঐতিহাসিকগণের অনেকেই উপেক্ষা করেন এবং এড়িয়ে যান। তাদের আলোচনায় উল্লেখ থাকে কেবল রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি ও যোদ্ধাদের ভূমিকা ও অবদানের কথা এবং যুদ্ধ ও সামরিক তৎপরতার বিবরণ। অথচ এটি সম্পূর্ণই বস্তুনিচয়ের স্বভাব-প্রকৃতি এবং মুসলিম উম্মাহর সংস্কার ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শাশ্বত রীতির বিরোধী। সুন্নাতুল্লাহ ও শাশ্বত রীতির সুদৃঢ় সংযোগ ও সংশ্লিষ্টতা তো আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন, প্রায়োগিক জীবনে শরিয়তের বাস্তবায়ন, হালাল ও ন্যায়ের প্রতি আগ্রহ এবং হারাম ও অন্যায়কে প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে। আর প্রতিযুগে এ দায়িত্বটি আঞ্জাম দিয়েছেন উম্মাহর একনিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসেও এমন আলিমের সংখ্যা অনেক। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লেখক ও বিশ্লেষক তাদের প্রতি গুরুত্ব নিবদ্ধ করেছেন। অথচ ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাসে তাদের ভূমিকা ও অবদান উপলব্ধি করা এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা ব্যতীত আমরা কিছুতেই জাতির নির্মাণ ও বিনির্মাণের পথ এবং সংকট হতে নিষ্কৃতি ও উত্তরণের পদ্ধতি উপলব্ধি করতে পারব না।

[দশ]

ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাস অধ্যয়নের আরেকটি কারণ হলো, এ যুদ্ধের সৃষ্ট প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ ও দীর্ঘমেয়াদি। এ যুদ্ধের প্রভাব কেবল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার দুইশ বছরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; এরপরও দীর্ঘ কাল ধরে এর প্রভাব কার্যকর ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কয়েক বছর নয়; কয়েক শতাব্দী বিস্তৃত। বরং আমরা আমাদের এই বর্তমান যুগেও ক্রুসেড যুদ্ধের তিক্ত প্রতিক্রিয়া ভোগ করছি। সম্ভবত এই যুদ্ধের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও সরাসরি প্রভাব হলো সুমহান ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রা থমকে যাওয়া। ইসলামি সভ্যতা যখন উপনীত হয়েছিল মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে এবং ছড়িয়ে পড়ছিল আপন অনুপম রূপ-গুণ ও মাধুর্য নিয়ে, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল খ্রিষ্টান ক্রুসেড শক্তি। তখন সবকিছু বাদ দিয়ে মুসলিম উম্মাহ তার যাবতীয় শক্তি ও প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রেখেছিল প্রতিরোধ যুদ্ধে; এ কাজেই ক্ষয় ও নিঃশেষ করেছিল নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্যটুকু। ফলে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম জাতি যেভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল, হঠাৎ করেই যেন তা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

ক্রুসেড আগ্রাসনের কারণে শুধু যে ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রা স্থগিত হয়ে গেছে তা-ই নয়; আরেক দিক থেকেও হয়েছে উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি। ভয়াবহ ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইসলামি ভূখণ্ডগুলো থেকে, বিশেষ করে আন্দালুস উপদ্বীপ ও সিসিলি[৮] দ্বীপ থেকে, কখনো শাম অঞ্চল থেকে ক্রুসেডার শক্তি লুট করে নিয়ে গেছে 'তুরাসুল ইসলামি' ও সুমহান ইসলামি জ্ঞানসম্পদ। এরপর তারা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও গুরুত্বের সঙ্গে সেগুলোর অনুবাদ শুরু করেছে এবং নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সেগুলোর

---

৮. সিসিলি : সিসিলি (Sicily) ভূমধ্যসাগরের সর্ববৃহৎ দ্বীপ। পার্শ্ববর্তী আরও কিছু ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে বর্তমানে এটি ইতালির একটি সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সমৃদ্ধ ও বিরল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী সুপ্রাচীন সিসিলি দ্বীপে ইসলামি বিজয়াভিযানের প্রথম যুগেই অভিযান পরিচালিত হয় এবং বিজিত হয়। এরপর কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন সময় দ্বীপটির ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব হাতছাড়া যেমন হয়েছে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। সর্বশেষ ১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে নরম্যানদের হাতে সিসিলির পতন ঘটে। মধ্যযুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিসিলি দ্বীপ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। আরবিতে দ্বীপটিকে صقلية (সিকিল্লিয়া) বলা হয়। [অনুবাদক]

অধ্যয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপিয়ান সভ্যতার মূল ভিত্তি নিঃসন্দেহে সেই 'চুরি-করা জ্ঞানসম্পদে'র ওপরই স্থাপিত।

আজ আমরা দেখছি, এই পরিবর্তনগুলোর কারণে মানবতার গতিপথই বদলে গেছে। একটি জাতি দিনে দিনে পতন ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে, আরেকটি জাতি উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে। স্বীকার করি, এটিই মুসলিম উম্মাহর চলমান সংকটের একমাত্র কারণ নয়; কিন্তু নিশ্চিত করেই এটি সংকটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ।

আর হয়তো একে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনা-পর্যালোচনা মাঝেমধ্যেই চলে যাবে ইসলামি বিজয়াভিযানের ইতিহাসের দিকে। প্রসঙ্গক্রমেই আসবে ক্রুসেড অভিযান ও ইসলামি বিজয়াভিযানের তুলনা। কত পার্থক্য দুটির মাঝে! কার্যকারণ ও চালিকাশক্তি, মাধ্যম ও উপকরণ এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল—সব বিচারেই দুয়ের মাঝে আকাশপাতাল তফাত।

ইসলামি বিজয়াভিযানের কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকা ছিল জনসাধারণের স্কন্ধমূল থেকে নিপীড়ন ও অনাচারের জোয়াল অপসারণ করা এবং কোনো প্রকার জবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা ব্যতীত সকলকে সুমহান ধর্ম ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করা। আবার অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামি বিজয়াভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি ভূখণ্ড ঘিরে-থাকা বিভিন্ন বিধর্মী শক্তির বেপরোয়া সীমালঙ্ঘন থেকে আত্মরক্ষা করা।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপায়-উপকরণ ও নীতি-আদর্শ অবলম্বনের ক্ষেত্রেও ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহ ছিল আভিজাত্যের সর্বোচ্চ স্তরের নমুনা। সম্ভবত মুসলিম উম্মাহই একমাত্র জাতি, যারা জানে যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ-আচরণনীতির মর্ম। ইসলামি বিজয়াভিযান ও ক্রুসেড অভিযানের মাঝে মোটা দাগের একটি পার্থক্য হলো, ইসলামি অভিযানসমূহ বিজিত অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদের কষ্টপ্রদান হতে পুরোপুরি মুক্ত। এ ছাড়াও যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে সদাচরণ, শত্রুপক্ষের সেনাপতি ও নেতৃবৃন্দ বন্দি হলে তাদের সঙ্গে উদার, মহৎ ও অনুপম আচরণ ইত্যাদি তো আছেই।

ইসলামি বিজয়াভিযানের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলও অন্যান্য জাতির যুদ্ধাভিযানের ফলাফল হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য জাতির যুদ্ধাভিযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে ফেলা এবং মানবতার অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ ও স্তিমিত করা। অপরদিকে মুসলিম অভিযাত্রীদের সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষা থাকে জ্ঞানের প্রসার ও গুণের বিকাশ এবং বিজিত জনগোষ্ঠীকে হাতে ধরে উন্নতি-অগ্রগতির মহিমান্বিত স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

নিরপেক্ষ যে কেউ তাকাতে পারে ইসলামপূর্ব আন্দালুস ও ইসলামি আন্দালুসের দিকে।

অধ্যয়ন করতে পারে ইসলামপূর্ব মিশর ও ইসলাম-পরবর্তী মিশরের ইতিহাস।

অবলোকন করতে পারে ইসলামপূর্ব মাগরিব[১০] ও ইসলামি মাগরিব অঞ্চলকে।

বুখারা, সমরকন্দ, শাম ও ইয়ামেনের বিভিন্ন অঞ্চল এবং আরও অনেক দেশের ইসলামপূর্ব পরিস্থিতি এবং ইসলামের আগমনপরবর্তী পরিস্থিতি

---

১০. বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্র মরক্কোকে আরবিতে 'মাগরিব' বলা হলেও অতীতে মাগরিব বলে উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হতো। বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত, সেগুলোকে বলা হতো 'মাগরিব'। ব্যাপকতর অর্থে কেউ কেউ লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত ধরতেন। অ্যাটলাস পর্বতমালা ও সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি ছিল আফ্রিকার অন্যান্য অংশ থেকে তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন।

এরপর হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী হতে আরবগণের ভাষা-ব্যবহারে মাগরিব অঞ্চলকে তিনভাগে বিভক্তিকরণ পাওয়া যায়—১. (আল-মাগরিবুল আদনা) নিকট-মাগরিব অঞ্চল ২. (আল-মাগরিবুল আওসাত) মধ্য-মাগরিব অঞ্চল ও ৩. (আল-মাগরিবুল আকছা) দূর-মাগরিব অঞ্চল।

আল-মাগরিবুল আদনার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে ত্রিপোলি হতে পশ্চিমে বিজায়া নগরী পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও পূর্ব আলজেরিয়াজুড়ে। আল-মাগরিবুল আওসাতের বিস্তৃতি ছিল পূর্বে তিয়ারিত নগরী হতে পশ্চিমে মাওলাওয়া নদী (The Moulouya River) ও তাজা (Taza) পর্বতমালা পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান আলজেরিয়ার বাকি অংশ ও মরক্কোর কিছু অংশজুড়ে। আর আল-মাগরিবুল আকছার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে মাওলাওয়া নদী হতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান মরক্কো রাষ্ট্রজুড়ে। [অনুবাদক]

অধ্যয়ন করতে পারে যেকোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি।

সর্ব বিবেচনায় এবং সকল মানদণ্ডে ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহ ছিল মানবিক সভ্যতার ধারক ও পরিবাহক।

ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাসে আমরা কখনো এর ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাইনি; পাইনি অন্য এমন কোনো বিজয়াভিযানে, যা কোনো বিশুদ্ধ ধর্ম বা সুদৃঢ় নীতির দ্বারস্থ হয়নি।

* * *

প্রথম পরিচ্ছেদ

একনজরে ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাতের সংক্ষিপ্ত চিত্র

শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে সমকালীন বিশ্বে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যই মূলত খ্রিষ্টান শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য 'পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য' নামেও পরিচিত ছিল। নবীজির জন্মের প্রায় শত বছর পূর্বে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যই ছিল সমকালীন বিশ্বে খ্রিষ্টানসমাজের পতাকাবাহী।[১১]

---

১১. রোমান সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সাম্রাজ্য। রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিষ্টপরবর্তী পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর। উৎপত্তিস্থল ইতালির রোম নগরীর প্রতি সম্বন্ধ করে সাম্রাজ্যটির নামকরণ করা হয় রোমান সাম্রাজ্য।

গোড়ার দিকে রোমান সাম্রাজ্য ছিল বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রজাতন্ত্র। এর প্রধান নগরী ছিল রোম। প্রথম পাঁচ শতক সাম্রাজ্যটি সিনেটর বা প্রতিনিধি-পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ২৩ সনে প্রতিনিধি পর্ষদের নির্ধারিত ডিক্টেটর অগাস্টাস (Augustus) রোম প্রজাতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘোষণা করে রাজতন্ত্রকেন্দ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে তাকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট বিবেচনা করা হয়। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে (৮৫৭ হিজরি সনে) উসমানি সাম্রাজ্যের হাতে চূড়ান্ত পতনের পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় পনেরোশ বছর রোমান সাম্রাজ্য রাজতন্ত্রের অধীনেই পরিচালিত হয়।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন বিশাল আকার ধারণ করায় শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তৎকালীন সম্রাট ডিয়োক্লেটিয়ান (Diocletian) সাম্রাজ্যকে পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে সম্রাট কনস্টান্টাইন (Constantine the Great) রোম নগরীর নিরাপত্তা-দুর্বলতাসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম হতে বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত বাইজান্টিয়ামে (Byzantium) স্থানান্তরিত করেন। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টিয়ামের সংস্কারকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তার নামানুসারে নগরীটির নতুন নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। এ সময় কিছুদিন সাম্রাজ্যের উভয় অংশ একই সম্রাটের অধীনে শাসিত হলেও ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ১ম থিয়োডোসিয়াস (Theodosius I)-এর মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য স্থায়ীভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম অংশের রাজধানী হয় রোম আর পূর্ব অঞ্চলের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল। মূল অংশ বা পশ্চিম অংশটি পরিচিত হয়=

=পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য নামে আর নবগঠিত পূর্ব অংশটি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য নামের পাশাপাশি রাজধানীর প্রাচীন নামানুসারে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামেও পরিচিতি লাভ করে। বিভক্ত হওয়া-পরবর্তী দুই শতাব্দী পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পার্শ্ববর্তী হান, গোথ ও ভ্যান্ডাল জনগোষ্ঠীর উপর্যুপরি আক্রমণের শিকার হয়ে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে এবং বিভিন্ন অঞ্চল হাতছাড়া হতে থাকে। অবশেষে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন থেকেই রোমের অধিবাসী না হয়েও রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাম্রাজ্য ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যই রোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। যেহেতু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটেছিল, তাই নবীযুগে রোমান সাম্রাজ্য বলতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকেই বোঝানো হতো। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে রোমান দ্বারা বাইজান্টাইনদের এবং রোমভূমি দ্বারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকেই বোঝানো হয়েছে।

শুরুতে রোমান সাম্রাজ্যের পরিধি ইতালিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে ইতালির বাইরেও প্রসারিত হতে থাকে। কালক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের পরিধি ভূমধ্যসাগরের ওপারে উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং আধুনিক মরক্কো ও আলজেরিয়ার উত্তর উপকূল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ডিক্টেটর জুলিয়াস সিজার-এর আমলে (শাসনকাল : খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯-৪৪ সন) মিশরও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে রোমানরা পরিণত হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতিতে। রোমান সাম্রাজ্য আয়তনের দিক থেকে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় সম্রাট ট্রাজানের (Trajan) আমলে (শাসনকাল : ৯৮-১১৭ খ্রিষ্টাব্দ)। তার আমলে রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এরপর বিভিন্ন সম্রাটের আমলে সাম্রাজ্যের আয়তনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক দশক পূর্বে ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ১ম জাস্টিনিয়ান (Justinian I)-এর শাসনামলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আবারও বিশালাকার ধারণ করে। এ সময় সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় পয়তাল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। ঐতিহাসিক শাম অঞ্চল, মিশর, এশিয়া মাইনর ও ইউরোপের বিশাল অঞ্চল তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যকেন্দ্রিক সাসানি সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের মহাশক্তিধর দুই রাষ্ট্র, তাই রাজ্য বিস্তৃতি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সব সময় সংঘাত চলত এবং উভয় সাম্রাজ্যের আয়তনেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত।

প্রাচীন রোমানরা ছিল প্যাগানিজম (Paganism) বা পৌত্তলিকতাবাদের অনুসারী। তারা বিভিন্ন দেবতার পূজা করত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম আটশ বছর প্যাগানিজমই ছিল সাম্রাজ্যের মূল ধর্ম। রোমান রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অগাস্টাসের আমলে আল্লাহর নবী হজরত ঈসা আ.-এর আগমনের মাধ্যমে পৃথিবীতে খ্রিষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু একদিকে খ্রিষ্টধর্মের একত্ববাদের শিক্ষা ছিল রোমানদের পৌত্তলিকতাবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক, অপরদিকে ঈসা আ.-এর প্রচারিত ন্যায় ও সাম্যের শিক্ষা ভোগবাদে বিশ্বাসী রোমান রাজপরিবারের অধীনস্থ জনগণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাই রোমান রাজপরিবার খ্রিষ্টধর্মকে গ্রহণ করার পরিবর্তে শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে এবং খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের ওপর প্রচুর নির্যাতন চালায়। কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে খ্রিষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং চতুর্থ শতকের গোড়ায়=

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর অঞ্চলসহ ইউরোপের পুরো পূর্ব অংশের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ ছাড়াও শাম অঞ্চল, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আয়তনের বিচারে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র। রোমান সাম্রাজ্যের বিশালতার একটি নিদর্শন এও ছিল যে, তৎকালে ভূমধ্যসাগরকে রোম সাগর বলা হতো। কারণ, ভূমধ্যসাগর তখন সব দিক থেকে রোমান সাম্রাজ্য কর্তৃক বেষ্টিত ছিল!

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে যদিও অনেক খ্রিষ্টান নাগরিক বসবাস করত; কিন্তু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত কোথাও তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যার অধিকারী ছিল না। যেসব অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল, সেগুলো হলো—

- পশ্চিম ইউরোপ : ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি ও ইতালি।
- আফ্রিকা : মৌলিকভাবে হাবশা[১২]।
- আরব উপদ্বীপ : শাম অঞ্চলের বিভিন্ন আরব খ্রিষ্টান গোত্র (গাসসানি, তাগলিব), ইয়ামেন ও নাজরানের বিভিন্ন খ্রিষ্টান গোত্র।
- এশিয়া : এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য খ্রিষ্টান-উপস্থিতি ছিল না।

=দিকে স্বয়ং সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তার আমল হতেই রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি কঠোরতা হ্রাস পেয়ে সহনশীলতা প্রদর্শন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সম্রাট ১ম থিয়োডোসিয়াসের সময় খ্রিষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র বৈধ ধর্মের মর্যাদা প্রদান করা হয়। তখন থেকে পতনের পূর্ব পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর বুকে খ্রিষ্টধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক। [অনুবাদক]

১২. আরব উপদ্বীপ হতে সরাসরি দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল হাবশা বা আবিসিনিয়া। বর্তমান ইরিত্রিয়া, উত্তর ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, জিবুতি, মিশরের দক্ষিণাঞ্চল, সুদানের পূর্বাঞ্চল ও ইয়ামেনজুড়ে হাবশা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। [অনুবাদক]



মানচিত্র নং-১

ইসলামের আবির্ভাবকালে বিশ্বমানচিত্রে খ্রিষ্টান রাষ্ট্রসমূহ

প্রথম পাঁচ শতাব্দীতে ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাত
(ইসলামের আবির্ভাবকাল-হিজরি পঞ্চম শতাব্দী)

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শুরুতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে ইসলামের দাওয়াত আত্মপ্রকাশ করে। আর ইসলামের দাওয়াত হলো সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন—

﴿وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا﴾

এবং হে নবী! আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য এমন রাসুল বানিয়েছি, যিনি সুসংবাদও শোনাবেন এবং সতর্কও করবেন।

[সুরা সাবা : ২৮]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»

অন্যান্য নবী কেবল আপন কওমের উদ্দেশে প্রেরিত হতেন, আর আমি সকল মানুষের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি।[১৩]

১৩. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৩৫ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৫২১।

এই সর্বজনীন নবুওয়তের দাবি ছিল নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমকালীন পৃথিবীর শাসক-প্রশাসক ও রাজন্যবর্গের নিকট দ্বীনি দাওয়াতের বার্তা প্রেরণ করবেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর সপ্তম হিজরি সনের শুরুতে নবীজি শাসকবর্গের কাছে পত্রপ্রেরণ শুরু করেন। যাদের কাছে বার্তা প্রেরণ করা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—রোম-কায়সার হিরাক্লিয়াস, হাবশার অধিপতি নাজাশি[১৪] ও মিশর-অধিপতি মুকাওকিস।[১৫]

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে হিরাক্লিয়াসের কথোপকথনের ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, হিরাক্লিয়াস নবীজির নবুওয়তের সত্যতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু নিজের ক্ষমতা ও রাজত্বের মোহে তিনি নবীজির প্রতি ঈমান আনেননি।[১৬] বরং পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যসমাবেশও ঘটিয়েছেন।

নবীজির প্রেরিত দূত হারিস বিন উমায়র আল-আযদি রাযি.-কে রোমান করদরাজ্য বুছরার[১৭] গাসসানি বংশোদ্ভূত খ্রিষ্টান প্রশাসক শুরাহবিল বিন আমর গাসসানি হত্যা করলে ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে গুরুতর অবনতি ঘটে।[১৮] একে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয় প্রথম মুসলিম-খ্রিষ্টান সামরিক

---

১৪. নাজাশি কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়; বরং তৎকালীন আবিসিনিয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অধিপতির জন্যই সম্মানসূচক সম্বোধন হিসেবে 'নাজাশি' ব্যবহৃত হতো। তদ্রূপ রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কায়সার, পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কিসরা, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসককে মুকাওকিস এবং তুর্কি সাম্রাজ্যের অধিপতিকে খাকান বলা হতো। আলোচ্য নাজাশি বা হাবশা-অধিপতির নাম ছিল আসহামা বিন আবজার। তিনিই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, একমাত্র যার জন্য নবীজি গায়েবি জানাজা আদায় করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। [অনুবাদক]

১৫. দেখুন : আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা*, ৭/৩৪৭।

১৬. এ ঘটনা বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ০৭ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৭৩।

১৭. বুছরা ও বসরা এক নয়। বুছরা (بصرى) বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক নগরীর নাম। সিরিয়ার রাজধানী দামেশক থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার। বুছরা তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অপরদিকে বসরা (البصرة) হলো বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত ইরাকের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। দ্বিতীয় খলিফা উমর রাযি.-এর খিলাফত আমলে বিখ্যাত বদরি সাহাবি উতবা বিন গাযওয়ান রাযি. বসরা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। [অনুবাদক]

১৮. দেখুন : ইবনে হাজার আসকালানি, *আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা*, ১/৫৮৯।

সংঘাত। অষ্টম হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) মুতা প্রান্তরে সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে আর পরাজিত খ্রিষ্টান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। রোমান (নরম্যান) সৈন্যদের প্রভাব বিচূর্ণ করাকে যথেষ্ট বিবেচনা করে মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-ও মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১৯]

মুতার যুদ্ধ যেন ছিল এক অনিঃশেষ সংঘাতের পূর্বাভাস! নবম হিজরি সনে তাবুকে মুসলিম বাহিনী খ্রিষ্টান বাহিনীর মোকাবিলায় উপস্থিত হলেও রোমান বাহিনী প্রত্যাগমন করে। এই অভিযানে যদিও কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি; কিন্তু নবীন ইসলামি রাষ্ট্রের শক্তি ও প্রভাব সকলের সামনে প্রতিভাত হয়ে যায়।[২০]

আলোচ্য কালে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের কেবল সংঘাতেরই সম্পর্ক ছিল এমন নয়; বরং কোনো কোনো খ্রিষ্টান অঞ্চলের সঙ্গে মুসলমানদের সহাবস্থান ও মিত্রতার সম্পর্কও ছিল। হাবশা, নাজরানের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, আইলার খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ইত্যাদির কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

তবে ধীরে ধীরে এ চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, আগামী কয়েক বছরে বরং কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যই হবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘাতের মূল পতাকাবাহী।

এরপর প্রথমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ও তারপর হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে সরাসরি ও শক্তিশালী কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময়ের প্রতিটি যুদ্ধে মুসলিম অভিযাত্রীগণ জয়লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধ হলো আজনাদাইন (Ajnadayn) ও বায়সানের যুদ্ধ[২১], ইয়ারমুকের যুদ্ধ, দামেশক, হিমস ও হামা[২২] বিজয়,

---

১৯. দেখুন : ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, ২/৩৭৩-৩৭৮।

২০. দেখুন : প্রাগুক্ত, ২/৫১৫।

২১. মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারি, *তারীখুর-রুসুলি ওয়াল-মুলূক*, ২/৩৪৭-৩৫৯।

২২. নগরীটির আরবি নাম حماة, ইংরেজি নাম Hama। [অনুবাদক]

মুসলমানদের হাতে আল-কুদসের[২৩] পতন, এরই পরিক্রমায় ফিলিস্তিন, লেবানন ও শামের অঞ্চলসমূহ এবং তুরস্কের বিভিন্ন অংশ বিজয়। এ সবকিছু ঘটে মাত্র সাত বছরের মধ্যে। এ অভিযানের সূচনা হয়েছিল ১২ হিজরি সনে (৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) আর তোরোস পর্বতমালার (The Taurus Mountains) দক্ষিণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বশেষ দুর্গ কায়সারিয়ার পতন ঘটে ১৯ হিজরি সনে (৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে)।[২৪]

শাম ও ফিলিস্তিনের পর মুসলিম অভিযাত্রীগণ যখন খ্রিষ্টান শক্তির বিরুদ্ধে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র মিশরেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন চলমান সংঘাত পরিস্থিতি আরও বিকশিত হয়। যে মিশর নয়শ বছরেরও অধিক সময় রোমান অধিকৃত ছিল, ২০ হিজরি সনে (৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে) বিশিষ্ট সাহাবি আমর ইবনুল আস রাযি.-এর নেতৃত্বে মিশর বিজয়ের মাধ্যমে তা মুসলমানদের হস্তগত হয়। ২২ হিজরি সনে (৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলামি বিজয়াভিযান লিবিয়ার সাইরেনিকা (Cyrenaica) অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[২৫]

চলমান বিজয়াভিযানের ক্রমধারায় আরেকটি মুসলিম বাহিনী উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি.-এর শাসনামলে উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। উকবা বিন নাফে ৪৩ হিজরি সনে (৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিউনিসিয়া জয় করেন। এ সময় এ অঞ্চলে বার্বার (আমাজিঘ)[২৬]

---

[২৩]. ঐতিহাসিকগণের মতে আল-কুদস পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরী। কয়েক হাজার বছর ব্যাপ্ত ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় আল-কুদস বিভিন্ন ভাষা ও জাতির সংস্পর্শ লাভ করে এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো : ১. সালিম ২. মূরইয়া ৩. ইয়াবুস ৪. আরিয়েল ৫. ঈলিয়া ৬. আল-কুদস ৭. বাইতুল মুকাদ্দাস ৮. বালাত ৯. রাবাত ১০. জেরুসালেম। [অনুবাদক]

[২৪]. মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারি, *তারীখুর-রুসুলি ওয়াল-মুলূক*, ২/৩৩৫, ৪৪৮ ও ৫১১।

আজনাদাইনের যুদ্ধ, বায়সানের (ফিহলের) যুদ্ধ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ, দামেশক ও আল-কুদস বিজয় এবং সাহাবাযুগে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পরিচালিত অভিযানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন : মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত— *ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড। [অনুবাদক]

[২৫]. মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারি, *তারীখুর-রুসুলি ওয়াল-মুলূক*, ২/৫১২, ৫৩৪।

[২৬]. 'বার্বার' শব্দটি চারটি ভিন্ন যুগে ভিন্ন চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হোমারের যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে) 'বার্বার' বলে পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের সেসব জাতিগোষ্ঠীকে বোঝানো হতো, যাদের ভাষা ও ধ্বনি ছিল দুর্বোধ্য। এরপর হেরোডোটাস-এর যুগে=

জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট বাইজান্টাইন বাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর সমাপ্তি ঘটে পুরো উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের ইসলামি সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি এবং বিপুল পরিমাণ বার্বার জনসাধারণের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে।[২৭]

৯২ হিজরি সনে (৭১১ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে নতুন আরেকটি ক্ষেত্র বিজিত হয়। মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী আন্দালুস জয় করে।[২৮] মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে মুসলিম বাহিনী পুরো আন্দালুস উপদ্বীপে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বরং এ সময় মুসলিম অভিযাত্রীগণ ফ্রান্সেও তাদের অভিযান বিস্তৃত করে।[২৯] ফ্রান্সে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষই জয়-পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করে। তবে ১১৪ হিজরি সনে (৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে) বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে খ্রিষ্টান ক্রুসেডার বাহিনী জয়লাভ করে এবং ফ্রান্সে চূড়ান্ত জয় তাদেরই হয়।[৩০] মূলত বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরের এই পরাজয়ের কারণেই ইউরোপে ইসলামি জোয়ার থেমে যায়। এ সময় আন্দালুসের অভ্যন্তরেও কিছু খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো—লিওন (Leon), ক্যাস্টোলা (Castile), অ্যারাগোন (The Kingdom of Aragon) ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত পর্তুগাল রাষ্ট্র।

=(খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে) শব্দটি ব্যবহৃত হতো সেসব জাতিগোষ্ঠীর জন্য, যারা গ্রিক ভাষা ও সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। বালতোসের আমলে রোম নগরীর অধিবাসীগণ ব্যতীত রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসীদের বলা হতো 'বার্বার'। আর আরবগণ তাদের আমলে আফ্রিকান উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিসমূহকে 'বার্বার' বলত। কেননা, তারা যে ভাষায় কথা বলত, আরবদের কাছে তা ছিল দুর্বোধ্য। আরবগণ অবোধগম্য ধ্বনির ক্ষেত্রে 'বার্বার' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। [দ্রষ্টব্য : তাহির আহমাদ যাবি, *তারীখুল ফাত্‌হিল আরাবী ফী লীবিয়া*, পৃষ্ঠা : ২০]।

বলাবাহুল্য, আলোচ্য ক্ষেত্রে শব্দটি চতুর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, আমাজিঘ (Amazighs) বা বার্বার জাতিগোষ্ঠী ছিল অত্যন্ত একরোখা, যুদ্ধবাজ ও সাহসী জাতি। তারা একাধিকবার ইসলাম গ্রহণ করার পরও ধর্মত্যাগ করেছিল। [অনুবাদক]

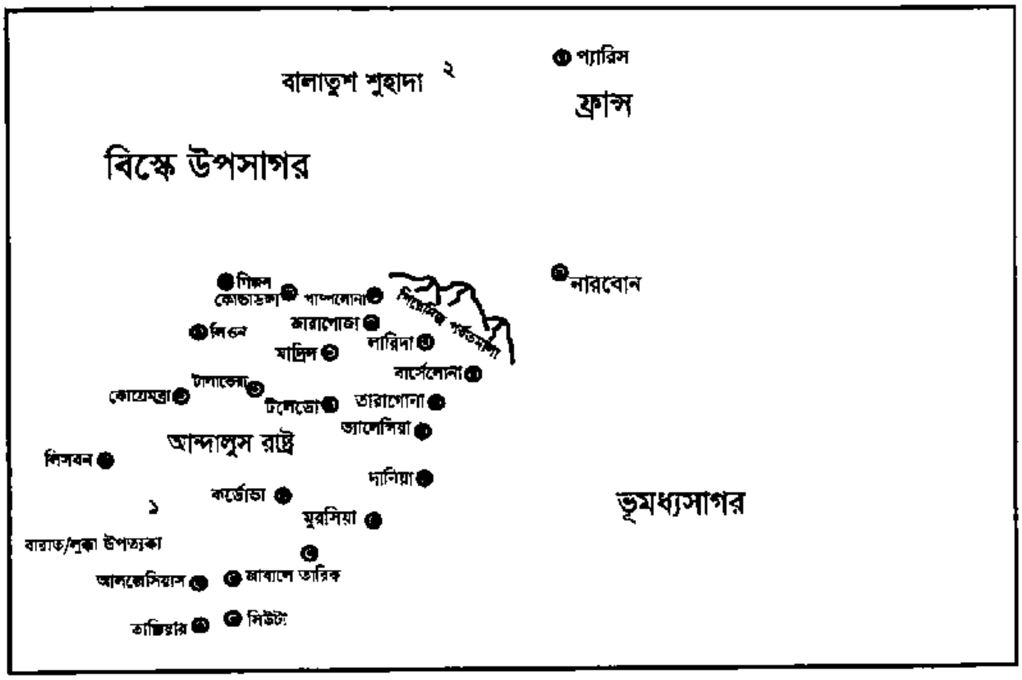
[২৭]. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৪৫।

[২৮]. প্রাগুক্ত, ৯/৮৩।

[২৯]. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত—*আন্দালুসের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড। [অনুবাদক]

[৩০]. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব*, ২/২৭ ও ইবনু আবদিল হাকাম, *ফুতূহু মিসর ওয়াল মাগরিব*, পৃষ্ঠা : ২১৬-১৭।

পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এসব খ্রিষ্টরাজ্যের সঙ্গে আন্দালুসের মুসলমানদের বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়।



মানচিত্র নং-২

আন্দালুস ও ফ্রান্সে মুসলিম-খ্রিষ্টান যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, এ সময় ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শক্তি ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে চলমান সংঘাতের মূল ক্ষেত্র ছিল দুটি। একটি হলো প্রাচ্যে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথমে উমাইয়া খিলাফতের এবং পরে আব্বাসি খিলাফতের লড়াই, অপরটি ইসলামি প্রতীচ্যে[৩১] (অধিকাংশ সময় ফ্রান্স এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইংল্যান্ড, জার্মানি ও

---

৩১. আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও আন্দালুস বিজিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকগণের ব্যবহারে ইসলামি বিশ্বকে 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য' দুই ভাগে বিভক্তিকরণ পাওয়া যায়। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হতে পূর্বে পারসিক মালভূমি পর্যন্ত ইসলামি ভূখণ্ডকে বলা হতো ইসলামি প্রাচ্য আর ভূমধ্যসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামি ভূখণ্ডকে বলা হতো ইসলামি প্রতীচ্য। মিশরকে ইসলামি বিশ্বের উভয় অংশের মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বিবেচনা করা হতো। আধুনিক রাষ্ট্রসীমা অনুসারে ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান, লেবানন, সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও ইয়ামেন ছিল ইসলামি প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত আর আইবেরিয়ান উপদ্বীপসহ মৌরিতানিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, (মরক্কো অধিকৃত) পশ্চিম সাহারা, (স্পেন অধিকৃত) বন্দরনগরী সিউটা (Ceuta) ও ম্যালিলা (Mellila) ছিল ইসলামি প্রতীচ্যের অন্তর্ভুক্ত। [অনুবাদক]

ইতালির মদদপুষ্ট) উত্তর আন্দালুসের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে আন্দালুসের মুসলিম রাষ্ট্রের লড়াই।

যেহেতু উমাইয়া রাজপরিবার শামকে দারুল খিলাফত[৩২] নির্ধারণ করেছিল, আর শাম ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের তুলনামূলক অধিকতর নিকটবর্তী, তাই উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম-বাইজান্টাইন যুদ্ধের সংখ্যাও ছিল বেশি। বরং উমাইয়া খিলাফতের পক্ষ থেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয়ের জন্যও বেশ কয়েকবার কার্যকর প্রচেষ্টা চালানো হয়; যদিও তার একটিও চূড়ান্ত সফলতার মুখ দেখেনি।[৩৩]

আব্বাসি খিলাফত ও শান্ত-সতর্ক ভাব!

আব্বাসি খিলাফতের সূচনা হয় ১৩২ হিজরি সনে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে)। আব্বাসি খিলাফতকালে ইসলামি রাষ্ট্র ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পারস্পরিক সংঘাতের তীব্রতা অনেকটাই ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ এই ছিল যে, আব্বাসি রাজপরিবার শাম অঞ্চলের পরিবর্তে ইরাক অঞ্চলের বাগদাদকে দারুল খিলাফত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর ফলে ইসলামি বিশ্বের মূলকেন্দ্র বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য হতে তুলনামূলক দূরে সরে যায়।[৩৪] অবশ্য এ সময় যুদ্ধাবস্থা পুরোপুরি স্থগিতও ছিল না। অধিকাংশ সময় উভয় সাম্রাজ্যের পারস্পরিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র হতো এশিয়া মাইনর অঞ্চল। এ সময়ের বিখ্যাত সংঘাতের মধ্যে আছে ২২৩ হিজরি সনে (৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কর্তৃক আব্বাসি খলিফা মুতাসিমের জন্মস্থান যিবাত্‌রা নগরী[৩৫] ধ্বংস করা, এরপর একই

---

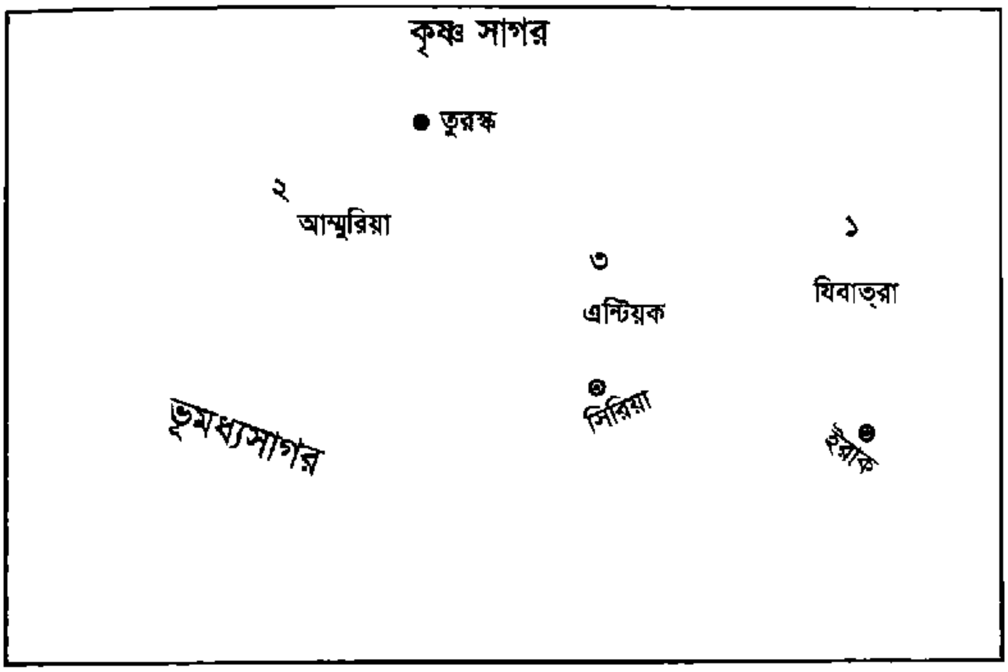
৩২. প্রথম উমাইয়া খলিফা হজরত মুয়াবিয়া রাযি. হতে শুরু করে দ্বাদশ উমাইয়া খলিফা ৩য় ইয়াযিদ পর্যন্ত সকল উমাইয়া খলিফার দারুল খিলাফত ও রাজধানী ছিল দামেশক। একমাত্র ত্রয়োদশ ও সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ-এর দারুল খিলাফত ছিল 'হাররান'। দামেশক ও হাররান উভয় নগরীই শাম অঞ্চলে অবস্থিত। [অনুবাদক]

৩৩. মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারি, *তারীখুর রুসুলি ওয়াল মুলূক*, ৪/৬১।

৩৪. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৪৭-৪৮।

৩৫. যিবাত্‌রা : মালাতিয়া হতে চার ফরসখ দূরে অবস্থিত একটি সীমান্ত নগরী। ঘন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত প্রাচীন এই রোমান নগরীটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি দুর্গ। হাবিব বিন মাসলামা আল-ফিহরি রাযি. নগরীটি জয় করেন। খলিফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের শাসনামলে রোমানরা দুর্গটি ধ্বংস করলে পুনরায় কোনোমতে দুর্গ নির্মাণ করা হয়। মারওয়ানের ফিতনার আমলে রোমানরা সেটিও ধ্বংস করে ফেলে। আব্বাসি খলিফা=

বছর মুসলিম বাহিনী কর্তৃক তৎকালীন বাইজান্টাইন সম্রাট থিওফেল-এর জন্মস্থান আম্মুরিয়া নগরী বিজয়।[৩৬]



মানচিত্র নং-৩

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আব্বাসি সাম্রাজ্যের যুদ্ধের ক্ষেত্রসমূহ

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে (খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে) আব্বাসি খিলাফতের কাঠামোতে ব্যাপক অবক্ষয় ও অধঃপতন দৃশ্যমান হতে শুরু করে। আব্বাসি সাম্রাজ্যের মাঝে গড়ে ওঠে ছোট ছোট বিভিন্ন রাষ্ট্র। যেমন : গজনবি রাষ্ট্র, সামানি রাষ্ট্র, যিরি রাষ্ট্র, হামদানি রাষ্ট্র, বুওয়াইহি রাষ্ট্র, ইখশিদি রাষ্ট্র ইত্যাদি।[৩৭]

=মানসুর দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করলে রোমানরা আবারও তা ধ্বংস করে ফেলে। খলিফা হারুনুর রশিদ পুনরায় দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে বসতি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। খলিফা মামুনের শাসনামলে রোমানরা যিবাত্‌রায় হামলা চালায় এবং অধিবাসীদের গবাদি পশুর পালে হানা দেয়। তখন মামুন দুর্গটির নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার নির্দেশ দেন। দেখুন : হিময়ারি, *আর-রাওযুল মি'তার ফী খবারিল আক্বতার*, পৃষ্ঠা : ১/২৮৫।

৩৬. মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারি, *তারীখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, ৫/২৩৫।

৩৭. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৫০।

উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলোর পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও পতনকাল সম্পর্কে জানতে দেখুন— মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত *ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড।

এর ফলে মুসলিম আব্বাসি খিলাফতের শক্তি, দাপট ও প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। সুযোগ পেয়ে বাইজান্টাইনরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে (খ্রিষ্টীয় দশম শতকে) জাযিরা অঞ্চলের[৩৮] বিভিন্ন নগরী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দখলে চলে যায়। এরপর ৩৫০ হিজরি সনে (৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রিট ও সাইপ্রাসসহ ভূমধ্যসাগরের মুসলিম নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন দ্বীপেরও পতন ঘটে। এর ফলে বাইজান্টাইন নৌবহর নতুন করে ভূমধ্যসাগরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত হয় আরও ভয়াবহ দুর্যোগ, পতন ঘটে এন্টিয়ক[৩৯] নগরীর। ভৌগোলিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী এন্টিয়কের পতন-ঘটনা ছিল ইসলামি বিশ্ব ও খ্রিষ্টান বিশ্ব—উভয় সমাজের জন্যই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা।[৪০]

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভাঙন

৩৫৮ হিজরি সনেই (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এক ভয়াবহ দুর্যোগ সংঘটিত হয়। 'ফাতিমি সাম্রাজ্য' নামে প্রসিদ্ধ শিয়া উবায়দি রাষ্ট্রের হাতে পতন ঘটে সুন্নি মিশর অঞ্চলের।[৪১] এর ফলে

---

৩৮. আল-জাযিরাতুল ফুরাতিয়া সংক্ষেপে 'জাযিরা' একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম। পূর্বে (পশ্চিম ইরানের) জাগ্রোস পর্বতমালা (The Zagros Mountains) থেকে নিয়ে উত্তরে (দক্ষিণ তুরস্কের) তোরোস পর্বতমালা (The Taurus Mountains) এবং দক্ষিণে শামের সামাওয়া মরুভূমি (The Syrian Desert) ও (ইরাকের) থার্থার হ্রদ (Lake Tharthar) পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। বর্তমান সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, ইরাকের উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজিতে অঞ্চলটিকে Upper Mesopotamia (মেসোপটেমিয়া উচ্চভূমি) বলা হয়। [অনুবাদক]

৩৯. এন্টিয়ক (Antioch) অতি প্রাচীন একটি নগরী। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার (Alexander the Great)-এর সেনাপতি সেলিউকাস নিকাটর (Seleucus I Nicator) খ্রিষ্টপূর্ব ৩০১ সালে ভূমধ্যসাগরের উপকূল হতে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে আছি নদী (Orontes river) -এর তীরে নগরীটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ পুত্র এন্টিওকাস (Antiochus I Soter)-এর নামে নগরীটির নাম 'এন্টিয়ক' রাখেন। আধুনিক তুরস্কের হাতায় প্রদেশ (Hatay Province)-এর অন্তর্গত নগরীটির বর্তমান নাম এন্টাকিয়া (Antakya)। আরবিতে নগরীটির নাম أنطاكية (আনতাকিয়া) [অনুবাদক]

৪০. Schlumberger : Un Empereur byzantin au Dixième siècle, Nicé-phore Phocas, 723.

৪১. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/২৬৬।

ইসলামি বিশ্ব বড় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে শিয়া বুওয়াইহি পরিবার নিয়ন্ত্রিত দুর্বল সুন্নি আব্বাসি খিলাফত, অপরদিকে শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্য। উবায়দিরা ততদিনে উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও শামের বিভিন্ন অংশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করেছিল। এই বিভক্তির অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই মুসলিম উম্মাহর বিভেদ ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও ইসলামি ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশে নিয়মিত আক্রমণ হানার দুঃসাহস দেখাতে থাকে। হিজরি চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ (খ্রিষ্টীয় দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সুবর্ণ কাল। এ সময় তারা ইরাক ও শামের উচ্চভূমিতে আক্রমণ চালায়। পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয় যে, মসুল, সিলভান (Meyafarikîn/Silvan), দিয়ারে বকর (Diyarbakır) বরং হিমস ও দামেশক নগরীও তৎকালীন বাইজান্টাইন সম্রাট জন টিজিমিসকেস (John Tzimiskes)-কে জিজিয়া প্রদান করতে শুরু করে।[৪২]

এ বিষয়টিও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাইজান্টাইন সম্রাটের উল্লিখিত শেষ অভিযানটি ছিল আল-কুদস লক্ষ্য করে; কিন্তু তিনি আল-কুদস পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হননি। এ যুদ্ধ চলাকালে তার বিভিন্ন উক্তি ও বার্তায় এমন সব ধর্মীয় উদ্ধৃতি ছিল, যা তার যুদ্ধনীতি ক্রুসেডীয় চেতনায় পূর্ণ থাকাকে সমর্থন করে।[৪৩]

এর শতাব্দীকাল পর ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালে শাম ও এন্টিয়ক অঞ্চলের বিভিন্ন নগরীর আইনগত অধিকার নিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও পশ্চিমা ক্রুসেডারদের মাঝে যে বিরোধ সংঘটিত হয়েছিল, তার পটভূমি ও প্রেক্ষাপট সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে শাম ও এন্টিয়ক অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের এই উপস্থিতির বিবরণ সহায়ক বিবেচিত হবে।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দী (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী) ছিল উবায়দি সাম্রাজ্যের উত্থান ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অবসন্নতার কাল। এ সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বুলগেরিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিল। পাশাপাশি তারা ব্যস্ত ছিল খ্রিষ্টান আর্মেনিয়া রাজ্যের ভূমি দখলে। আর্মেনিয়ার সমৃদ্ধ, উর্বর ও প্রাচুর্যপূর্ণ উন্নত ভূমি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে সেখানে হামলা চালাতে

[৪২]. প্রাগুক্ত, ১১/২৭১।

[৪৩]. Grousset : Hist, de lP' Armenie, p. 484. & Cam. Med. Vol. 4, p. 148.

প্রলুব্ধ করেছিল। এই সুযোগে উবায়দিরা আলেপ্পো[৪৪] ও এন্টিয়ক বাদে শামের অধিকাংশ এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

এই পঞ্চম হিজরি শতকেই সুবিস্তৃত ইসলামি শক্তি সেলজুক রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের সংঘাতে সেলজুক রাষ্ট্রের অসামান্য ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। সামনে যথাস্থানে আমরা ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাতে সেলজুক রাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

মোটামুটি সংক্ষেপে এই হলো নবীজির আবির্ভাবকাল হতে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইসলামি প্রাচ্যের পরিস্থিতি, অন্যভাবে বললে ইসলামি রাষ্ট্র ও বাইজান্টাইন রাষ্ট্রের মধ্যে একটানা পাঁচ শতাব্দী ধরে চলমান যুদ্ধপরিস্থিতি।

ইসলামি বিশ্বের অপর প্রান্তের পরিস্থিতিও অনেকটা এমনই ছিল। ইসলামি প্রতীচ্যে আন্দালুসের মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর (মৌলিকভাবে উত্তর আন্দালুস ও ফ্রান্স) মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। জয়-পরাজয়ের পাল্লাও ছিল দোদুল্যমান; কখনো মুসলমানদের জয়, কখনো খ্রিষ্টানদের। তবে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে) জয়ের পাল্লা খ্রিষ্টানদের দিকেই হেলে ছিল। এ সময়কালই আন্দালুস ইতিহাসে তাইফা (গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত) রাজন্যবর্গের কাল হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ সময় আন্দালুসের মুসলিম জনগোষ্ঠী শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে উত্তর আন্দালুসের বিস্তৃত অঞ্চলে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের আগ্রাসন চলতে থাকে। বিশেষ করে লিওন ও ক্যাস্টোলার শাসক ষষ্ঠ আলফোন্সোর হাতে ৪৭৮ হিজরি সনে (১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) আন্দালুসের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নগরী টলেডোর পতন ঘটে। টলেডোর পতন ছিল উভয় শক্তির জন্যই এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা।[৪৫]

অবশ্য এই শতকের শেষাংশ ছিল মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যবাহী। এ সময় মাগরিব ও পশ্চিম আফ্রিকায় শক্তিশালী মুরাবিতি সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে। মুরাবিতি বাহিনী ৪৭৯ হিজরি সনে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে)

---

৪৪. আলেপ্পো অতি প্রাচীন একটি নগরী। নগরীটির আরবি নাম حلب (হালাব)। আধুনিক সিরিয়ার অন্তর্গত আলেপ্পো নগরী দেশটির রাজধানী দামেশক হতে প্রায় ৩১০ কিলোমিটার দূরে দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। [অনুবাদক]

৪৫. ইবনুল কারদাবুস, *তারীখুল আন্দালুস*, পৃষ্ঠা : ৮৫।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে অবতরণ করে এবং যাল্লাকা প্রান্তরে ক্রুসেডারদের চরমভাবে পরাজিত করে। অর্থাৎ যাল্লাকার ঐতিহাসিক বিজয় সংঘটিত হয়েছিল টলেডো পতনের এক বছর পর। মুরাবিতি বাহিনী টলেডো পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলেও আন্দালুসের সিংহভাগ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[৪৬]

পরবর্তী নয় শতাব্দীর ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাত-চিত্র

(হিজরি ষষ্ঠ-চতুর্দশ শতাব্দী)

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষের) পরিস্থিতির সাধারণ মূল্যায়নরূপে আমরা বলতে পারি যে, তৎকালীন ইসলামি প্রাচ্য সেলজুক রাজপরিবার নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি সাম্রাজ্য ও শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্য এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। উবায়দিদের মূলকেন্দ্র ছিল কায়রো। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ সময়ে ইসলামি প্রাচ্যে বিভেদ ও দুর্বলতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত ছিল। বিপরীতে একই সময়ে ইসলামি বিশ্বের অপর অংশে ইসলামি প্রতীচ্যে আন্দালুসে অনন্যসাধারণ মুসলিম সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক ইউসুফ বিন তাশফিন রহ.-এর নেতৃত্বে নবীন মুরাবিতি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিভাত হচ্ছিল।

এ কারণেই হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে যখন পশ্চিম ইউরোপে ক্রুসেড আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে, তখন ক্রুসেডাররা মুরাবিতি নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী ভূখণ্ড আন্দালুসের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের দুর্বলতম অংশ ইসলামি প্রাচ্যে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথমবারের মতো ইসলামি প্রাচ্য অভিমুখী অভিযান পরিকল্পনা। ইনশাআল্লাহ, সামনে যথাস্থানে আমরা এ বিষয়টিও বিশ্লেষণ করব যে, পশ্চিম ইউরোপ কেন নির্দিষ্ট করে এ সময়কালকেই ক্রুসেড অভিযানের জন্য বেছে নিয়েছিল। যাই হোক, এভাবে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয় এবং হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ অংশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত) দুইশ বছরেরও অধিক সময়

---

[৪৬]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪ ও ৯৪ এবং হাসান আহমাদ মাহমুদ, *কিয়ামু দাউলাতিল মুরাবিতীন*, পৃষ্ঠা : ২৭৬।

ধরে অব্যাহত থাকে।

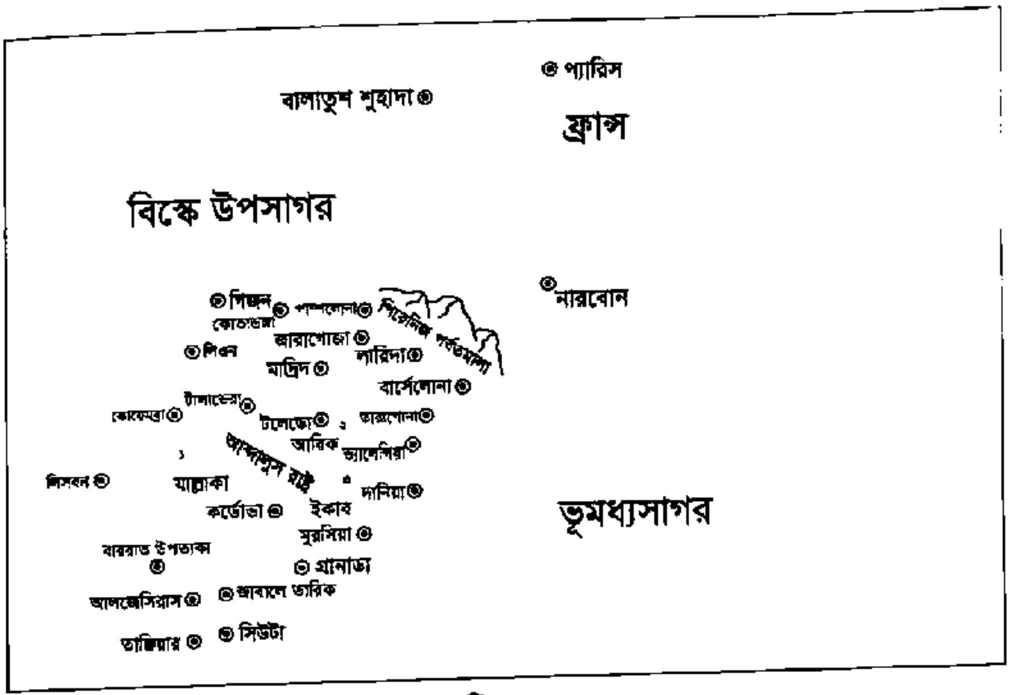
ইসলামি বিশ্বের বিবেচনায় বললে আব্বাসি খিলাফত, সেলজুক সাম্রাজ্য, এরপর একে একে জিনকি সাম্রাজ্য, আইয়ুবি সাম্রাজ্য ও মামলুক সাম্রাজ্যের সময়কাল পর্যন্ত হিংস্র ও বর্বর ক্রুসেড আগ্রাসন অব্যাহত ছিল। সামনে আমরা এ বিষয়টিও আলোচনা করব যে, হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশে পশ্চিমা ক্রুসেডারদের বিতাড়ন এবং মুসলমানদের ইসলামি ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ক্রুসেড আগ্রাসনের সমাপ্তি ঘটে।

অপরদিকে ইসলামি প্রতীচ্যে ৫৯১ হিজরি সনে (১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেড শিবির যদিও মুরাবিতি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের কাছে আন্দালুসের আরিক প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজিত হয়; কিন্তু হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশ ছিল আন্দালুসে ক্রুসেডারদের দৃশ্যমান অগ্রগতির কাল। ৬০৯ হিজরি সনে (১২১২ খ্রিষ্টাব্দে) ইকাব প্রান্তরের যুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনী মুওয়াহহিদি বাহিনীকে পরাজিত করে। এরপর একে একে কর্ডোভা ও সেভিলের মতো বৃহৎ ইসলামি দুর্গগুলোর পতন ঘটে।[৪৭] হিজরি সপ্তম শতকের শেষাংশে পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, প্রতীচ্যে ইসলামের অস্তিত্ব দক্ষিণ আন্দালুসের ক্ষুদ্র গ্রানাডা রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। গ্রানাডা অবশ্য এরপরও প্রায় আড়াই শতাব্দী ইসলামি পরিচয় ধারণ করে বিশ্ব মানচিত্রে টিকে ছিল।[৪৮]

---

৪৭. মাক্কারি, *নাফহুত তীব মিন গুছনিল আন্দালুসির রাতীব*, ৪/৩৮৩ ও Cam. Med Vol. 6, p. 410.

৪৮. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *আত-তারীখুল ইসলামিল ওয়াজীয*, পৃষ্ঠা : ২৬৪ ও স্ট্যানলি লেন-পোল, *কিসসাতুল আরব ফী ইসবানিয়া*, পৃষ্ঠা : ১৮৪-৮৫।



মানচিত্র নং-৪

আন্দালুস ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের ক্ষেত্র

হিজরি সপ্তম শতকের শেষাংশেই আত্মপ্রকাশ ঘটে উসমানি সাম্রাজ্যের। পশ্চিমা ক্রুসেডারদের প্রস্থানের পর দৃশ্যপটে বিদ্যমান খ্রিষ্টান শক্তি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঝান্ডা উসমানি সাম্রাজ্যই বহন করেছিল।

হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে) এশিয়া মাইনরের অঞ্চলগুলোতে উসমানিদের বিজয়াভিযান অব্যাহত ছিল। অপরদিকে আন্দালুস (সুনির্দিষ্ট করে বললে গ্রানাডা) পরিস্থিতি ছিল তুলনামূলক স্থিতিশীল।

হিজরি নবম শতাব্দী (খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উসমানিদের অব্যাহত যুদ্ধের শতক। এ যুগের যুদ্ধাভিযানের আছে এক সুমহান বিজয়ের গৌরব মুকুট। ৮৫৭ হিজরি সনে (১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজিত হয় এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের সামনে পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার পথ উন্মুক্ত হয়।[৫৯]

---

৫৯. আবদুল আজিজ আল-উমারি, *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়া ইবারাল উছুর*, পৃষ্ঠা : ৩৮০।

হিলাল-ছালিব সংঘাতের পূর্ব-ফ্রন্টের এই সুমহান বিজয় যদিও সমকালীন মুসলিম বিশ্বকে আনন্দে উদ্বেলিত করেছিল; কিন্তু এই নবম হিজরি শতকেই (খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে) ঘটে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এক ঘটনা। ৮৯৭ হিজরি সনে (১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে) পতন ঘটে পশ্চিম ফ্রন্ট তথা আন্দালুসে মুসলমানদের সর্বশেষ দুর্গ গ্রানাডার। এর ফলে আটশ বছরেরও অধিক সময় পর আন্দালুস থেকে মুসলমানরা পুরোপুরি বিতাড়িত হয়ে পড়ে।[৫০]

উসমানি সাম্রাজ্য যদিও আন্দালুসের মুসলমানদের উদ্ধারে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল; কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল একদিকে পূর্ব ইউরোপের বিরুদ্ধে অপরদিকে ইরানের শিয়া সাফাবিদের[৫১] বিরুদ্ধে উসমানিদের লাগাতার যুদ্ধ-ব্যস্ততা।[৫২]

হিজরি দশম শতাব্দী (খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) ছিল পুরোপুরিই উসমানিদের। এ শতাব্দীতে উসমানিদের বিজয়াভিযান ইউরোপের প্রায় মধ্যভাগে পৌঁছে যায়। ১ম সেলিম ও সুলায়মান আল-কানুনির শাসনামলে উসমানি বাহিনী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। গ্রিস, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলিম অভিযাত্রীরা পৌঁছে যায় অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। ভিয়েনার শাসক এ সময় উসমানি সাম্রাজ্যকে জিজিয়া প্রদানে সম্মত হন।

এই শতকেই স্পেন ও পর্তুগাল উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ জবরদখলের চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। স্পেন অবশ্য ৯৮৭ হিজরি সনে (১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে) মাগরিবের কাছ থেকে সিউটা ও ম্যালিলা দ্বীপ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। দ্বীপদুটি বর্তমানেও স্পেনের দখলে আছে। হিজরি একাদশ শতকে (খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে) ইউরোপে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি দুর্বল হতে শুরু করে। এ সময় বিভিন্ন যুদ্ধে ইউরোপের কিছু দেশ উসমানি সাম্রাজ্যের

---

৫০. মাক্কারি, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৮৩।

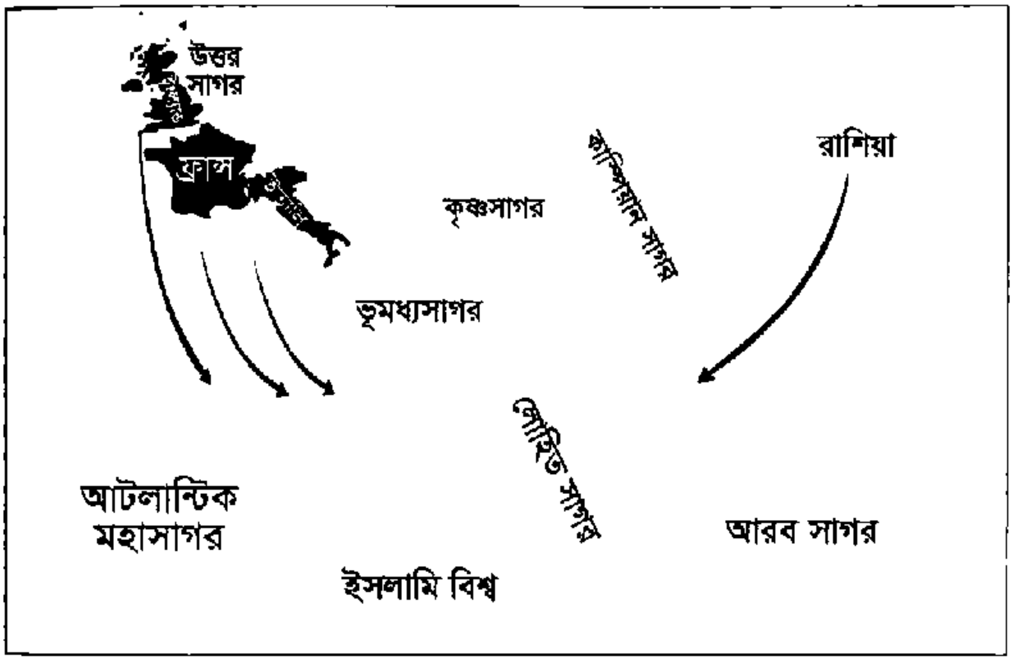
৫১. শিয়া সাফাবি সাম্রাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত—*ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড। [অনুবাদক]

৫২. নাবীল আবদুল হাই, *জুহুদুল উসমানিয়্যীন লি-ইনকাযিল আন্দালুস*, পৃষ্ঠা : ১২৫।

বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়।

পশ্চিম প্রান্তে এ সময় স্প্যানিশ ও পর্তুগিজদের অগ্রগতি দৃশ্যমান হতে থাকে। অবশ্য ওলন্দাজদের সাফল্য ছিল তাদের চেয়েও অধিক।

এর পরবর্তী তিন শতক অর্থাৎ হিজরি দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক (খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) ছিল সম্পূর্ণই ক্রুসেডারদের। একদিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের এবং অপরদিকে রাশিয়ার উপর্যুপরি আঘাতে উসমানি খিলাফত এ সময় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। ইংরেজ, ফরাসি, রুশ, চীনা ও ভারতীয় আগ্রাসনে ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের পতন ঘটে। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের সহায়তায় ইহুদিরা ফিলিস্তিনে গড়ে তোলে নিজেদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি।



মানচিত্র নং-৫

আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ

এরপর হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (খ্রিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ইসলামি বিশ্বে ব্যাপক পরিসরে স্বাধীনতার ঢেউ শুরু হয়। প্রথমে ১৩৬০ হিজরি সনে (১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে) লেবাননে, এরপর ১৩৬২ হিজরি সনে (১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) সিরিয়ায়, ১৩৭০ হিজরি সনে (১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে) লিবিয়ায় এবং ১৩৭১ হিজরি সনে (১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে) মিশরে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে কেবল ফিলিস্তিন এবং মাগরিবের

সিউটা ও ম্যালিলা বাদে বাকি সব মুসলিম অঞ্চল একের পর এক স্বাধীনতা লাভ করে। অবশ্য খ্রিষ্টান বিশ্বের বাইরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ভারতের হাতে যেসব মুসলিম অঞ্চল অধিকৃত ছিল, সেগুলো এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তারপর ইসলামি বিশ্বের ওপর নেমে আসে সর্বশেষ ক্রুসেড আগ্রাসন। সার্বরা ১৪১২ হিজরি সনে (১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে) বসনিয়ায় আক্রমণ করে। ১৪১৫ হিজরি সনে (১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) বসনিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। ১৪২১ হিজরি সনে (২০০১ খ্রিষ্টাব্দে) আমেরিকা আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায় এবং ১৪২২ হিজরি সনে (২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে) আগ্রাসন চালায় ইরাকে।



মানচিত্র নং-৬

আধুনিক কালে পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবীজির আবির্ভাবকাল তথা ইসলামের সেই প্রাথমিক কাল হতে শুরু করে আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত কখনোই ইসলাম-খ্রিষ্টবাদের সংঘাত বন্ধ থাকেনি। শতাব্দী তো দূরের কথা, এমন কোনো দশকও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে কোনো যুদ্ধ-সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। আর এতে বিস্ময়েরও কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

ইহুদি ও নাসারা আপনার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন। [সুরা বাকারা : ১২০]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا﴾

তারা ক্রমাগত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে সম্ভব হলে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে পারে। [সুরা বাকারা : ২১৭]

ক্রুসেড যুদ্ধের এই ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করে আমরা এ বিষয়টিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হব যে, আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস কোনো বিরল বা আকস্মিক সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের ইতিহাস নয়। প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো সময়কাল পাওয়াই বিরল ও আশ্চর্যের বিষয় হবে, যাতে কোনো যুদ্ধ ও সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। যদিও আমরা যুদ্ধ-সংঘাত, সংঘর্ষ ও হানাহানির প্রতি অভিলাষী নই; কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, যুদ্ধ-বিগ্রহ এ পৃথিবীর চিরন্তন নীতি। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কতকের মাধ্যমে কতককে প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। [সুরা বাকারা : ২৫১]

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড আগ্রাসন শুরুর অব্যবহিত পূর্বে ইসলামি বিশ্বের পরিস্থিতি

হিজরি চতুর্থ শতকে এবং পঞ্চম শতকের শুরুতে সামান্য কিছু এলাকা বাদে পুরো ইসলামি প্রাচ্য ছিল শিয়া মতাদর্শীদের কর্তৃত্বাধীন।

ইরাক অঞ্চলে যদিও তখনও সুন্নি আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু আব্বাসি খিলাফত তখন দুর্বলতার সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত ছিল। আব্বাসি খিলাফতের এই দুর্বলতা তৎকালে পারস্যে (ইরানে) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী বুওয়াইহি পরিবারকে ইরাকেও শিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রলুব্ধ করেছিল। আব্বাসি খিলাফতের ওপর শিয়া বুওয়াইহি পরিবারের কর্তৃত্ব হিজরি চতুর্থ শতকের মাঝ সময় থেকে পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় (৩৩৪-৪৪৭ হিজরি/৯৪৫-১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আব্বাসি সাম্রাজ্য ও ইরান হতে পূর্বে অবস্থিত মধ্য এশিয়া অঞ্চলে তথা ইরানের পূর্বাঞ্চল, আফগানিস্তান, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও আশেপাশের এলাকায় এ সময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল সুন্নি সামানি রাজপরিবার।

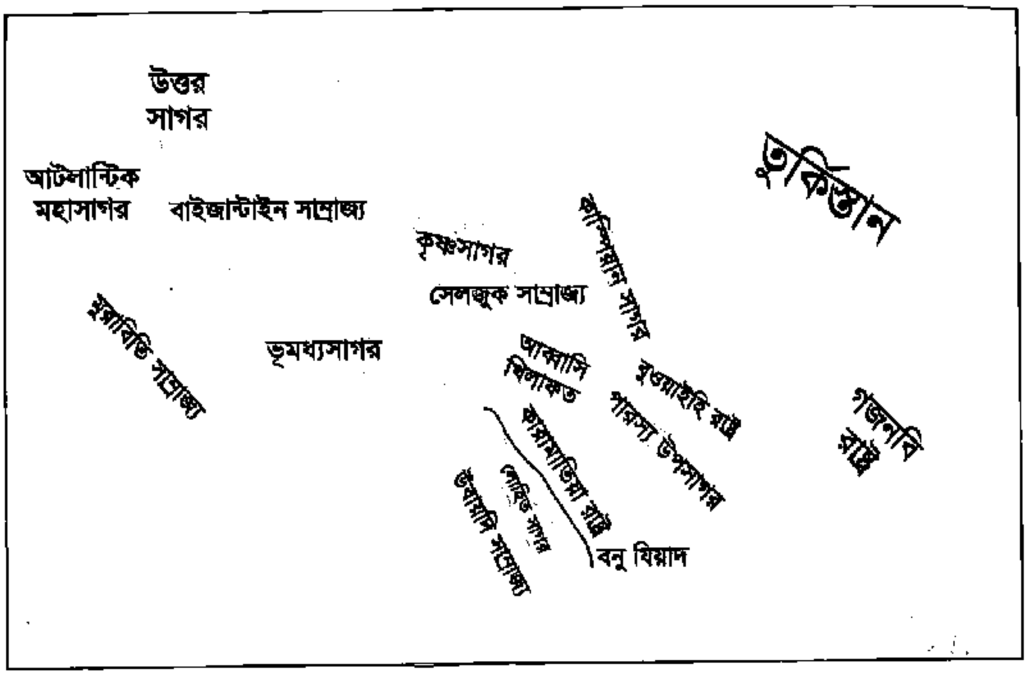
আরব উপদ্বীপে ছিল শিয়া কারামাতিয়া সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব।

শিয়া ইসমাইলি উবায়দি সাম্রাজ্য[৫৩] ইসলামি বিশ্বের মধ্যাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) তারা মিশর দখল করে[৫৪] এবং পরবর্তী প্রায় পূর্ণ দুই শতাব্দী মিশর তাদের অধিকারে থাকে। মিশরের পর উবায়দিদের ক্ষমতার পরিধি ফিলিস্তিন, শাম অঞ্চল

৫৩. উবায়দি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, উবায়দিদের মিশর দখল, শিয়া ইসমাইলি সম্প্রদায়ের পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত—*ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ২য় ও ৩য় খণ্ড। [অনুবাদক]

৫৪. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/২৬৬।

ও আরব উপদ্বীপেও বিস্তৃত হয়।(৫৫)



মানচিত্র নং-৭

ক্রুসেড যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বিভক্ত ইসলামি বিশ্ব

পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ইসলামি অঙ্গনে এক নবীন-উদীয়মান শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর তারা হলো মধ্য এশিয়া হতে আগত বিভিন্ন তুর্কি গোত্র। সুন্নি মতাদর্শী এসব গোত্র ভিন্ন ভিন্ন নাম-পরিচয়ের অধিকারী হলেও বংশমূল বিচারে এক 'তুর্কি' পরিচয়ে আবদ্ধ ছিল।

এসব গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তুর্কি গজনবি পরিবার। বুওয়াইহি রাষ্ট্র ও সামানি রাষ্ট্রের দুর্বল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে গজনবি পরিবার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং পূর্ব ইরান, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

এরপর পাদপ্রদীপে আসে আরেক তুর্কি গোত্র সেলজুক পরিবার। বংশের পূর্বতন পুরুষ সেলজুক বিন দাক্কাক-এর নামানুসারে তাদেরকে সেলজুক বলা হয়। সেলজুক গোত্র প্রথমে খোরাসান অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ একটি সময় গজনবিদের অধীনে বসবাস করে। কিন্তু একপর্যায়ে তারা গজনবি রাজপরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ৪২৮ হিজরি সনে

---

৫৫. Setton : A Hist of the Crusades, vol. 1. pp. 85-86.

(১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) তুগরল বেগ মুহাম্মাদ-এর নেতৃত্বে খোরাসান অঞ্চলে (ইরানের উত্তর-পূর্বে) স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।[৫৬] স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেলজুকরা ধীরে ধীরে তাদের চারপাশ ঘিরে থাকা বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। পাশাপাশি তারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়। সে সময় অর্থাৎ হিজরি পঞ্চম শতকে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল দুর্বলতা ও অবসন্নতার শিকার।

এভাবে সেলজুক রাষ্ট্রের পরিধিতে পারস্য, উত্তর ইরাক, আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনরের সুবিস্তৃত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৭] ৪৪৭ হিজরি সনে (১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত হয় এক যুগান্তকারী ঘটনা। আব্বাসি খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ শিয়া বুওয়াইহি পরিবারের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে সুন্নি সেলজুক শাসক তুগরল বেগের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। ৪৪৭ হিজরি সনেই তুগরল বেগ বাগদাদে প্রবেশ করেন।[৫৮] শুরু হয় আব্বাসি খিলাফতের নতুন এক অধ্যায়—সেলজুক রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন আব্বাসি খিলাফত। এর ফলে ইসলামি বিশ্বের সুন্নি অঙ্গনে তুগরল বেগের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি হয়। তুগরল বেগ পারস্য, ইরাক, শাম অঞ্চল ও এশিয়া মাইনরের বিস্তৃত অংশসহ সমকালীন ইসলামি বিশ্বের বড় একটি অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সেলজুকরা বিশেষ করে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে উপর্যুপরি অভিযান অব্যাহত রাখে এবং এর মাধ্যমে খ্রিষ্টান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে।[৫৯] অবশ্য এসব হামলা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে স্থায়ী অবস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নয়; বরং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে অস্থির ও দুর্বল করার লক্ষ্যে পরিচালিত হতো। এ কারণেই অভিযানগুলো তেমন সুবিন্যস্ত হতো না।

---

৫৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৬, ১১-১২ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/৪৮।

৫৭. দেখুন : আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/১২৫-১২৬ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/৫০।

৫৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩২২-৩২৩ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/৬৬।

৫৯. Cam. Med Vol. 4, p. 304.

৪৫৫ হিজরি সনে (১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) তুগরল বেগের মৃত্যু হলে তার স্থলাভিষিক্ত হন অনন্যসাধারণ মহান ইসলামি সেনাপতি আলপ আরসালান।[৬০] আলপ আরসালান এশিয়া মাইনর অঞ্চলে সেলজুক নীতি অনেকটা পরিবর্তন করে ফেলেন। তিনি এ অঞ্চলে বাইজান্টাইন ও আর্মেনীয় ভূমিতে কর্তৃত্ব ও স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। ৪৬৩ হিজরি সনে (১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে) সেলজুক ও বাইজান্টাইনদের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসে মানজিকার্টের যুদ্ধ (The Battle of Manzikert) নামে খ্যাত। ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম গতিনির্ধারক এ যুদ্ধে আলপ আরসালানের নেতৃত্বাধীন মাত্র বিশ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট সেলজুক বাহিনী তৎকালীন বাইজান্টাইন সম্রাট চতুর্থ রোমানোস (Romanos IV Diogenes)-এর নেতৃত্বাধীন দুই লক্ষের অধিক সৈন্যবিশিষ্ট বাইজান্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

মানজিকার্টের যুদ্ধে বাইজান্টাইন বাহিনী গঠিত হয়েছিল নিয়মিত বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী, ইতালির নরম্যান ভাড়াটে বাহিনী ও পশ্চিমা ভাড়াটে সৈন্যদের সমন্বয়ে। এ ছাড়াও ছিল এশিয়ান তুর্কমেন জাতির[৬১] বিভিন্ন সেনাদল। যুদ্ধে বাইজান্টাইন বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; নিহত হয় হাজার হাজার সৈন্য। সেনাপতি চতুর্থ রোমানোস নিজে বন্দি হন। দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান ও বাইজান্টাইন রাষ্ট্রে বন্দি সকল মুসলমানকে মুক্তির বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৬২] এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ে এবং ইউরোপের পূর্ব ফটকের প্রতিরক্ষায় রাষ্ট্রটির ভূমিকা ও অবস্থান সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলের খ্রিষ্টানরা হয়ে পড়ে উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত। মানজিকার্টের যুদ্ধের মাত্র পঁচিশ বছর পর শুরু হওয়া ক্রুসেড যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে

---

৬০. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/৮৯-৯০।

৬১. তুর্কি জাতির একটি শাখা তুর্কমেন। একক ভাষাপরিচয় (তুর্কমেন ভাষা)-এর অধিকারী তুর্কমেন জাতির বসবাস তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, উত্তর-পূর্ব ইরান, উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তান এবং উত্তর ককেশাসের বিশেষ করে স্টাভরোপল ক্রাই (Stavropol Kraj) অঞ্চলে। এ ছাড়াও ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননসহ বিভিন্ন আরব দেশে তুর্কমেন জাতির লোকজন বসবাস করে। [অনুবাদক]

৬২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩৮৮-৩৮৯।

ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের এই উৎকণ্ঠা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

মানজিকার্টের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আলপ আরসালান তার সুবিশাল রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুতকরণে মনোযোগী হন। বিশেষ করে তিনি পূর্বাঞ্চলে সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অধিক গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু মানজিকার্টের যুদ্ধের মাত্র এক বছর পর ৪৬৪ হিজরি সনে (১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে) মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলে[৬৩] এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন। আলপ আরসালানের মৃত্যুর পর সেলজুক সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তার পুত্র ১ম মালিকশাহ। মালিকশাহ ৪৬৫ হিজরি হতে ৪৮৫ হিজরি সন (১০৭২-১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সেলজুক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তার আমলে সেলজুক রাষ্ট্র পূর্বে চীন হতে পশ্চিমে মর্মর সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মালিকশাহর এই সাম্রাজ্যই ইতিহাসে 'বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্য' নামে খ্যাত।[৬৪]

পরিতাপের বিষয় হলো, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা যত বিশাল ও শক্তিশালীই হোক না কেন, ক্ষমতার হাত ধরে যখন পৃথিবী ও পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য আগমন করে এবং রাজ্যসীমা বিস্তৃত হতে থাকে, শাশ্বত বিধান মেনেই

---

৬৩. মাওয়ারাউন নাহার বা ট্রান্স অক্সিয়ানা (Transoxiana) অঞ্চল মধ্য এশিয়ার একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। এর বিস্তৃতি পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম ও বিখ্যাত নদী আমু দরিয়া হতে পূর্বে মধ্য এশিয়ার আরেক বিখ্যাত নদী সির দরিয়া পর্যন্ত। মুসলিম অভিযাত্রীগণ খোরাসান থেকে আমু দরিয়া পাড়ি দিয়ে এ অঞ্চল জয় করেন এবং অঞ্চলটিকে মাওয়ারাউন নাহার «بلاد ما وراء النهر» বা 'নদীর ওপারের অঞ্চল' নামে অভিহিত করেন।

প্রথম হিজরি শতকের শেষ দিকে ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের আমলে বিখ্যাত মুসলিম বীর সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম বাহিলি রহ.-এর হাতে এ অঞ্চল বিজিত হয় এবং পরবর্তীকালে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। বুখারা, সমরকন্দ, বাইকান্দ, ফারাব, ফারগানা, শাশ, তিরমিজ, কাসান, খোয়ারিজম, কাশগর, দাবুসিয়াসহ বিভিন্ন সুবিখ্যাত ইলমি মারকাজ এ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।

পরবর্তী সময়ে সুবিশাল ও সুবিস্তৃত এ অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী আরও কিছু এলাকাসহ পূর্ব তুর্কিস্তান ও পশ্চিম তুর্কিস্তান নামে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব তুর্কিস্তান বর্তমানে চীনের দখলে আছে এবং সেখানে উইঘুরসহ অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর অমানবিক ও বর্ণনাতীত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলছে। অপরদিকে পশ্চিম তুর্কিস্তান বর্তমানে পাঁচটি দেশে বিভক্ত—তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান। অবশ্য পশ্চিম তুর্কিস্তানের কিছু অংশ আজারবাইজানেও আছে। [অনুবাদক]

৬৪. প্রাগুক্ত, ৮/৩৯৫।

তখন শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত, ভাই-ভাই হানাহানি। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই চিরায়ত হাদিসে মূলত এ আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছে—

«فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»

আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না; বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এসেছিল; তখন তোমরা তা লাভ করতে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেভাবে তারা লিপ্ত হয়েছিল। এ ধনসম্পদ তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও তেমনই ধ্বংস করে দেবে।[৬৫]

এই শাশ্বত নীতিকে মেনেই যেন সেলজুক রাজপরিবারের ভাইদের মধ্যেও শুরু হয় ক্ষমতার অস্থির প্রতিযোগিতা। সুবিশাল সেলজুক রাষ্ট্র বিভক্ত হয় পাঁচ ভাগে। বরং প্রতিটি অংশের মধ্যেও ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক রাষ্ট্র! ফলে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষাংশে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ ভাগে) সেলজুক রাষ্ট্র পরিণত হয় বিভক্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন এক শক্তিতে। আর এ সময়েই সংঘটিত হয়েছিল পশ্চিমাদের ক্রুসেড অভিযান।

বিভক্তি ও ভাঙনের মাঝে

তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর অবস্থার দিকে তাকালে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, মুসলিম উম্মাহ শীঘ্রই এক ভয়াবহ সংকটে নিপতিত হতে যাচ্ছে। আসুন, আমরা সে সময় বিদ্যমান ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও বিভক্ত অঞ্চলগুলোর প্রতি দ্রুত একবার দৃষ্টি বোলাই। তাহলে সহজেই অনুধাবন করতে পারব যে, ক্রুসেড শক্তি কেন বিশেষভাবে এ সময়কালকেই ইসলামি বিশ্বে অভিযান পরিচালনার জন্য বেছে নিয়েছিল? এবং কেনই-বা তারা নির্বাচন করেছিল ইসলামি বিশ্বের এই বিশেষ অঞ্চলটিকে?

---

৬৫. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৪২৫ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৯৬১।

৪৭৮ হিজরি সনে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুলায়মান বিন কুতুলমিশের নেতৃত্বাধীন আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর) অঞ্চলে বসবাসকারী রোমান সেলজুক ও তুতুশ বিন আলপ আরসালানের নেতৃত্বাধীন শামে বসবাসকারী শামীয় সেলজুকদের মধ্যে বিরাট সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এ সময় পারসিক সেলজুকরা ছিল শামীয় সেলজুকদের পক্ষে। এই সংঘাতেই রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের শক্তিশালী শাসক সুলায়মান বিন কুতুলমিশ নিহত হন।[৬৬] ফলে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের রোমান সেলজুক রাষ্ট্রে বিরাট প্রশাসনিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কারণ, সুলায়মান বিন কুতুলমিশের পুত্র ও ঘোষিত যুবরাজ কিলিজ আরসালান তখন নিতান্তই বালক ছিলেন। ফলে এশিয়া মাইনর অঞ্চল ভেঙে ছোট ছোট বিভক্ত ও হানাহানিরত কয়েকটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এই আত্মকলহ ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের আরেকটি মন্দ পরিণতি হলো রোমান সেলজুক ও শামীয় সেলজুক উভয় গোষ্ঠী বিপদে-আপদে পরস্পর একতাবদ্ধ হওয়া ও একে অপরকে সহায়তা করার মতো নির্ভরতা ও আস্থা হারিয়ে ফেলে। ইতিহাসের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের মুখে ইসলামি শক্তির প্রতিরোধ ভেঙে পড়ার ক্ষেত্রে এই আস্থাহীনতার বিরাট ভূমিকা ছিল।[৬৭]

হিজরি পঞ্চম শতকের শেষে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের শেষে) সেলজুক সাম্রাজ্য নিম্নে উল্লেখিত অবস্থায় বিভক্ত ছিল।

১. বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্র (The Great Seljuq Empire)। ১ম মালিকশাহ এর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আরবি ইরাকসহ[৬৮] আশেপাশের সুবিস্তৃত অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আব্বাসি খিলাফতের ওপর এই

---

৬৬. শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/৯৩।

৬৭. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৮৯-৯০।

৬৮. ফুরাত ও দজলার নিম্নভূমিসহ ইরাকের সুবিস্তৃত সমতলভূমিকে ভৌগোলিকভাবে আরবি ইরাক (Arab Iraq) বলা হতো। আর এর পূর্ব দিকে অবস্থিত ইস্পাহান, রায়, কাজবিন, কির্মানশাহ-সহ বিস্তৃত পাহাড়িভূমিকে বলা হতো আজমি ইরাক (Persian Iraq)। জাগ্রোস পর্বতমালাকে উভয় অঞ্চলের বিভক্তি রেখা বিবেচনা করা যায়। আরবি ইরাকের সিংহভাগ বর্তমানে আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আর আজমি ইরাক বর্তমান ইরান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। [অনুবাদক]

বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্রেরই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল। মোটামুটি পর্যায়ের একতা থাকলেও এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও ছিল গৃহসংঘাত। প্রথম মালিকশাহর মৃত্যুর পর বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বারকিয়ারুক। তার বিরুদ্ধে তার চাচা ও নিকটাত্মীয়দের পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও ৪৯৮ হিজরি (১১০৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৬৯]

২. কিরমানি সেলজুক রাষ্ট্র (Kermani Seljuqs)। এর অবস্থান ছিল দক্ষিণ পারস্য ও পাকিস্তান অঞ্চলে। কারুত বেগ বিন দাউদ বিন মিকাঈল বিন সেলজুকের বংশধরদের হাতে এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল। কারূত ছিলেন মহান সেনাপতি আলপ আরসালানের সহোদর।

৩. পারসিক সেলজুক রাষ্ট্র। উত্তর ইরাক তথা আজমি ইরাক, রায়, হামাদান ও কুর্দিস্তানজুড়ে ছিল এ রাষ্ট্রের বিস্তৃতি।

৪. শামের সেলজুক রাষ্ট্র। এটি দামেশকের সেলজুক রাষ্ট্র নামেও পরিচিত। আলপ আরসালানের পুত্র তুতুশের পরিবার শামের সেলজুক রাষ্ট্রের হাল ধরেছিল। তারা নিজেরাও বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ছিল এবং শামকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে রেখেছিল। সামনে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

৫. রোমান সেলজুক রাষ্ট্র (Sultanate of Rum)। এর অবস্থান ছিল এশিয়া মাইনর অঞ্চলে। কুতুলমিশ (Qutalmish) বিন ইসরাইল বিন সেলজুক-এর পরিবার রোমান সেলজুক রাষ্ট্র পরিচালনা করত। পরিবারের প্রধান পুরুষ ছিলেন তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক সুলায়মান বিন কুতুলমিশ। তার নিহত হওয়ার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি।

---

৬৯. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১৫০, ১৬৪ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১২৭।



মানচিত্র নং-৮

সেলজুক সাম্রাজ্যের বিভক্তির চিত্র

এই অব্যাহত সংঘাত ও আত্মকলহের কারণে ক্রুসেডার বাহিনী প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে মুসলিম ভূখণ্ডের পরিস্থিতি একেবারেই দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

শাম ভূখণ্ডে রিজওয়ান বিন তুতুশ-এর নেতৃত্বে আলেপ্পোতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়। দামেশকে গঠিত হয় দাক্কাক বিন তুতুশ-এর নেতৃত্বে আরেকটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ফিলিস্তিনে ছিল উরতুক তুর্কমানির দুই পুত্র সুকমান ও ইলগাজির শাসন। উল্লেখ্য, উরতুক তুর্কমানি ছিলেন তুতুশ বিন আলপ আরসালানের অনুগত সেনাপতিদের একজন।[৭০]

তৎকালীন মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্য নৌশক্তিতে সেলজুকদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। ফলে সুর (Tyre), সিডন (Sidon), আক্কা (Acre), ব্যাবলস[৭১] (Byblos)-সহ শাম অঞ্চলের বিভিন্ন নৌবন্দর উবায়দিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অবশ্য আরেক গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় নগরী ত্রিপোলি

---

৭০. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৯৬ ও ইমাদুদ্দিন খলিল, *আল-ইমারাতুল উরতুকিয়া ফিল-জাযীরাতি ওয়াশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ৬৫-৬৬।

৭১. আরবি নাম جبيل (জুবাইল)।

(তারাবলুস)[৭২] তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রটির শাসক ইবনে আম্মার আবু তালিব শিয়া মতাদর্শী হলেও উবায়দি রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।[৭৩]

আর কদিন পরই যে শাম অঞ্চল হতে যাচ্ছে ক্রুসেড আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু, সেই শামের এই ছিল পরিস্থিতি!

অবশ্য এশিয়া মাইনর অঞ্চলের অবস্থাও এর চেয়ে সুখকর কিছু ছিল না। বিশেষত ৪৭৮ হিজরি সনে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুলায়মান বিন কুতুলমিশ নিহত হওয়ার পর উক্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে।[৭৪] সুলতান ১ম মালিকশাহ সুলায়মান-পুত্র কিলিজ আরসালানকে পারস্যে নিজ প্রহরা ও তত্ত্বাবধানে বন্দি করে রাখেন।[৭৫] অবশ্য মালিকশাহর মৃত্যু ও তার পুত্র বারকিয়ারুকের ক্ষমতা গ্রহণের সময় কিলিজ আরসালানকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিলিজ আরসালান এবার রোমান সেলজুকদের নতুন নেতায় পরিণত হন।[৭৬] অবশ্য তিনি পুরো এশিয়া মাইনর অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এশিয়া মাইনরের মতো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও দুর্যোগ-ফিতনায় তরঙ্গায়িত একটি অঞ্চলে দৃঢ়তার সঙ্গে টিকে থাকার জন্য যে মানের নেতৃত্ব-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কিলিজ আরসালানের তা ছিল না। এশিয়া মাইনর অঞ্চল মুসলিম-অমুসলিম উভয় শক্তি দ্বারাই আক্রান্ত হতো। একদিকে যেমন এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন তুর্কি গোত্র-উপগোত্রের মাঝে বিরোধ-সংঘাত লেগেই থাকত, অপরদিকে শামের সেলজুকদের সঙ্গেও এ অঞ্চলের

---

৭২. লিবিয়ার রাজধানী ও সর্ববৃহৎ নগরীর নাম আরবিতে তারাবলুস (طرابلس) এবং ইংরেজিতে ত্রিপোলি (Tripoli)। অপরদিকে লেবাননের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ও দেশটির উত্তর প্রদেশের রাজধানীর নামও তারাবলুস ও ত্রিপোলি। এখানে লেবাননের তারাবলুসের কথা বলা হয়েছে। উভয় তারাবলুসের মাঝে পার্থক্যকরণের জন্য আরবিতে লেবাননের তারাবলুসকে طرابلس الشام (শামের তারাবলুস) এবং লিবিয়ার তারাবলুসকে طرابلس الغرب (পশ্চিমা তারাবলুস) বলা হয়। [অনুবাদক]

৭৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪২৪-৪২৫।

৭৪. শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/৯৩।

৭৫. দেখুন : সিবতু ইবনিল জাওযি, *মিরআতুয যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'য়ান*, পৃষ্ঠা : ৪৪৩।

৭৬. যামবাউর (Zambaur), *মুজামুল আনসাব ওয়াল উসুরাতিল হাকিমা ফিত তারীখিল ইসলামি*, পৃষ্ঠা : ২১৫।

প্রশাসনের বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে ছিল। অধিকন্তু বিগত পাঁচ শতাব্দী ধরে মুসলমানদের ঐতিহ্যগত শত্রুর ভূমিকা পালনকারী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পাশেই ছিল এশিয়া মাইনরের অবস্থান। এ সবকিছু মিলিয়ে এ অঞ্চলের নেতৃত্বদানের জন্য প্রয়োজন ছিল অত্যুচ্চ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক দক্ষতার।

তা ছাড়া এশিয়া মাইনর তখন একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ইজমির (İzmir) অঞ্চল ছিল যাখারিশের শাসনাধীন। দানিশমান্দ নামে আরেকটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ছিল। আহমাদ গাজি নামক জনৈক তুর্কমেন সেনাপতি রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলজুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি। এশিয়া মাইনর অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রোমান সেলজুক ও দানিশমান্দ রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ লেগে থাকত। আর তাই খুব কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতেও পরস্পরের ঐক্য ও মিত্রতার সম্ভাবনা ছিল একেবারেই বিরল।[৭৭]

সমস্যা শুধু এতটুকুই নয়; ৪৯০ হিজরি সনে (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে শুরু হয় বাইজান্টাইনদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। এ সময় বাইজান্টাইন বাহিনী উপকূলীয় অঞ্চলের নিসনিয়া ও আবুনিয়া অঞ্চল দখল করে নেয়।[৭৮] এশিয়া মাইনর অঞ্চলের পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ আর্মেনীয় নাগরিকের বসবাস। আর্মেনীয়রা আবহমান কাল ধরে এ অঞ্চলে নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বসবাস করত। কিন্তু হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আর্মেনিয়া দখল করে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এরপর হিজরি পঞ্চম শতকে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের বাইজান্টাইন অধিভুক্ত অংশে সেলজুকদের বিজয়াভিযান চলাকালে সেলজুকরা আর্মেনিয়া অঞ্চলেও আক্রমণ চালায় এবং বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস ও বিরান করে ফেলে। বাধ্য হয়ে আর্মেনীয়রা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল কিলিকিয়ায় (Cilicia) চলে যায় এবং সেখানেই নিজেদের মতো করে বসতি স্থাপন করে। এ ছাড়াও আর্মেনীয়দের অনেকে বিক্ষিপ্তভাবে মালাতিয়া (Malatya), এডেসা

---

৭৭. Grousset : Hist. des Croisades I, L V11-L111.

৭৮. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১০০।

(Edessa)[৭৯] ও এন্টিয়ক (Antakya) অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে সুসংহত হয়।[৮০] উল্লেখ্য, শেষোক্ত তিনটি অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচুর বাইজান্টাইন নাগরিক বসবাস করত। এবার বিক্ষিপ্ত আর্মেনীয়রা আশ্রয় নেওয়ায় অঞ্চল-তিনটি পরিণত হয় ক্যাথলিক আর্মেনীয় ও অর্থোডক্স বাইজান্টাইনদের যৌথ আবাসভূমিতে। অবশ্য সুলায়মান বিন কুতুলমিশ ৪৭৭ হিজরি সনে (১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) এন্টিয়ক অঞ্চলকে রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। এরপর সেখানে বসবাসের জন্য প্রচুর পরিমাণ মুসলিম নাগরিকও আগমন করে এবং পূর্ব থেকেই বসবাসরত আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী ও বাইজান্টাইনদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে থাকে।[৮১] ওদিকে বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান ১ম মালিকশাহ এডেসায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তিনি জিজিয়া প্রদানের শর্তে থোরোস নামক জনৈক আর্মেনীয় সেনাপতিকে সেখানে প্রশাসক হিসেবে বহাল রাখেন।[৮২] একই ঘটনা ঘটে মালাতিয়ার ক্ষেত্রেও। সেখানে কর্তৃত্ব ছিল জিবরিল নামক জনৈক আর্মেনীয় সেনাপতির। সেও সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার শর্তে প্রশাসক পদে বহাল থাকে।[৮৩]

এভাবে এই তিনটি এলাকায় আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্বে কিলিকিয়া অঞ্চলে আর্মেনীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পুরো অঞ্চলের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল ও অনিরাপদ করে তোলে। আর এ সবকিছু পরবর্তী সময়ে প্রথম ক্রুসেড আগ্রাসনের সফলতার ক্ষেত্রে সরাসরি

---

৭৯. আরবি নাম الرُّهَا (রুহা)। এন্টিয়কের মতো এডেসা নগরীও সেনাপতি সেলিউকাস নিকাটর প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে সপ্তদশ হিজরি সনে বিশিষ্ট সাহাবি ইয়ায বিন গুনম রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পুরো জাযিরা অঞ্চল যুদ্ধ ব্যতিরেকে সন্ধির মাধ্যমে জয় করে। তখন এ অঞ্চলের অন্যান্য নগরীর সঙ্গে এডেসাও বিজিত হয়। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত লিউসান চুক্তি (The Treaty of Lausanne) অনুসারে আধুনিক তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের যেসব এলাকা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়, এডেসা তার একটি। নগরীটি তুরস্কের উরফা প্রদেশ (Şanlıurfa Province)-এর রাজধানী।

৮০. Lorga : L'Armenie Cilicienne, pp. 7-88.

৮১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/২৯৪ ও সিবতু ইবনিল জাওযি, *মিরআতুয যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'য়ান*, পৃষ্ঠা : ৪২২।

৮২. Chalandon : Hist de la Premiere Croisade, p. 175.

৮৩. Setton, op cit 1, p. 299.

প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, যেমনটি ক্রুসেডকালের আলোচনায় আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে।

একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এশিয়া মাইনর অঞ্চলে সেলজুক-আর্মেনীয়-বাইজান্টাইন মিশ্রিত জনবিন্যাস, শাসনকেন্দ্রগুলোর পারস্পরিক বিভেদ-কলহ, দল-গোষ্ঠীগুলোর মাঝে নেতিবাচক সম্পর্ক, প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠিন স্নায়ুবিক উত্তেজনা ও টানাপোড়েন—এ সবকিছু এ অঞ্চলের পরিস্থিতিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল। আশা করি এই সংক্ষিপ্ত ধারণার মাধ্যমে আমরা এশিয়া মাইনর ও আশেপাশের অঞ্চলে আসন্ন ক্রুসেড আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট সহজে উপলব্ধি করতে পারব।

মোটামুটি এই ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের পূর্ব প্রান্তের পরিস্থিতি। এককথায় বললে—তৎকালীন ইসলামি প্রাচ্যের পরিস্থিতি মোটেও কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বার্তা বহন করছিল না। না এশিয়া মাইনর অঞ্চলে; না শাম, ফিলিস্তিন, ইরাক বা পারস্য অঞ্চলে।

বিচ্ছিন্ন কিছু রাষ্ট্রের কথা বাদ দিলে অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্বের পরিস্থিতিও সন্তোষজনক ছিল না। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে সম্ভবত এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হলো মিশর। কেননা, মিশর ছিল ক্রুসেড অভিযানের লক্ষ্যবস্তুর অতি নিকটে; বরং কোনো কোনো ক্রুসেড অভিযান তো সরাসরি মিশরকে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হয়েছিল; যেমনটি সামনে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে।

মিশর আরেক মৃত্যুগহ্বরে!

মিশরে তখন ফাতিমি নামধারী উবায়দিদের শাসন চলছিল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময়ের অব্যাহত প্রচেষ্টার পর ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দি রাজপরিবার মিশরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এর ফলে উত্তর আফ্রিকার পর মিশরেও উবায়দি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে শাম ও হিজায অঞ্চলেও উবায়দিদের শাসনক্ষমতা বিস্তৃত হয়।

উবায়দিরা ছিল শিয়াদের একটি চরমপন্থী ও উগ্রবাদী দল। শিয়াদের যাবতীয় ভ্রান্ত আকিদা তো তারা লালন করতই; সঙ্গে অতিরিক্ত বিভিন্ন মনগড়া আকিদাও তারা যুক্ত করে নিয়েছিল। ইসলামের মৌলিক

বিশ্বাসসমূহে তাদের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি মূলধারার শিয়াদের চেয়েও অনেক বেশি ও ভয়াবহ। নিজেদেরকে তারা নবী-তনয়া হজরত ফাতিমা রাযি.-এর বংশধর দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা মাগরিব অঞ্চলের জনৈক ইহুদির বংশধর। ২৯৬ হিজরি সনে (৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দিরা প্রথম মাগরিবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর তারা ধীরে ধীরে উত্তর আফ্রিকায় কর্তৃত্ব বিস্তার করে এবং ফাতিমি খিলাফত নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। অথচ প্রকৃত বিচারে তাদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থা না খিলাফত নামের উপযুক্ত, না ফাতিমি উপাধির। দুষ্ট উবায়দি রাষ্ট্র মূলত গড়ে উঠেছিল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আলিমসমাজকে হত্যা ও নির্যাতন-নিপীড়নের ওপর ভিত্তি করে। একদিকে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে, অন্যদিকে অন্যায়-অনাচার, পাপ-পঙ্কিলতা ইত্যাদির বিস্তার ঘটিয়েছে। সঠিক আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস এবং নীতি ও নৈতিকতায় বিকৃতি সাধনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মধারা ছিল কল্পনাতীত ভয়ংকর। উবায়দিরা ছিল শিয়া ইসমাইলি সম্প্রদায়ভুক্ত।[৮৪] ইসমাইলি সম্প্রদায় মূল শিয়া গোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন একটি দল, যারা নিজেদেরকে ইসমাইল বিন জাফর সাদিক-এর প্রতি সম্বন্ধ করে থাকে।[৮৫] ইসমাইলিদের দাবি মতে শিয়াদের সপ্তম ইমাম হলেন জাফর সাদিক-পুত্র ইসমাইল। অপরদিকে শিয়াদের আরেক শাখা ভ্রান্ত ইছনা

---

৮৪. যেহেতু শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণই উদ্ভট মস্তিষ্কপ্রসূত; বরং বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসকে কলুষিত করার অসৎ উদ্দেশ্যে রচিত, তাই কালের পরিক্রমায় তাদের মাঝে নতুন নতুন বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের উদ্ভব হতে থাকে এবং একে কেন্দ্র করে অসংখ্য দল-উপদল সৃষ্টি হতে থাকে। আর তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে শিয়াদের দল-উপদলের সংখ্যা একশ-এর কাছাকাছি পাওয়া যায়। তবে এসব দল-উপদলের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো ইমামিয়া সম্প্রদায়। বর্তমানে পৃথিবীতে যত শিয়া সম্প্রদায় আছে, সব ইমামিয়া সম্প্রদায়েরই শাখা-উপশাখা। ইমামিয়া সম্প্রদায় হজরত আলি রাযি.-এর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ইমামগণের বিদ্যমানতার আকিদা পোষণ করে এবং ইমামদের সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে। ইমামিয়া সম্প্রদায়েরও অনেকগুলো শাখা আছে। তন্মধ্যে তিনটি শাখা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ : ইছনা আশারিয়া, ইসমাইলিয়া ও যায়দিয়া। শিয়া মতাদর্শের উৎপত্তি, পরিচিতি ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য দেখুন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত— *ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড। [অনুবাদক]

৮৫. জাফর সাদিক ছিলেন ইসমাইলি ও দ্বাদশ ইমামবাদী উভয় সম্প্রদায়ের ঐকমত্যে শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম।

আশারিয়া বা দ্বাদশ ইমামবাদী সম্প্রদায়ের দাবি মতে সপ্তম ইমাম হলেন জাফর সাদিকের অপর পুত্র মুসা কাজিম। ইসমাইলিরা আরও দাবি করে যে, ইমাম ইসমাইল-পরবর্তী তিন ইমাম লুক্কায়িত ছিলেন; এরপর একাদশ ইমাম হলেন উবায়দি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আল-মাহদি। ইসমাইলি সম্প্রদায় নিজেদের ইমামদের সম্পর্কে বিভিন্ন অবাস্তব ও গর্হিত আকিদা পোষণ করে এবং তাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ও অমূলক বিভিন্ন কারামতের দাবি করে। তারা এ দাবিও করে যে, আল্লাহ তাদের ইমামদের মাঝে দেহগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তাআলা এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। এই ভ্রান্ত আকিদাকে পুঁজি করেই ইসমাইলি শাসকদের কেউ কেউ নিজেকে নবী বাদ দিয়ে স্বয়ং স্রষ্টা ও ইলাহ পর্যন্ত দাবি করেছে। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলো ষষ্ঠ উবায়দি খলিফা হাকিম বি-আমরিল্লাহ। তাকে সম্বোধন করেই জনৈক শিয়া কবি নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি রচনা করেছিল—

مَا شِئْتَ لَا مَا شَاءَتِ الْأَقْدَارُ   فَاحْكُمْ فَأَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

> তাকদির কিছুই নয়; তা-ই হয় যা আপনি চান। তাই শাসন করুন ইচ্ছেমতো, আপনিই তো একক ও মহাশক্তিমান!

এসব ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারী ও গর্হিত অন্যায়-অনাচার বিস্তারকারী ফাসিক ইসমাইলি শাসকগণই নিজেদের বিষাক্ত মতাদর্শ ও উগ্রবাদী চিন্তাধারা বিস্তারের লক্ষ্যে মিশরে জামে আযহার প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা তাদের কূট-কৌশল তাদের বক্ষমূলেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। কয়েক শতকের পরিক্রমায় জামে আযহার পরিণত হয়েছে ইসলামি বিশ্বে বিশুদ্ধ সুন্নাহর বিকিরণ ও বিচ্ছুরণের অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে।

ইসমাইলি সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরাম এমনকি খোদ নবীদেরকেও গালমন্দ ও সমালোচনা করে। এমনকি তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানেও বিভিন্ন কটুবাক্য উচ্চারণ করে থাকে। দ্বিতীয় উবায়দি শাসক আল-কায়িম মুহাম্মাদ আবুল কাসিমের নির্দেশে তার অনুচরেরা হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করত—'আয়েশা ও তার স্বামীকে অভিসম্পাত করো, গুহা ও গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারীদের অভিসম্পাত করো।' যারা হজরত আবুবকর রাযি. ও হজরত উমর রাযি.-এর প্রতি হৃদ্যতা প্রকাশ করত, ইসমাইলিরা তাদেরকে হত্যা করত। আজানে কেউ 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললে তারা তার জিহ্বা কেটে

ফেলত। উবায়দি সাম্রাজ্যে আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর বদলে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' বলার রীতি চালু করা হয়েছিল। তাদের এ জাতীয় আরও অনেক অন্যায়-অপকর্মের ফিরিস্তি ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে রয়েছে।[৮৬]

এই দুষ্ট ইসমাইলি উবায়দি সম্প্রদায়ই তৎকালীন মিশর শাসন করত। ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) অষ্টম উবায়দি শাসক আল-মুসতানসিরের মৃত্যু হলে উবায়দিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ মিশরে বসবাস করত এবং মিশর শাসন করত। তারা আল-মুসতানসিরের পুত্র মুসতালির প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে 'মুসতালিয়া' নামে পরিচিত। আরেক অংশ মুসতালির ভাই নিযার বিন আল-মুসতানসিরের প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে 'নিযারিয়া' নামে পরিচিত। অনাচার ও অনিষ্টতায় এবং নৃশংসতা ও নির্মমতায় নিযারিয়া গোষ্ঠী ছিল পূর্বের সকল শিয়া গোষ্ঠীর চেয়ে কয়েক গুণ অগ্রসর। তারা ধর্মীয় নিদর্শনসমূহকে বিলুপ্ত করেছিল, দ্বীনের ফরজ বিধানসমূহের বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ করেছিল। তারপরও তারা নিজেদেরকে 'মুসলমান' দাবি করত! ইতিহাসে তারাই বাতিনি বা হাশাশিন ফিরকা নামে পরিচিত। মুখে তারা একরকম প্রকাশ করত, আর অন্তরে লালন করত আরেক রকম চিন্তা। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের প্রশিক্ষিত গুপ্তঘাতকদের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশিষ্ট আলিম ও বীরযোদ্ধাদের হত্যা করা। সামনে বর্ণিত ইতিহাসে দেখা যাবে, মুসলমানদের ভূখণ্ড হতে আগ্রাসী ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংগ্রামী আন্দোলন চলাকালে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক। বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে অনেকগুলো সুরক্ষিত দুর্গের অধিকারী বাতিনি সম্প্রদায়ের ছিল প্রচুর প্রশিক্ষিত যোদ্ধাপুরুষ। এসব যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে ছিল চরম নির্মম ও পরাক্রান্ত। বাতিনিরা বিভিন্ন কৌশলে নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট জনপদগুলোতে সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠীগত দাঙ্গার আগুন উসকে দিত এবং বিভিন্ন জনপদে ধ্বংসযজ্ঞ চালাত। প্রকৃত বিচারে শিয়া বাতিনি ফিরকা মুসলিম উম্মাহর জন্য বাইজান্টাইন ও ক্রুসেডারদের চেয়েও অধিক ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

---

৮৬. শিয়া ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে দেখুন : ইবনুল আছির কৃত *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ইবনে কাছির কৃত *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* ও আবু শামা আল-মাকদিসি কৃত *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নূরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*।

হিজরি পঞ্চম শতকের শেষভাগে ক্রুসেডার বাহিনীর আগ্রাসনের প্রাক্কালে মিশরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল ইসমাইলি মুসতালিয়া সম্প্রদায়। ততদিনে তারা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অঞ্চলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাদের ক্ষমতা মিশরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য সবসময়ের মতোই তখনও শাম অঞ্চল ও ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। এ কারণেই তারা শামের সুন্নি মতাদর্শী সেলজুক রাষ্ট্রের সঙ্গে সব সময় যুদ্ধে জড়িয়ে থাকত। সেলজুক রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন এবং শাম ও ফিলিস্তিন ভূমির বিভিন্ন অংশ দখল করার লক্ষ্যে উবায়দি সরকার কখনো রোমান বাইজান্টাইনদের সঙ্গে, আবার কখনো সরাসরি ক্রুসেডারদের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপনে সামান্য দ্বিধা করত না। এককথায়, সন্দেহাতীতভাবেই শিয়া উবায়দি রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মনীতি ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক।

ইসমাইলি উবায়দি সরকার নিয়ন্ত্রিত তৎকালীন মিশরীয় সেনাবাহিনী ছিল মুসলিম উম্মাহর গলার কাঁটার ন্যায়। এই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল দীর্ঘ দিন। পরবর্তী সময়ে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ইসলামি ইতিহাসের দুই প্রাতঃস্মরণীয় মহান বীর সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ রহ. ও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর এ অঞ্চলে আবির্ভাবের মাধ্যমে। ইনশাআল্লাহ, ঘটনাবিবরণীর ধারাবাহিকতায় সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মোটামুটি এই ছিল এশিয়া মাইনর, শাম, ইরাক ও মিশরের তৎকালীন পরিস্থিতি। নিঃসন্দেহে এক বা একাধিক কারণে এ পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অবশ্য ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ডের পরিস্থিতিও এর চেয়ে সুখকর কিছু ছিল না।

আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে তখন চলছিল গজনবি পরিবারের শাসন। পরিতাপের বিষয় হলো, গজনবি রাজপরিবার তখন নিজেদের অন্তগামী সময়ে উপনীত হয়েছিল। ফলে ক্রুসেড আগ্রাসনের কেন্দ্রবিন্দু শাম অঞ্চলকে সহায়তা করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। অধিকন্তু গজনবি রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল শাম অঞ্চল থেকে বেশ দূরে।

ইয়ামেন ভূখণ্ডের শাসনক্ষমতা তিনটি গোত্রের মাঝে বিভক্ত ছিল—বনু নাজাহ, বনু ছুলায়হি ও বনু যুরাই। ক্ষমতা ও ভূখণ্ড দখল নিয়ে তাদের

মধ্যে হানাহানি-সংঘাত লেগেই থাকত। অধিকন্তু তাদের অধিকাংশ ছিল শিয়া মতাবলম্বী। গোত্র-তিনটি মিশরের শিয়া উবায়দি সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে চলত।

মাগরিব অঞ্চল ও আন্দালুসের পরিস্থিতি

তিউনিসিয়ায় তখন ছিল বনু যিরির শাসন। যিরি রাজপরিবারও ততদিনে ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক নগরী সিসিলি দ্বীপ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ইতালির নরম্যান গোষ্ঠী ৪৮৪ হিজরি সনে (১০৯১ খ্রিষ্টাব্দে) সিসিলিতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে যিরি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়। এর ফলে একটানা দুইশ সত্তর বছরের ইসলামি শাসনের পর সিসিলি দ্বীপে মুসলিম-অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে।[৮৭]

সমকালীন ইসলামি বিশ্বের একটিমাত্র অঞ্চলে তখন ইসলামি কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল; আর সেটি হলো মরক্কো, পশ্চিম আফ্রিকা ও আন্দালুস অঞ্চল। এই পুরো অঞ্চল তখন সুবিশাল মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময় মুরাবিতি সাম্রাজ্যের কান্ডারি ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের অনন্যসাধারণ মহান সেনাপতি ও কালজয়ী মুরাবিতি শাসক ইউসুফ বিন তাশফিন রহ.। তিনিই ৪৭৯ হিজরি সনে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) আন্দালুসের মধ্যভাগে অবস্থিত যাল্লাকা প্রান্তরে সংঘটিত অবিস্মরণীয় এক যুদ্ধে স্পেন ও ফ্রান্স থেকে আগত ক্রুসেডার বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন।

কিন্তু এই সুবিশাল ও শক্তিশালী মুরাবিতি সাম্রাজ্যও ক্রুসেড আগ্রাসনের মোকাবিলায় ইসলামি প্রাচ্যকে সহায়তা করতে সক্ষম ছিল না। এর কারণ কেবল ভৌগোলিক দূরত্বই নয়; বরং মুরাবিতি সাম্রাজ্যের শতভাগ সামরিক শক্তি তখন সার্বক্ষণিকভাবে ব্যস্ত ছিল একদিকে উত্তর আন্দালুসের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, আরেকদিকে পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন পৌত্তলিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

মোটামুটি এই হলো হিজরি পঞ্চম শতকের শেষভাগে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে) ইসলামি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর

---

৮৭. দেখুন : ইবনে খালদুন, *তারীখু ইবনি খালদুন*, ৬/১৫৫।

সাধারণ পর্যালোচনা। এই অধঃপতিত পরিস্থিতিই মূলত ক্রুসেডারদের সামনে আমাদের দুর্গসমূহে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করেছিল। সামনের আলোচনায়ও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে, ক্রুসেডারদের আগ্রাসন তাদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির কারণে ছিল না; প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুর্বলতা, বিভেদ-অনৈক্য, আমাদের শক্তির বিভক্তি এবং আমাদের দ্বীনবিমুখতাই ছিল এর কারণ। নিঃসন্দেহে এগুলো এমন কার্যকারণ, যার ধ্বংসাত্মক প্রভাবের বিষয়টি কোনো জ্ঞানী ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই অস্পষ্ট নয়।

ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে এই ছিল মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি। জানার বিষয় হলো, সেই যুগসন্ধিক্ষণে খ্রিষ্টান ইউরোপের পরিস্থিতি কেমন ছিল? সামনের পরিচ্ছেদে আমরা সে বিষয়টিই জানার চেষ্টা করব।

* * *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপ পরিস্থিতি

তৎকালীন ইউরোপীয় জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ও সূক্ষ্ম অবগতি ব্যতিরেকে আমরা কিছুতেই ক্রুসেড যুদ্ধের তত্ত্ব ও রহস্য, উদ্দীপক ও অনুপ্রাণিকা এবং হেতু ও কার্যকারণসমূহ উপলব্ধি করতে পারব না। আর সমকালীন ইউরোপীয় জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে কেবল রাজনৈতিক মানদণ্ডে অবগতিও যথেষ্ট নয়; বরং জানতে হবে তখনকার ইউরোপের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান সম্পর্কেও। তৎকালীন ইউরোপীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি স্বচ্ছ ও পূর্ণ একটি চিত্র আমাদের সামনে প্রতিভাত হলে আমরা ইসলামি বিশ্বের প্রাচ্য অংশে আক্রমণের লক্ষ্যে এই সর্বজনীন ইউরোপীয় আগ্রহ ও তৎপরতার কারণ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হব।

এক. ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

ঐতিহাসিক ক্রুসেড যুদ্ধকাল এবং ক্রুসেড যুদ্ধ পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতকে এবং ক্রুসেড যুদ্ধের সংঘটনকাল একাদশ শতকে ইউরোপের চলমান ঘটনাপ্রবাহে গির্জার বিরাট প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল। ইউরোপীয় সমাজের ওপর গির্জা-নিয়ন্ত্রণ কেবল চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় দিক থেকেই ছিল না; বরং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় সমাজের ওপর গির্জাগুলোর ছিল একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ।(৮৮)

গির্জার বিচ্যুতি

তৎকালীন ইউরোপে গির্জাগুলো চাইলেই শাসক ও রাজন্যবর্গ হতে আস্থা প্রত্যাহার করে নিতে পারত। গির্জা কোনো শাসক বা প্রশাসকের

---

৮৮. Cambridge Medievel History, Vol. 5. P. 273.

ওপর থেকে আস্থা প্রত্যাহার করে নিলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যেত এবং দল-মত নির্বিশেষে সকলে উক্ত শাসককে প্রত্যাখ্যান করত। এ কারণেই সকলে গির্জার মতামতের প্রতি অত্যন্ত ভীতি ও আতঙ্ক এবং মর্যাদা ও সমীহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। তৎকালীন পোপদের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিধি ও পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পেতে নিম্নোক্ত ঘটনাটি সহায়ক হতে পারে।

জার্মান সম্রাট ৪র্থ হেনরি ছিলেন সমকালীন ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সম্রাট। একবার কোনো এক কারণে তৎকালীন পোপ ৭ম গ্রেগরি (Gregory VII) তার প্রতি বিরাগভাজন হলেন। সম্রাট প্রথমে পোপের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন পোপ ৭ম গ্রেগরি সম্রাটের প্রতি তার আস্থা প্রত্যাহার করলেন, সম্রাটকে গির্জার সন্তুষ্টি হতে বঞ্চিত ঘোষণা করলেন এবং এর অনিবার্য পরিণাম হিসেবে তার মতবিশ্বাস অনুযায়ী হেনরিকে স্বর্গ হতেও বঞ্চিত ঘোষণা করলেন! ফলে জনগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করতে লাগল। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে পৌঁছল যে, তার রাজক্ষমতা নিয়েই টানাটানি! তখন সম্রাটের শুভানুধ্যায়ী ও ঘনিষ্টজনেরা তাকে পোপের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার পরামর্শ দিল। বিশাল ক্ষমতাধর জার্মান সম্রাট তখন কী করলেন?! তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তার প্রতি পোপের অসন্তুষ্টিতে তিনি যে অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত, তা প্রকাশ করতে তিনি জার্মানি থেকে রোম পর্যন্ত নগ্নপদে হেঁটে যাবেন!

সম্রাট রোমে পৌঁছার পর পোপ পূর্ণ তিন দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জানালেন। এই তিন দিন সম্রাট হেনরি পোপের সাক্ষাৎলাভের অনুমতির অপেক্ষায় বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে গির্জার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে সম্রাট ক্ষমালাভের উদ্দেশ্যে পোপের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং পোপের পদযুগল চুম্বন করতে লাগলেন!![৮৯]

আপন রাজত্ব রক্ষায় মহান সম্রাটের সামনে এটাই ছিল একমাত্র সমাধান!

রোমের গির্জা ছিল সকল গির্জার মূলকেন্দ্র বা সদর দফতর। রোমে অবস্থিত ক্যাথলিক রোমান গির্জার প্রধান কর্তা পোপ ইউরোপের সকল

---

৮৯. Ephraim Emerton, The correspondence of pope Gregory VII. Selected letters from the Registum pp. 111-112.

ক্যাথলিক গির্জা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঘটনাপ্রবাহের ওপরও কর্তৃত্ব খাটাতে পারতেন। গির্জা তখন কেবল উপাসনার স্থান বা ধর্মীয় বিষয়াদির শিক্ষাদান-কেন্দ্রই ছিল না; গির্জা ছিল এমন এক বিশাল প্রতিষ্ঠান, যেখানে বার্ষিক বিরাট অঙ্কের সম্পদ জমা হতো। এ কারণেই গির্জাগুলো ইউরোপে বিশাল জায়গিরের মালিক ছিল। বরং এসব জায়গিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন সামরিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণও গির্জার হাতেই থাকত। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে গির্জার অধিপতিগণ অন্যান্য সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিও করত। আর তাই পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের মাঝে দৃশ্যমান ও বোধগম্য অর্থে কোনো ঐক্যবন্ধন না থাকা সত্ত্বেও রোমের গির্জা এসব রাষ্ট্রের ওপর প্রকৃত শাসকের ন্যায় ক্ষমতা ও অধিকার ফলাতে পারত।

যদিও সে কালের ইউরোপীয় খ্রিষ্টসমাজে গির্জা এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী ছিল; কিন্তু গির্জার পাদরি ও যাজকগণ মূর্খতা-ভ্রষ্টতা, বিপথগামিতা ও ভারসাম্যহীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত ছিল। সাধারণত তাদের মাঝে মোটেও ধর্মীয় কুশলতা, প্রশাসনিক যোগ্যতা বা নেতৃত্বসুলভ দক্ষতা থাকত না।[৯০] কেবল এতটুকুই নয়; বরং খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতকে দায়িত্ব পালনকারী অধিকাংশ পোপ ছিল আর্থিক বা নারীঘটিত বিষয়ে চরম নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত।[৯১] নিজেদেরকে তারা সন্ন্যাসী ও দুনিয়াবিরাগী দাবি করলেও তাদের অনেকেই বিভিন্ন অনৈতিক ঘটনায় জড়িয়ে নিহত হয়েছিল।[৯২] তারা ঘোষণা করত যে, আমরা পার্থিব ভোগ-বিলাসমুক্ত, জগৎ ও দাম্পত্য সম্পর্ক-বিমুখ। এরপর তারাই চুরি, অর্থ-আত্মসাৎ ও ব্যভিচারের ন্যায় চরম গর্হিত ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ত।

নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন! এসব পাদরি ও ধর্মযাজকেরা খ্রিষ্টধর্মে যেসব বিকৃতি সাধন করেছে, সংযোজন ও পরিবর্তন করেছে, পরে তা পালন করা তাদের জন্যই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা নিজেদের ওপর আরোপিত এসব স্বরচিত বিধিবিধান পালনে অক্ষম

---

৯০. নরম্যান ফ্রাঙ্ক ক্যান্টোর, *আত-তারীখুল ওয়াসিত*, ১/৩০৩।

৯১. Barraclough, The med. Papacy, p. 63.

৯২. দেখুন : কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৭৯।

হয়েছে। তাদের এই অনাচার সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾

> আর সন্ন্যাসবাদের বিষয়টা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল। আমি তাদের ওপর তা বাধ্যতামূলক করিনি। বস্তুত তারা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিল; কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। [সুরা হাদীদ : ২৭]

গত শতাব্দীর শেষ দিকের একটি ঘটনা সম্ভবত প্রিয় পাঠকসমাজের অজানা নয়। বিখ্যাত আমেরিকান ধর্মযাজক জিমি সোয়াগার্টকে[১৩] আমেরিকান জনসাধারণ আমেরিকার নিউ অরলিন্সের একটি হোটেলে জনৈকা পতিতার সঙ্গে হাতেনাতে পাকড়াও করেছিল। এই জিমি সোয়াগার্ট সেসব পাদরিদের একজন, যারা মহান ইসলামি দাঈ আহমাদ দিদাত রহ.[১৪]-এর বিরুদ্ধে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিল।

---

[১৩]. জিমি সোয়াগার্ট (Jimmy Lee Swaggart) একজন আমেরিকান ধর্মযাজক। নিজের ব্যক্তিমালিকানাধীন টেলিভিশন স্টেশনের মাধ্যমে তিনি আপন মতাদর্শ অনুযায়ী খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও অন্যান্য কাজ করতেন। তাকে গ্রেফতার করার সময় পাবলিক প্রসিকিউশন তার বিরুদ্ধে চারিত্রিক স্খলনের অভিযোগ দায়ের করে। পরে তিনি আন্তর্জাতিক বড় বড় বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এবং জনৈকা দুশ্চরিত্রা পতিতা নারীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেন। সোয়াগার্ট The Evangelist ম্যাগাজিনেরও মালিক ছিলেন। বিশিষ্ট ইসলামি দাঈ শায়খ আহমাদ দিদাতের সঙ্গে তার বিতর্কের ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ। দেখুন : https://bit.ly/2rUUaIc ও https://bit.ly/2MYntko

[১৪]. শায়খ আহমাদ দিদাতের জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে। নয় বছর বয়সে তিনি হিজরত করে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। শিক্ষাজীবন শুরু করার পর তিনি অল্প সময়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে যান। তবে আর্থিক দীনতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা সমাপ্ত না করেই কাজে লেগে যেতে বাধ্য হন। জ্ঞানপিপাসু আহমাদ দিদাত কাজের ফাঁকে ফাঁকেই অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু সহকর্মী তার সামনে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে নিয়ে কটূক্তি করলে তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি এ বিষয়ের একজন বিখ্যাত বিতার্কিকে পরিণত হন। তিনি বিভিন্ন খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্কটি ছিল খ্রিষ্টান যাজক জিমি সোয়াগার্টের সঙ্গে। তার রচিত বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হলো *Al=*

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা সকলের সামনে তার আসল রূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন। আজ যে ব্যক্তিই নিউ অরলিন্সের সেই হোটেলটির পাশ দিয়ে যায়, সে-ই ঘৃণাভরে খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক জিমি সোয়াগার্টের কেলেঙ্কারির ঘটনা স্মরণ করে।

এই চরম নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতন সত্ত্বেও তৎকালীন পোপ ও পাদরিদের ইউরোপের যাবতীয় পরিস্থিতির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ছিল। এক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করত তৎকালীন অধিকাংশ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মূর্খতা, শিক্ষাহীনতা, বোধ ও উপলব্ধির অগভীরতা ও পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা। ধর্মীয় বিষয়েও মূর্খ ইউরোপীয় সমাজে চরম নিম্নগামী মানসিকতা বিরাজমান ছিল। তাদের ধর্ম ছিল রূপকথা, কল্পকথা, কুসংস্কার ও মিথ্যা ধ্যান-ধারণানির্ভর। ভূত-প্রেত, অশরীরী আত্মা, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ইত্যাদির চিন্তা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে কোনো সরল গ্রামীণ সমাজে। এই নিম্নগামী পরিস্থিতি পোপ ও পাদরিদেরকে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনমস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করার এবং মগজ ধোলাই করে জনগণের চিন্তাশক্তিকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।[১৫]

ক্রুসেড যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে পোপ ও পাদরিরা যেসব চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল, তা হলো—পৃথিবীর ধ্বংস ও সমাপ্তি অত্যাসন্ন, কিয়ামত দিবস অতি সন্নিকটে, ঈসা মাসিহের অন্তর্ধানের এক হাজার বছর পরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এই প্রচারণার সূচনা হয়েছিল ৪২৪ হিজরি সনে (১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে)। সেকালে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলেই খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা তাকে নিজেদের এই প্রচারণার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে দাবি

=*Quran the Ultimate Miracle* (আল-কুরআন চূড়ান্ত মুজিযা), *What the Bible Says about Muhammed* (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বাইবেল কী বলে?), *Is the Bible God's Word* (বাইবেল কি আল্লাহর বাণী?) ইত্যাদি। শায়খ আহমাদ দিদাত ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ইন্তেকাল করেন।

১৫. Boase, Kingodoms and Strongholds of the Crusaders, pp. 16-17; Bishop, op cit., p. 105; Wolff the Awarkening of Europ, p. 202; Coulton, The Medieval Scene, pp. 33-34.

করত। যেমন ইতালিতে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বিভিন্ন বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের ঘটনা।[৯৬]

এ ধরনের প্রচারণার ফলে একদিকে জনমনে ভয়-ভীতি, শঙ্কা-আতঙ্ক, উদ্বেগ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতো এবং জনগণ নিজেদের পাপ ও অন্যায় নিয়ে চরম আশঙ্কায় দিনাতিপাত করত, অপরদিকে এই মানসিক চাপ হতে জনগণকে উদ্ধার এবং জনগণের পাপমোচনে সহায়তা করতে পোপ, পাদরি ও গির্জার ভূমিকা অধিক গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়াত। ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ এ নীতিতে কঠোরভাবে অটল ছিল এবং নিজেদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে একে ব্যবহার করছিল। পাপমোচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ছিল গির্জাকে অর্থ প্রদান। এ বিষয়টিই পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয়ে 'ক্ষমা-চেক'[৯৭]-এর রূপ ধারণ করে। কয়েক শতাব্দী পর খ্রিষ্টীয় প্রোটেস্ট্যান্ট[৯৮] মতবাদের জনক[৯৯] মার্টিন লুথার[১০০] অর্থের

---

৯৬. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৯।

৯৭. ক্ষমা-চেক (ইংরেজিতে indulgence, ল্যাটিন ভাষায় Indulgentia) হলো মধ্যযুগে ইউরোপে প্রচলিত একধরনের চুক্তিপত্র। নির্ধারিত অর্থ প্রদানের বিনিময়ে খ্রিষ্টান জনগণ রোমান গির্জার কাছ থেকে এই পত্র ক্রয় করতে পারত এবং এর মাধ্যমে নিজেদের পাপমোচনের নিশ্চয়তা লাভ করত। [অনুবাদক]

৯৮. খ্রিষ্টানসমাজে বিভিন্ন দল-উপদলের অস্তিত্ব থাকলেও বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল তিনটি : ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রোটেস্ট্যান্ট। ৪৫০-৫১ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালসিডনে অনুষ্ঠিত খ্রিষ্টানদের ৪র্থ সর্বজনীন মহাসভায় (The Council of Chalcedon) গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টধর্মে ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্স ও ক্যালসিডনীয় খ্রিষ্টধর্ম নামে বিভক্তির সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী সময়ে ১০৫৪ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্মের মহাবিভাজনের সময় ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স চার্চের চূড়ান্ত বিভক্তি ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে একে কেন্দ্র করে ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট নামে তৃতীয় আরেকটি বৃহৎ খ্রিষ্টান সম্প্রদায় অস্তিত্ব লাভ করে। ব্যাপকার্থে ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল খ্রিষ্টানকেও প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয়। এই বিবেচনায় প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর সম্মিলিত নাম। [অনুবাদক]

৯৯. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২৩,৩৮।

১০০. মার্টিন লুথার। তিনি রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে গির্জার বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মবিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। এ কারণেই তাকে খ্রিষ্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীর জনক বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন কারণে তিনি ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ক্যাথলিক গির্জার ক্ষমা-চেক বাণিজ্য, সন্ন্যাসীদের আজীবন কুমারব্রত পালন ইত্যাদি। মার্টিন লুথার=

বিনিময়ে পাপমুক্তির এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আন্দোলন করেন।

প্রাচ্যভূমি নিয়ে গির্জার প্রচারণা

অবশ্য এক্ষেত্রে পোপ ও পাদরিরা আরও একটি পদ্ধতিকে পাপমোচনের মাধ্যম হিসেবে প্রচার করত। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এর যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আর তা হলো, পাপমোচনের জন্য হজরত ঈসা মাসিহ আ.-এর জন্মভূমি ফিলিস্তিনে তীর্থযাত্রার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ।[১০১] প্রায়শ্চিত্তমূলক এই তীর্থযাত্রায় 'যিশুখ্রিষ্ট'র অনুসারীদের প্রচুর পরিশ্রম ও দীর্ঘ সময় ব্যয় হতো। কখনো কখনো একবারের তীর্থযাত্রায়ই কেটে যেত সাত বছর! পাপমোচনের ক্ষেত্রে গির্জাকে বড় অঙ্কের অর্থপ্রদানের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ফিলিস্তিন অভিমুখে তীর্থযাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[১০২] এ কারণেই যেসব দরিদ্র খ্রিষ্টান অর্থের বিনিময়ে গির্জার সন্তুষ্টি ক্রয় করতে অক্ষম ছিল, তারা তীর্থযাত্রায় আগ্রহী হতো। এভাবেই খ্রিষ্টানসমাজে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড অভিমুখে তীর্থযাত্রা এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থান ও নিদর্শনসমূহের দর্শন-সৌভাগ্য লাভের এক অনিঃশেষ ধারা শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে এই তীর্থযাত্রা খ্রিষ্টসমাজের সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয় এবং ফিলিস্তিনের নাম তাদের মাঝে বহুল প্রচলন লাভ করে। নিঃসন্দেহে এই প্রচারণা পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ক্রুসেড যুদ্ধের চিন্তাধারাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে মানসিকভাবে সহায়ক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কেননা, ক্রুসেড অভিযান তো এমন অঞ্চলে পরিচালিত হবে, যে অঞ্চল খ্রিষ্টানসমাজে প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত, যার নাম তারা বহুবার শুনে এসেছে। কেবল শোনাই নয়; তাদেরকে ফিলিস্তিন যেতে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। বরং পৃথিবীর মহাপ্রলয়ের পূর্বেই যারা নিজেদের পাপ মোচন করতে আগ্রহী, কিন্তু তীর্থযাত্রার উপযুক্ত দৈহিক বা আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই, তাদের কাছে তো ততদিনে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড এক স্বপ্নভূমিতে পরিণত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সবকিছু পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের

=নিজে জনৈকা সন্ন্যাসিনীকে বিয়ে করেন এবং তাদের ছয়জন সন্তান হয়। ক্যাথলিক গির্জা এই বিদ্রোহের কারণে মার্টিন লুথারের নিন্দা করে এবং তার প্রতি নাস্তিকতার অপবাদ আরোপ করে।

১০১. John Wilkinson(ed.), Jerusalem Pilgrims before the Crusades, p. 42.

১০২. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৪০।

চোখে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের গুরুত্ব ও আকর্ষণ স্ফীত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[১০৩]

ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্র ও দলিল-দস্তাবেজে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তৎকালে শাম ও ফিলিস্তিন শাসনকারী মুসলমানগণ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে আগমনকারী খ্রিষ্টানদের অত্যন্ত উদারতা ও উষ্ণতার সঙ্গে স্বাগত জানাত। এক্ষেত্রে তাদেরকে কোনো ধরনের বাধাদান প্রচেষ্টার কথা ঐতিহাসিক কোনো সূত্রেই প্রমাণিত নয়। অথচ তৎকালীন পোপগণ তীর্থযাত্রীদের বাধাগ্রস্ত হওয়ার নানা ধরনের কল্পকাহিনি প্রচার করে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের তীর্থযাত্রা সহজ ও কণ্টকমুক্ত করার লক্ষ্যে ফিলিস্তিনে হামলার পরিকল্পনাকে বৈধতাদানের চেষ্টা করত।[১০৪] সাধারণ জনগণের মনমস্তিষ্ক ও ধনসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গির্জাগুলোর অনিঃশেষ লোভ ও চাহিদা, নিজেদের পাপ-আধিক্য ও মহাপ্রলয়ের আসন্নতার কারণে জনগণের ব্যাপক ভীতি, মাসিহের জন্মভূমি ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এবং সেখানে তীর্থযাত্রার মাধ্যমে সারা জীবনের সকল পাপ মোচনের সুবর্ণ সুযোগ—এই সবকিছু মিলে যে ধর্মীয় আবহ ও পটভূমি তৈরি হয়েছিল, নিঃসন্দেহে তা ক্রুসেড যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন আক্রমণ পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে আরও কিছু পটভূমি যুক্ত করা উচিত, যার দ্বারা বিশেষ করে ফিলিস্তিনের প্রতি এবং সাধারণভাবে ইসলামি প্রাচ্যের প্রতি পশ্চিমাদের গভীর আকর্ষণের প্রেক্ষাপট বুঝতে সুবিধা হবে। আর তা হলো, রোমের কোনো কোনো পোপ রোমান (পশ্চিমা) ক্যাথলিক গির্জা ও ইস্টার্ন (প্রাচ্যের) অর্থোডক্স গির্জা—উভয় গির্জাকে এক ছাদের নিচে সমবেত করার এবং এর মাধ্যমে ইউরোপীয় খ্রিষ্টসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন লালন করত। স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রত্যাশা ছিল, এই ঐক্যবদ্ধ

---

১০৩. Bradford, The Sword and the Scimitar the Sage of the Crusades, pp. 13-14; Michaud : Hist. des Croisades, 1, p. 14; Runciman, "The Pilgrimages to Palestine before 1095" in Setton (ed): A history of the Crusades, vol. pp. 74-75.

১০৪. এ জাতীয় স্বীকৃতি সংক্রান্ত ডায়েরিটি জেরুজালেম-গির্জার স্মারক নামে প্রসিদ্ধ। দেখুন : commeroratorium of the churches of jerusalem, in Palestine Pilgrims, pp. 138-139.

আর খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত তীর্থযাত্রার আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে দেখুন : Runciman, A History of the Cruseds, vol., 1, pp. 39-44.

প্লাটফরমের নেতৃত্ব দেবে ক্যাথলিক ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। ইতিহাসে প্রথম সক্রিয়ভাবে এই পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন পোপ ৭ম গ্রেগরি। ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা যার আমলে হয়েছিল, সেই পোপ ২য় আরবান (Pope Urban II)-এর পূর্ববর্তী পোপ হলেন এই গ্রেগরি। পোপ গ্রেগরি এই বিরল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল তৎকালীন বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস (Alexios I Komnenos)-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হওয়া।[১০৫] সম্রাট অ্যালেক্সিয়াসের শাসনামলেই ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে পোপ গ্রেগরি সম্রাট অ্যালেক্সিয়াসের সঙ্গে পত্রবিনিময় অব্যাহত রেখেছিলেন। এই যোগাযোগের ওপর ভরসা করেই বাইজান্টাইন সম্রাট কিছুদিন পর সেলজুক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পশ্চিমা ক্যাথলিকদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। অথচ অর্থোডক্স মতাদর্শের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস ছিলেন পোপ, ইউরোপীয় ক্যাথলিক জনগণ ও শাসকদের প্রতি চরম বিদ্বেষী।

আশা করি, উল্লিখিত প্রেক্ষাপট ও পটভূমিকাসমূহ ক্রুসেড হামলায় অংশগ্রহণের জন্য পশ্চিমাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের উন্মাদনার কারণ সুস্পষ্ট করতে পেরেছে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই ধর্মীয় প্রেক্ষাপটই তৎকালীন ইউরোপীয় জনগণের ক্রুসেড অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার একমাত্র কার্যকারণ ছিল না। বরং ক্রুসেড যুদ্ধের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটসহ আরও কিছু কার্যকারণ।

দুই. অর্থনৈতিক পটভূমি

ইউরোপ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটে দিনাতিপাত করছিল। ইউরোপে যদিও প্রচুর উর্বর ভূমি ছিল; কিন্তু তা ছিল চাষাবাদের অনুপযুক্ত ও বন-জঙ্গলে ভরা।[১০৬] এসব ভূমি চাষাবাদের উপযুক্ত করে তোলা এবং সঠিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত

---

[১০৫]. এ বিষয়ে জানতে দেখুন : ইসহাক উবায়দ, *রুমা ওয়া বাইজানতা : মিন ক্বাতীআতি ফুশিউস হাত্তাল গাযবিল লাতীনী কনুসতানতাইন*, ৮৬৯-১২০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা : ২৫ : ৩৯।

[১০৬]. Pianter : westem Europ, pp. 5-6; Coulton, The Medieval Scene, pp. 33-34.

কারিগরি বিদ্যা, কৌশল ও প্রযুক্তি এবং ঘাম-ঝরানো পরিশ্রম। কিন্তু ইউরোপের মূর্খতাপূর্ণ পরিবেশে, বিশেষ করে কনকনে শীত ও তুষারপাত-বিশিষ্ট উত্তরাঞ্চলে এসব কিছুই ছিল না। তা ছাড়া ইউরোপের দুর্বল যোগাযোগব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের স্বল্পতা ও বিচ্ছিন্নতাও কৃষিবান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল। এ কারণে এমনকি ব্যবসার উদ্দেশ্যেও এক স্থান হতে অন্য স্থানে খাদ্যসামগ্রী পৌছানো সম্ভব হতো না। ফলে যেকোনো দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আঞ্চলিক খাদ্যউৎপাদন হ্রাস পাওয়ার অনিবার্য পরিণতি হতো দুর্ভিক্ষ ও গণ প্রাণহানি। কখনো কখনো এ ধরনের দুর্ভিক্ষ লাগাতার কয়েক বছর স্থায়ী হতো। ফলে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ বিলীন হয়ে যেত। এর সঙ্গে যখন যুক্ত হতো রোগ-ব্যাধি ও মহামারির প্রাদুর্ভাব এবং সুচিকিৎসার অনুপস্থিতি, তখন মৃতের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত। এসব কারণে ইউরোপীয় সমাজে দরিদ্র ও কৃষকশ্রেণির লোকেরা অত্যন্ত কষ্টে সংকীর্ণ পরিবেশে জীবনযাপন করত। তাদের অনুভূতিজুড়ে ছিল সার্বক্ষণিক হতাশা ও নিরাশা। এর সঙ্গে যুক্ত করুন কৃষকদের ওপর আরোপিত বিশাল অঙ্কের করের বোঝা; তাহলে সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে, সমকালীন ইউরোপীয় কৃষকশ্রেণি কী পরিমাণ দুর্ভোগ ও ক্লেশ সহ্য করত।

একাদশ শতকের শেষভাগে, বিশেষভাবে ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্বের দশ বছরে উত্তর ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিসহ খ্রিষ্টান ইউরোপজুড়ে হয়েছিল প্রাণঘাতী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখলে কিছুদিন পরই বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ ও সৈন্যদের এ অঞ্চল ছেড়ে ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে পাড়ি জমানোর কারণও হয়তো সুস্পষ্ট হবে। অর্থাৎ তৎকালীন ইউরোপের পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় ছিল যে, বেঁচে থাকতে চাইলে তাদের এমন কোথাও পালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য ছিল, যেখানে খাবার ও পানীয় রয়েছে; হোক সে জায়গা শত কিংবা হাজার মাইল দূরে। হাজার মাইল পথ অতিক্রম করা তো ক্ষুধায়-অনাহারে ধুকে ধুকে মারা যাওয়ার চেয়ে নিকৃষ্টতর নয়![১০৭]

উল্লিখিত চিত্রের বিপরীতে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে দক্ষিণ

---

১০৭. Maurice Keen, The Pelican History of the Middle Ages, p. 123; Mayer, The Crusades, p. 22; Marc Bloch: feudal Society, pp. 72-73; Cohn"The Appeal of the Crusades", p. 36.

ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্রও ছিল! সেকালে সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। দক্ষিণ ইউরোপের বণিকশ্রেণি নিজেদের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থানের সুবিধাকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়ে ভূমধ্যসাগরের অববাহিকায় অবস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য করত। বরং তারা নিজেদের বাণিজ্যিক পদচারণা এশিয়া ও আফ্রিকার অভ্যন্তরেও বিস্তৃত করেছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্ববর্তী আমলে এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর ছিল বিশেষ করে জেনোভা[১০৮] ও পিসা (Pisa)-সহ ইতালির বিভিন্ন নৌবন্দর। সে যুগে এসব নৌবন্দর বিরাট অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করত। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র অর্থনৈতিক শক্তি ছিল ইসলামি অর্থনৈতিক শক্তি। তৎকালে ইসলামি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো শাম, মিশর, মাগরিব ও আন্দালুস অঞ্চল। অর্থনৈতিক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ইতালির নৌবন্দরগুলো যথাসাধ্য মুসলিম নৌবহর ও মুসলিম বাণিজ্যবহরকে ঘায়েল করার প্রতীক্ষায় থাকত। মূলত এ কারণেই সিসিলি থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, খ্রিষ্টানদের সে প্রচেষ্টা সফলও হয়েছিল। দুইশ সত্তর বছর শাসন করার পর ৪৮৪ হিজরি সনে (১০৯১ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানরা সিসিলি থেকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত হয়। এটি ক্রুসেড অভিযান শুরু হওয়ার মাত্র সাত বছর পূর্বের ঘটনা। সিসিলি দ্বীপে মুসলিম শক্তির পতন নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের জন্য সমুদ্রপথ নিরাপদ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[১০৯]

এই অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেড অভিযান পরিচালনার জন্য ইউরোপে আন্দোলন শুরু হয়, তখন ইতালির বণিকশ্রেণি তাতে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকতার আগ্রহ প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে তারা একদিকে নিজেদের একমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করার, অপরদিকে

---

১০৮. জেনোভা ও জেনেভা দুটি ভিন্ন নগরীর নাম। জেনোভা (ইংরেজিতে Genoa, ইতালীয় ভাষায় Genova) হলো লিগুরিয়া অঞ্চলের রাজধানী এবং ইতালির ষষ্ঠ বৃহত্তম নগরী। অপরদিকে জেনেভা (ইংরেজিতে Geneva, ফরাসিতে Genève) হলো সুইজারল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল নগরী। [অনুবাদক]

১০৯. Heyd (W.): Hist. du Commerce 1, 132-133.

বিজিত ইসলামি ভূখণ্ডে নতুন ও বিশাল অর্থনৈতিক বাজার উন্মুক্ত করার স্বপ্ন দেখছিল।

এভাবেই ইউরোপের দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট দরিদ্রশ্রেণি এবং সম্পদের প্রাচুর্যে তৃপ্ত ধনিকশ্রেণির স্বার্থ এক মোহনায় মিলিত হয়েছিল এবং ইসলামি বিশ্বে হামলা চালাতে ও ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উভয় শ্রেণির মাঝে অলিখিত ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল!

তিন. রাজনৈতিক পটভূমি

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে, নির্দিষ্ট করে বললে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হান, গোথ ও ভ্যান্ডাল জনগোষ্ঠীসহ উত্তর জার্মানির কিছু বর্বর জাতি-গোষ্ঠীর উপর্যুপরি ধ্বংসাত্মক হামলায় সুপ্রাচীন পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। অত্যন্ত বর্বর ও দস্যু প্রকৃতির এসব জাতি-গোষ্ঠী ঐতিহ্যবাহী রোমান সভ্যতার প্রতি সামান্য সমীহ প্রদানের পরিবর্তে লাগাতার হামলা, ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট চালিয়ে রোমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে মাত্র দুই শতাব্দীর পরিক্রমায় এসব জার্মান গোত্র পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংমিশ্রণের কারণে ইউরোপীয় অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মাঝেও তাদের উগ্র-হিংসাত্মক চেতনা ও অপরাধমূলক স্বভাব ছড়িয়ে পড়ে।[১১০]

এরপর প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের শতাব্দীকাল পূর্বে খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ইউরোপ উপর্যুপরি কয়েকটি বিশাল সামরিক আঘাতের শিকার হয়। এসব আঘাতের কোনোটি ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চল থেকে আগত ভাইকিং দস্যুদের[১১১] পক্ষ থেকে, আবার কোনোটি ছিল আন্দালুস বা উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত মুসলিম অভিযাত্রীদের পক্ষ থেকে। এভাবে

---

১১০. Robert S. Hoyt and Stanley Chodorow. Europe in the middle Ages, pp. 38-55; Mayer, The Crusades, p. 15-16.

১১১. উত্তর ইউরোপের উপদ্বীপ স্ক্যান্ডিনেভিয়া (Scandinavia) অঞ্চলের অধিবাসীদের নরম্যান (The Normans) বলা হয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন মিলে অঞ্চলটি গঠিত। তৎকালে নরম্যান জাতিগোষ্ঠী অত্যন্ত বর্বর ও অসভ্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে তারা দস্যুবৃত্তি চালাত। ইতিহাসে তারা ভাইকিং (Viking) জলদস্যু নামেও পরিচিত। নরম্যান ভাইকিংরা অষ্টম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে লুটতরাজ চালায় এবং বসতি স্থাপন করে। হিংস্র ও বর্বর ক্রুসেড অভিযানে নরম্যানরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। [অনুবাদক]

লাগাতার আক্রমণ ও আক্রান্ত পরিস্থিতি ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে ধীরে ধীরে যুদ্ধাংদেহি মনোভাব বৃদ্ধি করে এবং তাদের মন-মানস সামরিক মানসে রূপান্তরিত হতে থাকে। সে যুগে ইউরোপের চোখে অশ্বারোহী যোদ্ধার সাজ ছিল একজন মহান ও অভিজাত ব্যক্তির রূপ।[১১২]

ইউরোপের অভ্যন্তরে এই চারিত্রিক ও মানসিক পরিবর্তনের অনিবার্য দাবি ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী পরস্পর বিরোধ ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে। বাস্তবেও তা-ই ঘটে। সাম্রাজ্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লালসা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও সংঘর্ষ। একপর্যায়ে ইউরোপে সামন্তবাদের (Feudalism) উত্থান ঘটে এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন করদরাজ্যে পরিণত হয়। প্রতিটি করদরাজ্য একজন জমিদার বা সামন্তের অধীনে পরিচালিত হতো। সামন্তদের কেউ কেউ নিজ অঞ্চলের শক্তিশালী রাজার আনুগত্য করত, আবার কেউ কেউ স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করত। অন্যের ভূমি দখল করার উগ্র মানসে এসব সামন্তের মধ্যে সব সময়ই চলত পারস্পরিক হানাহানি-লড়াই। আর তাই প্রত্যেক জমিদার ও সামন্তের ছিল নিজস্ব সামরিক মিলিশিয়া বাহিনী। এভাবে একেকটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও বিবাদমান সামরিক শক্তি সৃষ্টির কারণে পুরো ইউরোপজুড়ে এক বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই রোমের গির্জা বিরোধ-বিসংবাদে লিপ্ত এসব শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল।[১১৩]

পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছিল ফ্রান্সে। বাস্তব অর্থে তখন ফরাসি রাজার নিজ দেশের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না। দেশের কর্তৃত্ব ছিল বিভিন্ন সামন্তের হাতে। এক দেশ পরিণত হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইমারত ও রাজ্যে। প্রতিটি রাজ্যের ছিল নিজস্ব বাহিনী।[১১৪] জার্মানির পরিস্থিতি অবশ্য ফ্রান্সের তুলনায় কিছুটা সহনশীল ছিল। জার্মানিতে তখন শাসনক্ষমতা ছিল শক্তিশালী রাজা ৩য় হেনরির হাতে। ৩য় হেনরির মৃত্যুর পর শাসনভার গ্রহণ করেন তার পুত্র ৪র্থ হেনরি। এটি ক্রুসেড যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। এই দুই শক্তিমান

---

১১২. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৪২-৪৩।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৪।

১১৪. নরম্যান ফ্রান্ক ক্যান্টোর, *আত-তারীখুল ওয়াসিত*, ১/২৭২-২৮২।

শাসকের দৃঢ়তাপূর্ণ শাসনের কারণে জার্মানির পরিস্থিতি তুলনামূলক স্বাভাবিক ছিল।[১১৫] অবশ্য এ সময়ই পোপের সঙ্গে রাজা ৪র্থ হেনরির বিরোধের ঘটনা ঘটে, যার কথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।[১১৬] এই বিরোধ-প্রতিক্রিয়া আমরা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহেও লক্ষ করব।

ইংল্যান্ডেও তখন একজন শক্তিশালী শাসকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি হলেন ১ম উইলিয়াম বা দিগ্‌বিজয়ী উইলিয়াম (William the Conqueror)। কিন্তু সে সময় ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভঙ্গুরপ্রায়। ফলে পুরো ইউরোপের কথা চিন্তা করার পরিবর্তে ইংল্যান্ড তখন নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল।[১১৭] ওদিকে আন্দালুসের উত্তরে অবস্থিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো নিজেদের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করছিল আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে।[১১৮]

এ সময় ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে সর্বশেষ সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ইতালি। আক্ষরিক অর্থেই ইতালি তখন অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সামরিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় নরম্যান (ভাইকিং) জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্বে থাকা দক্ষিণ ইতালির অঞ্চলগুলোর কথা। রবার্ট গোয়েসকার্ড (Robert Guiscard) নামক অত্যন্ত শক্তিশালী ও তীব্র সাম্রাজ্যবাদী চেতনা লালনকারী জনৈক নেতার উক্ত অঞ্চলে আবির্ভাব ঘটার পর ইতালি ঐতিহ্যবাহী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করার পর্যায়ে উপনীত হয়।[১১৯] রবার্ট গোয়েসকার্ড বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কাছ থেকে বলকান অঞ্চলের কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে সক্ষম হন। এমনকি প্রথমে বাইজান্টাইনদের ও পরে সেলজুকদের অধিকারে থাকা এন্টিয়ক অঞ্চল দখল করার জন্য ইতালিয়ান নরম্যানরা প্রথমবারের মতো যেসব প্রচেষ্টা চালায়, সেগুলোর পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানও তারই ছিল। রবার্ট গোয়েসকার্ডের পুত্র বোহেমন্ড

---

১১৫. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৭৪।

১১৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে পোপতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের পারস্পরিক সংঘাত সম্পর্কে জানতে দেখুন : Hoyt and Chodorow: Europ in the Middle Ages, pp. 292-302; Barraclough : The Medieval Papacy, pp. 39-77.

১১৭. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৫৭।

১১৮. Benjamin W. Wheeler : The Reconquest of Spain, pp. 31-40.

১১৯. Charanis, op. cit., p. 188.

(Bohemond I) এসব অভিযানে সরাসরি নেতৃত্বদান করেন। এই বোহেমন্ডই ছিলেন পরবর্তী সময়ে সংঘটিত প্রথম ক্রুসেড অভিযানের অন্যতম সেনাপতি।[১২০]

নরম্যান জনগোষ্ঠীনির্ভর ইতালির এই ক্রমবর্ধমান শক্তির আত্মপ্রকাশের প্রায় কাছাকাছি সময়েই ইতালির ভেনিস (Venice) বন্দরকেন্দ্রিক একটি সামরিক নৌশক্তির উত্থান ঘটে। পুরো ভূমধ্যসাগর অববাহিকার ঘটনাপ্রবাহের পটপরিবর্তনে এই নৌশক্তির সরাসরি ভূমিকা ছিল।[১২১]

তাহলে আলোচনার সার এই দাঁড়াচ্ছে যে, ইউরোপের রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন পরস্পর বিবাদমান ও সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রতিযোগিতারত অনেকগুলো সামরিক শক্তির অস্তিত্ব ছিল। আর যেহেতু ইউরোপ ছিল তুলনামূলক সংকীর্ণ একটি ভূখণ্ড; অধিকন্তু প্রচণ্ড তুষারপাতের পাশাপাশি জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পাহাড় ও পর্বতমালার কারণে ইউরোপের ভূ-প্রকৃতিও ছিল যথেষ্ট জটিল ও দুর্গম, তাই স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপের উচ্চাভিলাষী অনেক নেতার মাথায় ইউরোপের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের চিন্তা উঁকি দিতে থাকে। ইতালিয়ান নরম্যান নেতা রবার্ট গোয়েসকার্ডও এ জাতীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। কিছুদিন পরই সংঘটিত ক্রুসেড অভিযানে ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের এই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

চার. সামাজিক পটভূমি

তৎকালীন ইউরোপীয় জনসাধারণ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসে অভ্যস্ত ছিল না। তারা পরিভ্রমণরত যাযাবর বেদুইনদের ন্যায় জীবনযাপন করত। পানাহারদ্রব্য বা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তারা বারবার স্থান পরিবর্তন করত বলে একটি নির্দিষ্ট ভূমিতে অবস্থান ও বসবাসের চেতনা ও রীতি তাদের মাঝে অনুপস্থিত ছিল। সম্ভবত এ বিষয়টিও তৎকালীন ইউরোপের অনেক মানুষকে তুলনামূলক উন্নত ও সচ্ছল জীবনব্যবস্থার খোঁজে পুরো ইউরোপ ছেড়ে ফিলিস্তিনে গমনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১২২]

সামন্তবাদনির্ভর ব্যবস্থা চালু থাকায় ইউরোপের কৃষকসমাজ সামন্ত ও

---

১২০. Ostrogorsky : op. cit., p. 317.

১২১. Bishop, op. cit., p. 46.

১২২. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৩৬।

জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড নিপীড়ন ও জুলুমের শিকার হতো। তৎকালীন ইউরোপে কৃষকদের সামান্য অধিকারও ছিল না। জমির সঙ্গে কৃষকরাও বিক্রি হতো; একই সঙ্গে মালিক বদল ঘটত ভূমি ও ভূমি-শ্রমিকের। জমিদারদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের পেছনেই কৃষকদের রক্ত পানি হতো। এর ফলে ইউরোপীয় কৃষকসমাজে ধীরে ধীরে ভূমি-মালিক ও সামন্তদের প্রতি ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে। কিন্তু এ সংকট থেকে নিষ্কৃতির কোনো সুযোগ দূরে থাক, স্বপ্ন ও আশাও তাদের মানসপটে ছিল না।[১২৩]

কেবল এই শোষণ ও লাঞ্ছনাকর জীবনব্যবস্থাই নয়; পুরো ইউরোপ তখন নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। মূর্খতা ও শিক্ষাবিমুখতার শিকার ছিল সমাজের বিশেষ ও সাধারণ উভয় শ্রেণি। জ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার প্রতি সামান্য আকর্ষণ ও অনুরাগ সমকালীন ইউরোপে ছিল না। এই জ্ঞানদীনতা ও পশ্চাৎপদতার কারণে যেকোনো চিন্তাধারা বা অনুপ্রাণিকা অতি সহজে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত। তাদের সামনে কেউ কোনো চিন্তাধারা তুলে ধরলে সেটি ভালো না মন্দ, তার পরিণতিই-বা কী হতে পারে—এসব বিশ্লেষণ করার মতো বুদ্ধি, মনোবৃত্তি বা মানসিক যোগ্যতা তাদের ছিল না। ছিল না পরস্পর সাংঘর্ষিক দুটি মতাদর্শ সামনে এলে একটিকে বেছে নেওয়ার মতো জ্ঞান-যোগ্যতা। নিঃসন্দেহে এসব বিষয়ও তাদেরকে সবকিছু ছেড়ে যুদ্ধের জন্য ফিলিস্তিন অভিমুখে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল।[১২৪]

উল্লিখিত আলোচনায় যেসব পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের কথা এসেছে, তার মাধ্যমে আমাদের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজ ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতিগত বিবেচনায় বিভক্ত অনেকগুলো দল-উপদলের সমষ্টি। প্রতিটি দল-উপদলেরই ছিল আপন আপন আয়তন ও সামর্থ্য অনুপাতে ছোট-বড় আশা-প্রত্যাশা, অভিলাষ-স্বার্থচিন্তা ও বিস্তৃত পরিকল্পনা। সুতরাং প্রিয় পাঠক, এই শতধা বিভক্ত ইউরোপিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে যদি এমন

---

১২৩. Boissonade: Life and Work in Med Europe, p. 85.

১২৪. Boase, Kingdoms and Strongholds of the Crusaders, pp. 16-17; Bishop, op. cit., p. 105. Wolff the Awarkening of Europ, p. 202; Coulton, The Medieval Scene, pp. 33-34.

কোনো ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে, যিনি তার জাদুকরী যোগ্যতাবলে সকলের বিভিন্নমুখী চিন্তা-চেতনাকে এক-অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন এবং বস্তুগত ও বুদ্ধিগত স্তরের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলকে ধাবিত করবেন এক লক্ষ্য পানে; সবাই ছুটে যাবে অভিন্ন গন্তব্য অভিমুখে নিজেদের সৌভাগ্যের সন্ধানে, তাহলে নিশ্চিত করেই কি তা চরম বিস্ময়ের বিষয় হবে না?! অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সমকালীন ইউরোপে সেই চরম বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটেছিল!

তাহলে দেখার বিষয়—

কে সেই জাদুকরী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি?

কীভাবে তিনি শতধাবিভক্ত ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীকে এক সুতোয় গাঁথতে সক্ষম হলেন?

আর কীই-বা ছিল ক্রুসেড অভিযানগুলোর প্রকৃত কারণ ও কার্যকারণ, অনুঘটক ও অনুপ্রাণিকা?

ক্রুসেড অভিযান কেবলই একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ ছিল, না অর্থনৈতিক লড়াই, নাকি ধর্মীয় সংঘাত?

সামনের পরিচ্ছেদে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে নেব, ইনশাআল্লাহ।

* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম ক্রুসেড অভিযানের প্রচারণা

ক্যাথলিক গির্জায় নতুন নেতৃত্বের আগমন

৪৮০ হিজরি সনে (১০৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইউরোপীয় ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি ক্যাথলিক গির্জার পোপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের পটপরিবর্তনে নতুন এই পোপের দায়িত্ব গ্রহণের বিরাট ভূমিকা ছিল। বরং বোধকরি এমনটি বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আলোচ্য এই ব্যক্তিটি তার দায়িত্বকালে যে ভূমিকা ও প্রভাব রেখে গেছেন, তার প্রতিক্রিয়া আজ শত শত বছর পরও বিদ্যমান আছে। নতুন পোপ হিসেবে অভিষিক্ত সেই ব্যক্তিটি হলেন ২য় আরবান (Pope Urban II)। ৪৮০ হিজরি হতে ৪৯২ হিজরি (১০৮৮-১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত একটানা এগারো বছর তিনি রোমে ক্যাথলিক চার্চের পোপের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেড অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত এই ২য় আরবানই গ্রহণ করেছিলেন।[১২৫]

২য় আরবান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও চৌকশ, বিচক্ষণ ও চতুর এবং ক্ষুরধার কূটনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন বাকপটু ও বাগ্মী এবং প্রচণ্ড দুঃসাহসী একজন ব্যক্তি। সমকালীন বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। এ সবকিছুর পাশাপাশি তার অন্তর্জগৎজুড়ে ছিল ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ ও বিদ্বেষ। কারণ, এই মুসলিম জাতিই প্রাচ্যে ঈসা মাসিহের স্মৃতিবিজড়িত ভূমি ফিলিস্তিন শাসন করছে, তারাই একটানা চার শতাব্দী ধরে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ আন্দালুস শাসন করে যাচ্ছে। ২য়

---

[১২৫]. মুহাম্মাদ মুনিস, *আল-হুরুবুস সালীবিয়্যাহ : আল-আলাকা বাইনাশ শারক্বি ওয়াল গারবি*, পৃষ্ঠা : ৬৩-৬৫।

আরবান পোপের দায়িত্ব গ্রহণকালেও আন্দালুস ইসলামি শাসনের অধীনে ছিল।

পোপ আরবান ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তিনি তার পূর্ববর্তী পোপ ৭ম গ্রেগরির প্রচেষ্টাকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত দুই খ্রিষ্টান গির্জাকে একত্র করার স্বপ্ন দেখতেন এবং নিজেকে একক খ্রিষ্টানসমাজের সর্বোচ্চ নেতা ও একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে কল্পনা করতেন।[১২৬]

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার পূর্বতন পোপ ৭ম গ্রেগরির আমলে পোপ ও বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের পারস্পরিক সম্পর্ক মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইতিপূর্বে সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস পোপ গ্রেগরির কাছে মুসলিম সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তাও চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন পোপ গ্রেগরি শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারায় বাইজান্টাইনদের সহায়তায় উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি।[১২৭]

অবশ্য বাইজান্টাইন সম্রাট এরপর আবারও পশ্চিমাদের সামরিক সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন এবং ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে) পোপ ২য় আরবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাহায্যপ্রার্থনা করার জন্য ইতালিতে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন।[১২৮]

বাইজান্টাইন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে পোপ আরবান বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি যদি বাইজান্টাইন সম্রাটের আবেদনে সাড়া দেন এবং ব্যাপক পরিসরে সহযোগিতায় সচেষ্ট হন, তাহলে এই একটিমাত্র পদক্ষেপের মাধ্যমে অল্প সময়েই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারবেন। যেমন :

১. এর মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজজীবনে রোমান ক্যাথলিক গির্জার

---

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬৬।

১২৭. Vasiliev : op. 1, p. 358.

১২৮. বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রেরিত বার্তার মূল পাঠ জানতে দেখুন : AOL, tom. II, pp.101-105.
আরও দেখুন : কাসিম আবদুহু কাসিম, *আল-খালফিয়্যাতুল আইদুলিজিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১১৫-১১৬। আর পোপের কাছে অ্যালেক্সিয়াস যে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন, তার বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে দেখুন : Duncalf, "The Councils", pp. 227-228.

ভূমিকা ও প্রভাব নতুন করে শক্তিশালী হবে। কারণ, এর মাধ্যমে পোপ নতুন করে সেই পাপমুক্তির প্রচারণা চালাতে পারবেন, যা ছিল তৎকালীন পুরো ইউরোপীয় সমাজের পরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। ইউরোপীয় জনগণ তো পোপের কাছ থেকে এমন কিছু লাভের প্রত্যাশাতেই থাকত, যা অতীত জীবনের যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ মোচন করে দেবে।[১২৯]

২. বাইজান্টাইন সম্রাটের আবেদনে সাড়া দিয়ে শীঘ্রই তিনি এমন এক সামরিক অভিযানের সূচনা করতে পারবেন, যাকে কেন্দ্র করে ইউরোপের বিভক্ত রাষ্ট্র ও করদরাজ্যগুলো একত্র হবে এবং সকলের একক নেতৃত্বভার তার হাতেই অর্পিত হবে। এর মাধ্যমে তিনি পুরো ইউরোপের ওপর রোমের ক্যাথলিক গির্জার সামরিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। আর যেহেতু সামরিক অভিযানটি একটি ধর্মীয় রূপ ধারণ করবে, তাই ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রের শাসক বা করদরাজ্যের সামন্ত তাতে অংশগ্রহণে আপত্তি করলে তাকে পাপমুক্তির সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করা হবে এবং তার প্রতি গির্জার অনাস্থা ঘোষণা করা হবে। ফলে তার ক্ষমতা ও সিংহাসন হয়ে উঠবে কম্পমান। স্বাভাবিকভাবেই পুরো ইউরোপের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত রাখতে পোপের নিঃশর্ত আনুগত্য বজায় রেখে চলবে। আর এর মাধ্যমে পোপ লাভ করবেন ইউরোপের প্রধান ধর্মীয় নেতার মর্যাদার পাশাপাশি প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তির ক্ষমতাও।[১৩০]

৩. এর মাধ্যমে যে পোপের কেবল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে, তা-ই নয়; অর্থনৈতিক দিক থেকেও তিনি যথেষ্ট লাভবান হবেন। কারণ, একদিকে বিজিত দেশগুলো থেকে অঢেল সম্পদ অর্জিত হবে, অপরদিকে ইউরোপের যেসব শক্তি অনিবার্য কোনো কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, তারাও ফিলিস্তিনে যেতে না পারার 'পাপ' মোচনের জন্য গির্জাকে, বরং বলা ভালো পোপকে প্রচুর

---

[১২৯]. উইলিয়াম দুরান্ত, *কিসসাতুল হাযারাহ (The Story of Civilization)*, ১৫/১৫-১৬, কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৮৫ ও Chalandon, Hist. de la Premiere Croisade, p.p. 44-45.
[১৩০]. Runciman : op. cit. 1, p.p. 108-109.

অর্থ প্রদান করবে।

৪. ফিলিস্তিন ও শাম অঞ্চল থেকে যে সম্পদ অর্জিত হবে, তার মাধ্যমে ইউরোপে চলমান প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটেরও সমাধান হবে এবং এর ফলে ইউরোপের অশান্তকর পরিস্থিতিরও অবসান ঘটবে।[১৩১]

৫. এর ফলে ইউরোপের উগ্র মানসিকতা লালনকারী সামরিক শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যকার রাজ্যকেন্দ্রিক বা সামন্তকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে শক্তিক্ষয়ের পরিবর্তে ইউরোপের বাইরে শত্রু-ভূখণ্ড অভিমুখী হবে এবং সেখানে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের পাশাপাশি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের উগ্র মনোভাব চরিতার্থের সুযোগ পাবে।[১৩২]

৬. ক্রুসেডীয় মনোভাব লালনকারী ইউরোপ এই অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী শত্রু মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। পোপের দৃষ্টিতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল এক অনিঃশেষ লড়াই। পোপের দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ কেবল তখনই শেষ হতে পারে, যখন মুসলমানরা স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবে।

৭. ইউরোপে তখন প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধা, শীত ও সুচিকিৎসার অভাবে মারা যেত। পোপের এই উদ্যোগের কারণে এমন অসংখ্য দরিদ্র খ্রিষ্টান জনগণ বলতে গেলে নতুন জীবনের সন্ধান লাভ করবে। ফলে সকলেই তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে যাবে।

৮. ক্যাথলিক পোপের সামনে প্রাচ্যের অর্থোডক্স গির্জাকে ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত করার এবং উভয় গির্জাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হবে। কারণ, সবাই চিন্তা করবে যে, পোপই তো সেই মহান ব্যক্তি, যিনি মুসলমানদের হাত থেকে প্রাচ্যের খ্রিষ্টানসমাজকে উদ্ধার করতে ইউরোপের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন।

৯. এর মাধ্যমে সুপ্রাচীন এক ধর্মীয় আবেগপূর্ণ স্বপ্নও বাস্তবায়িত হবে। আর তা হলো—যে পবিত্র ভূমিতে ঈসা মাসিহ জন্মগ্রহণ করেছেন

---

১৩১. Michaud : op. cit. Tome 1, p.p. 105-106.

১৩২. Fulcher de Chartres, pp. 67; Baudri. pp. 14-15; Guibert le de Nogent, p. 11.

এবং জীবন কাটিয়েছেন, তা খ্রিষ্টানসমাজের অধিকারে আসবে।[১৩৩]

১০. দশম ও সর্বশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো, ভবিষ্যতে হয়তো এমন উপযুক্ত পরিস্থিতি নাও তৈরি হতে পারে যখন এ জাতীয় বিশাল অভিযানের জন্য এত আয়োজন ও আত্মত্যাগের গণনিবেদন খ্রিষ্টান জাতির জন্য সঠিক বিবেচিত হবে। এখন তো প্রাচ্যের খ্রিষ্টানরা তার কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেছে।[১৩৪] আর তাই এখনই তাদের সহায়তায় অর্থ ব্যয় করার এবং কিছু প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ আছে। অধিকন্তু 'পবিত্র' যুদ্ধ বিবেচনা করে ইউরোপীয় জনগণ পোপকে এ যুদ্ধের বিশাল ব্যয় নিয়েও কোনো প্রশ্ন করবে না। বিপরীতে যুদ্ধের যৌক্তিকতা যদি সুস্পষ্ট না হতো এবং তারপর যুদ্ধ করতে গিয়ে ইউরোপ যথেষ্ট জান-মাল খোয়াত, তাহলে হয়তো পোপকে ক্ষমতাই ছাড়তে হতো। ইতিপূর্বে যেমনটি ঘটেছিল বাইজান্টাইন সম্রাট ৪র্থ রোমানোস-এর ক্ষেত্রে। মানজিকার্টের যুদ্ধে মুসলিম সেলজুকদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণের পর ৪র্থ রোমানোসকে সিংহাসন হতে অপসারিত করা হয়েছিল।[১৩৫] এখন যেহেতু বাইজান্টাইনদের সাহায্যপ্রার্থনার প্রেক্ষিতে অভিযান প্রেরিত হবে, তাই যুদ্ধে খ্রিষ্টান বাহিনীর ভাগ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলেও পোপের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, পরিণতি যাই হোক না কেন, সবাই চিন্তা করবে যে, পোপ তো মহান ও পবিত্র এক লক্ষ্য সামনে রেখেই যুদ্ধ করেছেন।

পোপ চিন্তা করে দেখেন যে, বাইজান্টাইন সম্রাটের এই একটিমাত্র আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি এই সকল চাওয়াই পূর্ণ করতে পারবেন। এ যেন এক ঢিলে দুই নয়; দশ পাখি শিকারের সুযোগ! পোপ ২য় আরবান নিশ্চয়ই এ সুযোগ হেলায় হারাবার মতো নির্বোধ নন!

সার্বিক দিক বিবেচনা করে পোপ আরবান অর্থোডক্স বাইজান্টাইন প্রতিনিধিদলের আবেদনে অত্যন্ত উত্তেজিত ও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বরং কালবিলম্ব না করে তিনি মাঠে নেমে পড়েন। ক্যাথলিক গির্জা কাউন্সিলের

---

১৩৩. Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert de Moin. pp. 2-3.

১৩৪. Chalandon, Hist. de la Premiere Croisade, p.p. 37-41.

১৩৫. Vasiliev, op. cit., 1, p. 356.

সদস্যগণ তখন নিয়মিত বৈঠকের জন্য রোমে সমবেত হয়েছিল। পোপ প্রাচ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য বাইজান্টাইন প্রতিনিধিদলকে সমবেত কাউন্সিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। পোপ আশা করছিলেন যে, এর ফলে সমবেত পাদরিদের মাঝেও বিষয়টি নিয়ে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং পোপও এই অপবাদ ও অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকবেন যে, তিনি সুস্পষ্ট কোনো কারণ ব্যতিরেকেই এককভাবে অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন।

পোপের আশাই বাস্তব হয়। উপস্থিত পাদরিরা প্রতিনিধিদলের মুখে প্রাচ্যের পরিস্থিতি শুনে অভিযানের বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করে। এরপর স্বয়ং পোপ বাইজান্টাইন প্রতিনিধিদলের কথার সমর্থনে উপস্থিত পাদরিদের কিছু কথা বলেন। সবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত জানান যে, অতি শীঘ্রই শুরু হবে ইসলামি প্রাচ্য ভূখণ্ড অভিমুখে ক্রুসেড অভিযান পরিচালনার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি।

দৃশ্যপটে ক্রুসেড আন্দোলনের প্রস্তুতি

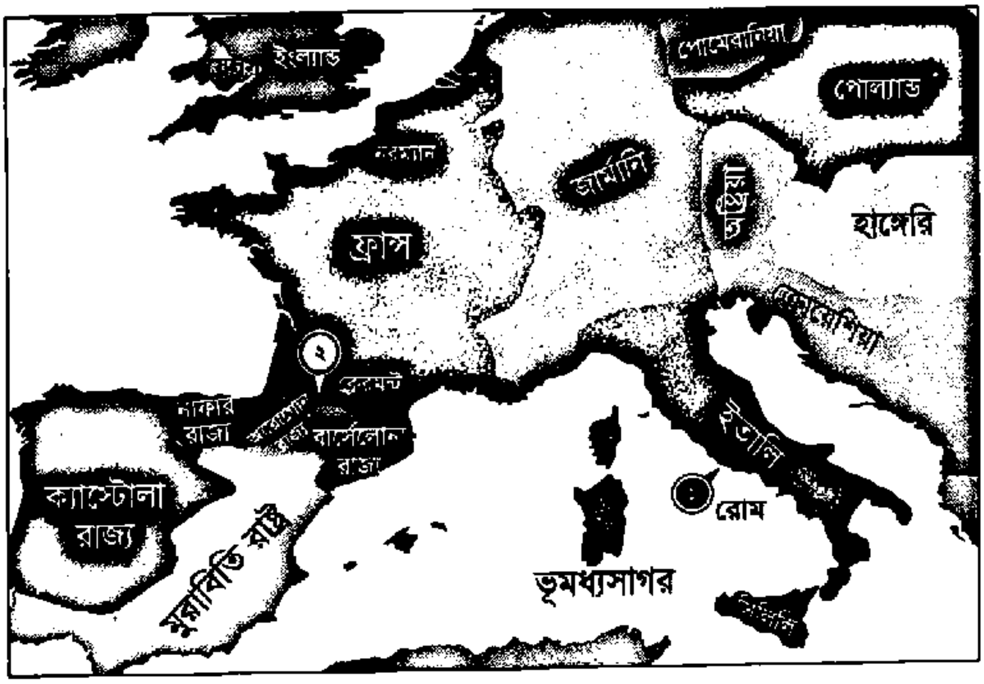
শুরু হলো ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে ক্রুসেড আগ্রাসনের প্রস্তুতিগ্রহণ!

পোপ ২য় আরবান সিদ্ধান্ত নেন—প্রথমেই তিনি পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তের সকল পাদরিকে সমবেত করতে একটি পাদরিসভা আয়োজন করবেন এবং ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় ক্ষমতার অধিকারী গির্জাগুলোর অবস্থা যাচাই করবেন। পাদরিসভা শেষ হওয়ার পর তিনি আয়োজন করবেন একটি বিশাল গণসম্মেলন। সম্মেলনে বিভিন্ন করদরাজ্যের সামন্ত এবং সম্ভব হলে সকল শাসক ও রাজাকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে; আমন্ত্রণ জানানো হবে সাধারণ জনগণকেও, যেন সম্মেলনটি অত্যন্ত কার্যকর ও প্রভাববিস্তারকারী মহাসমাবেশে পরিণত হয়। আর সেই সম্মেলন থেকেই তিনি সকলকে ফিলিস্তিন অভিমুখে সামরিক অভিযানে গমনের আহ্বান জানাবেন।

প্রশ্ন রয়ে গেল—কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এই বিশাল জনসমাবেশ?

জার্মানির রাজা ৪র্থ হেনরিসহ ইউরোপের অধিকাংশ রাজার সঙ্গে তখন পোপের বিরোধ চলছিল। কিন্তু করদরাজ্যগুলোর সামন্ত ও জমিদারদের সঙ্গে বিশেষ করে ফ্রান্সের সামন্তদের সঙ্গে পোপের চমৎকার ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। পোপ ফ্রান্সের সামন্তদের সঙ্গে সুসম্পর্ক কাজে লাগিয়ে

সেখানেই মহাসমাবেশ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন।[১৩৬] ফ্রান্সকে বেছে নেওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। তখন ফ্রান্স ছিল অত্যন্ত জনবহুল একটি দেশ। শেষ দশ বছরে ফ্রান্সের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যা সেখানকার অর্থনীতিতে বিরাট নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা এটাই ছিল যে, এই চরম অর্থনৈতিক দৈন্যদশা হতে নিষ্কৃতি পেতে ইসলামি প্রাচ্যে যুদ্ধাভিযানে গমনের চিন্তা ফ্রান্সবাসীর মাঝেই সবচেয়ে সাদরে গৃহীত হবে।[১৩৭]



মানচিত্র নং-৯

ক্রুসেড যুদ্ধের প্রচারণা

সবদিক বিবেচনা করে পোপ ২য় আরবান ফ্রান্সের ক্লেরমন্ট[১৩৮] নগরীতে জনসমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন। তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর (৪৮৮ হিজরি সনের ২৭ জিলকদ)। ফ্রান্সের প্রতিটি প্রান্তে যেন সমাবেশের প্রচারণা চালানো যায় এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক

---

[১৩৬]. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৭০।

[১৩৭]. ক্লেরমন্ট সম্মেলনে যোগদানকারী ধর্মযাজক রবার্টের (Robert the Monk) বর্ণনা সম্পর্কে জানতে দেখুন : Robert de Rheims, "Historia iherosolimitana", RHC, Occ., 111, pp. 727-730.

[১৩৮]. ক্লেরমন্ট (Clermont-Ferrand) নগরী ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে রাজধানী প্যারিস থেকে প্রায় ৩৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মানুষ যেন সমাবেশে উপস্থিত হতে পারে, এ চিন্তা করে পোপ তুলনামূলক বিলম্ব করাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পাশাপাশি ফ্রান্সের রাজা ১ম ফিলিপের (Philip I) সঙ্গে যেন কোনো প্রকার সংঘাত সৃষ্টি না হয়, এ উদ্দেশ্যে তিনি সম্মেলনস্থল হিসেবে প্যারিসের চিন্তা বাদ দিয়েছিলেন। রাজা ফিলিপ একদিকে যেমন পোপের বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, অপরদিকে পোপ তার মিশন বাস্তবায়নে যাদের ওপর নির্ভর করছিলেন, সেই সামন্তদেরও ফিলিপের সঙ্গে বিরোধ ছিল।

২৭ নভেম্বর, ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। ক্লেরমন্ট সম্মেলনের (Council of Clermont) নির্ধারিত দিন। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও পোপের আহ্বানে নির্দিষ্ট সময়ে সকলে সমবেত হয়েছে। সম্মেলনের জন্য ক্লেরমন্টের একটি বিস্তৃত ময়দান প্রস্তুত করা হয়েছিল। বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হওয়া ময়দানটিতে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। বরং পোপের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শোনার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগতদের ভিড়ে ক্লেরমন্টের আশেপাশের জনপদগুলোও জনারণ্যে পরিণত হয়েছিল।

উপস্থিত জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে পোপ বেশ দীর্ঘ ও আবেদনময়ী ভাষণ প্রদান করলেন। আজকের এই ভাষণের জন্য তিনি দীর্ঘ সাত মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন।[১৩৯]

প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও উপস্থিত জনসমুদ্র ধৈর্য ধরে সুভাষী ও বাগ্মী পোপ আরবানের মর্মস্পর্শী বক্তব্য শুনতে লাগল। বরং তারা পোপের প্রতিটি উচ্চারণে আন্দোলিত হয়ে উঠল। পোপের বক্তব্য যেন প্রত্যেকের হৃদয়বীণায় উত্তেজনার ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছিল। পোপ অতি সুকৌশলে একটির পর একটি বিষয় তুলে ধরছিলেন আর উপস্থিত জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলছিলেন। তিনি সেদিন শ্রেণি, পরিবেশ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে শতধা বিভক্ত উপস্থিত জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য তূণীরের সবকটি তিরই ব্যবহার করেছিলেন।

ইউরোপীয় বিভিন্ন বর্ণনায় পোপের পুরো ভাষণ বিস্তারিত তুলে ধরা

---

১৩৯. H. Hagenmeyer: "Chronologi de la Premiere Croisade, 1094-1100", ROL VI, p. 225.
আর ক্লেরমন্ট সম্মেলন সফল করতে পোপের দক্ষিণ ফ্রান্সে পরিভ্রমণ সম্পর্কে জানতে দেখুন : Duncalf, "The Councils of Piacenza and Clermont", in Setton, vol. 1, pp. 234-237.

হয়েছে। ভাষণে তিনি প্রাচ্যের খ্রিষ্টানসমাজকে উদ্ধার এবং বিধর্মীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) জুলুম-নির্যাতন থেকে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করতে ফিলিস্তিনে গমনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থিত জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের হাতে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হওয়ার বিভিন্ন (কাল্পনিক) ঘটনাও তাদেরকে শোনান।[১৪০]

উপস্থিত জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে পোপ যেসব বিষয় কাজে লাগান, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তিনি সকলকে জানান যে, এ ভাষণ তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের পক্ষ থেকে দিচ্ছেন না; বরং স্বয়ং ঈসা মাসিহের সহকারী হিসেবে দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আর তাই শোনো, বক্তা তো আমি নই; বরং স্বয়ং প্রভুই আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে যিশুখ্রিষ্টের সহযোগী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করি।'[১৪১] ভাষণে তিনি লুকের ইঞ্জিল হতে নিম্নোক্ত পদটিও আবৃত্তি করেন—

> যে কেউ ক্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।[১৪২]

শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে পোপ উপস্থিত সকলকে পাপমার্জনার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে পাপমোচন একটি গণদাবিতে পরিণত হয়েছিল। কারণ, সকলের অনুভূতি ছিল—অচিরেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিষয়ে পোপ বলেন, 'আমি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বলছি আর অনুপস্থিতদের জন্যও ঘোষণা করছি; অধিকন্তু স্বয়ং যিশুখ্রিষ্ট আমাকে এ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেখানে গমনকারী সকলের জন্য পাপমোচন কার্যকর হবে, যখন তাদের জীবন পার্থিব শৃঙ্খলসহ পূর্ণতায়

---

১৪০. Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert de Moin. pp. 2-3.
ক্লেরমন্ট সম্মেলনে পোপ ২য় আরবানের প্রদত্ত ভাষণ সবচেয়ে সুচারুরূপে উল্লেখ করেছেন মনেরো। তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় উল্লেখিত ভাষণ নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করে পূর্ণ ভাষণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। দেখুন : D.C Munro : The Speech of Pope Urban II at Clemont, pp. 231-242.

১৪১. Robert le Noin, p. 4; Baudri de Bourgueil, p. 7; William of Tyre, vol. 1, p 39.

১৪২. নববিধান, লুক অধ্যায়, ১৪/২৭।

পৌঁছবে। পবিত্র ভূমিতে যাত্রার পথে মৃত্যু আসুক, কিংবা সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময়, অথবা পৌত্তলিকদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালে—সকল ক্ষেত্রেই ক্ষমাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন, তার ভিত্তিতে আমি আসন্ন অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য পাপমোচন প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করছি।' তিনি এ সময় আরও বলেন, 'এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে এমনকি যদি শেষ পর্যন্ত তোমরা মৃত্যুবরণও কর, তবুও সর্বাবস্থায়ই কল্যাণ ও উপকার লাভ করতে থাকবে। কারণ, যারাই এ অভিযানে শরিক হবে, তারা পাপমুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।'[১৪৩]

শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে তিনি ফিলিস্তিনে তীর্থযাত্রায় গমনকারী খ্রিষ্টানরা যে নিপীড়ন ও অবর্ণনীয় কষ্টের মুখোমুখি হয়ে থাকে, তার চিত্রও সকলের সামনে চিত্রায়িত করেন। অথচ পুরো বিষয়টাই ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কিন্তু তিনি একে একটি মর্মস্পর্শী ও মানবিক বিষয়ের রূপ দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরেন।[১৪৪]

পোপ ইসলামি প্রাচ্যভূমিতে বিদ্যমান অঢেল ধনসম্পদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেও উপস্থিত শ্রোতাদের আন্দোলিত করেন। তিনি ফিলিস্তিন ভূমি সম্পর্কে ইঞ্জিল হতে নিম্নোক্ত শ্লোকও পাঠ করে শোনান—

> আমি এই ভূমি (ফিলিস্তিন) দান করেছি, যাতে আছে উপচে পড়া দুধ ও মধু।[১৪৫]

এর মাধ্যমে তিনি একই সঙ্গে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণির আবেগকে নাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হন। কারণ, দরিদ্ররা তখন খুঁজছে জীবনের ন্যূনতম আশ্রয়, আর ধনী সামন্তরা খুঁজছে আরও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মালিকানা।

পোপ ২য় আরবান উপস্থিত যোদ্ধাদের প্রভাবিত করার জন্য বলেন, 'তোমরা পারস্পরিক সংঘাতের মাধ্যমে ইউরোপের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিনষ্ট করবে কেন; এর পরিবর্তে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে এক উর্বর ক্ষেত্র, যেখানে তোমরা নিজেদের শক্তি পরীক্ষা ও দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।'

---

১৪৩. Fulcher de Chartres, pp. 61-63.

১৪৪. Chalandon : Hist de la Premiere Croisade, pp. 37-41.

১৪৫. পুরোনো ইচ্ছাপত্র, গণনা পুস্তক অধ্যায়, ১৩/২৭ ও Fulcher de Chartres, pp. 65-66.

প্রভাবক হিসেবে পোপ আরও যে বিষয়টি কাজে লাগান, তা হলো—তিনি ফরাসিদের বীরত্ব ও যুদ্ধদক্ষতার প্রশংসা করেন এবং তাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস স্মরণ করেন। এরপর তিনি তাদেরকে ইউরোপের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান।[১৪৬]

শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে তিনি আরও একটি টোপ ফেলেন। তিনি ঘোষণা করেন—যারা ঋণের ভারে আক্রান্ত, তারা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তাদের ঋণ ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন—যুদ্ধ চলাকালে সামন্তদের মালিকানাধীন ভূমির কর মওকুফ করে দেওয়া হবে;[১৪৭] আর বিভিন্ন অপরাধকর্মে অভিযুক্তরা যদি অভিযানে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তাদের শাস্তিও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১৪৮]

এভাবে পোপ ২য় আরবান সবগুলো প্রভাবক বিষয়কে মর্মস্পর্শী অলংকারপূর্ণ ভাষায় সন্তোষজনক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। ফলে তার প্রতিটি উচ্চারণ উপস্থিত শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও তিনি সকল শ্রোতার বীরত্ব ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তার প্রতিটি কথা শেষ হতেই উপস্থিত শ্রোতারা সমস্বরে তার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং বক্তৃতা শেষে সকলে সমস্বরে চিৎকার করে বলে ওঠে— Deus vult (এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা)। পরবর্তী সময়ে এ বাক্যটিই ক্রুসেডার বাহিনীর শ্লোগানে পরিণত হয়।[১৪৯]

এখানে এ তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য যে, স্বয়ং পোপ ২য় আরবানও উপস্থিত জনসমুদ্র হতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া প্রত্যাশা করেননি। বরং সকলের সম্মিলিত সাড়া তাকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। তিনি মূলত বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক ও প্রশিক্ষিত বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, সাধারণ জনগণের ওপর নয়। কিন্তু সাধারণ জনগণ তো একে নিজেদের ঋণ-ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য সংকট থেকে নিষ্কৃতির এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখছিল। আর তাই এভাবেও বলা যায় যে, পোপ তার ভাষণে

---

১৪৬. Fulcher de Chartres, pp. 67; Baudri, pp. 14-15; Guibert le de Nogent, p. 11.

১৪৭. Mayer, The Crusades, pp. 41-42; Runciman, A Hist. 1, p. 109.

১৪৮. Thompson : op. cit., vol. 1, p. 302.

১৪৯. Robert de Moin. pp. 4-5; Fulcher de Chartres, pp. 68.

উপস্থিত কারও জন্যই পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ রাখেননি।[১৫০]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল ফ্রান্সভূমিতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। ফ্রান্স থেকে এ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপে।[১৫১] এই সম্মেলনেই পোপ ঘোষণা করেন, যারা এ অভিযানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা প্রত্যেকে যেন আসন্ন অভিযানের মর্যাদা ও ধার্মিকতার নিদর্শন হিসেবে লাল সুতা দিয়ে একটি ক্রুশ বুনন করে নিজেদের কাঁধে লাগিয়ে নেয়।[১৫২]

সুদৃঢ় ও গঠনমূলক পরিকল্পনা

পোপ কিন্তু জনসমাবেশের এই কল্পনাতীত উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনাতেই তুষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। তিনি এই উদ্দীপনাকে অব্যাহত রাখতে এবং প্রতিক্রিয়াকে আরও জোরালো করতে এর পরপরই অত্যন্ত শক্তিশালী ও গঠনমূলক এক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কার্যকর ও ফলপ্রসূ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

১. একেবারে শুরু থেকেই যেন অভিযান-প্রস্তুতির প্রতিটি পদক্ষেপ পোপ ও রোমান ক্যাথলিক গির্জার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়, পোপ ২য় আরবান তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ক্লেরমন্ট সম্মেলনের দিনই ফ্রান্সের লি-পিউ অঞ্চল (Le Puy)-এর বিশপ ও গির্জাধ্যক্ষ অ্যাডমার ডি মনটেইল (Adhemar de Monteil)-কে আসন্ন অভিযানের আধ্যাত্মিক সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অভিযানে অ্যাডমার পোপের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করবেন।[১৫৩]

২. পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেন নিজ নিজ অঞ্চলের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়, এজন্য পোপ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। পোপের আশা ছিল—এই পদক্ষেপের ফলে যুদ্ধের প্রচারণা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে।[১৫৪]

৩. ইউরোপজুড়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং ফিলিস্তিন অভিযানের

---

১৫০. Riley – Smith op, cit, pp. 39-40.

১৫১. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১১০ ও *আল-হামলাতুস সালীবিয়্যাতুল উলা নুসুসুন ওয়া ওয়াসাইকু তারীখিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৭।

১৫২. Mayer, The Crusades, pp. 41-42; Runciman, A Hist. 1, p. 109.

১৫৩. Cam. Med. Hist. vol. 5 p. 273.

১৫৪. Runciman, A Hist. 1, p. 108-109; Mayer, The Crusades, pp. 42-43.

জন্য যোদ্ধাসংগ্রহের জোরদার প্রচেষ্টা নিশ্চিত করতে পোপ আরবান এমিয়েন্স (Amiens) অঞ্চলের পিটার (Peter the Hermit) নামক জনৈক ধর্মযাজককে দায়িত্ব প্রদান করেন। ধর্মযাজক পিটার ছিলেন স্বভাব বাগ্মিতার অধিকারী। তিনি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন এবং নগ্নপদে পথ চলতেন। গন্তব্য অধিক দূরত্বের হলে তার সঙ্গে বাহন হিসাবে থাকত একটি ল্যাংড়া গাধা।

পিটার পোপ-প্রদত্ত দায়িত্ব সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সসহ ফ্রান্সের আনাচে-কানাচে প্রচারণা চালাতে থাকেন। সাধারণ জনগণের মাঝে তার এই প্রচারণার জাদুকরী প্রভাব পড়ে।[১৫৫] মানুষ দলে দলে তার অনুসরণ করতে থাকে। ফলে অল্প কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় পিটার পনেরো হাজার লোক জমা করে ফেলেন। এ হিসাব কেবল পুরুষদের; নারী ও শিশুরা ছিল এ হিসাবের বাইরে।[১৫৬] অবশ্য পিটারের সঙ্গে যোগ দেওয়া অধিকাংশ মানুষ ছিল সাধারণ দরিদ্র শ্রেণির জনগণ এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন ভঙ্গকারী অপরাধীদের দল। অতি নগণ্য সংখ্যক যোদ্ধাপুরুষ এবং কয়েকজন সামন্তও অবশ্য পিটারের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। যেহেতু ধর্মযাজক পিটারের গঠিত এ বাহিনীটির সদস্যদের মাঝে যোদ্ধাবাহিনী বা মিলিশিয়া বাহিনীর কোনো বৈশিষ্ট্য ও ছাপ ছিল না, তাই তারা 'কৃষকদের বাহিনী' (Peasants Crusade), 'ভিখারিদের বাহিনী' (Paupers Crusade) ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৫৭]

পিটারের ন্যায় ওয়ালটার (Walter Sans Avoir) নামক আরেক ধর্মযাজক সন্ন্যাসীও ক্রুসেড অভিযানের প্রচারণা চালাতে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করেন। তিনিও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে অভিযানে শরিক হতে আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদের বড় একটি দল সংগ্রহ করতে সক্ষম

---

১৫৫. Grousset : Hist. des Croisades 1, p. 50.

১৫৬. Michaud : op. cit. Tome 1, p.p. 105-106.

১৫৭. ধর্মযাজক পিটারের প্রচারণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : Albert d'Aix, in Peters (ed.), The first Crusade, pp. 96-99; William of Tyre, 1, pp. 99-106; Chronique de Zimmen, A OL, 11, pp. 23-24; Anna Comnena, Alexiade, pp. 310-311; Runciman, A Hist. of Crusades, 1, pp. 123-127; Duncalf, "Clermont to Constantinople, p. 260-262.

হন।[১৫৮] ধর্মযাজক ওয়ালটার 'কাঙাল ওয়ালটার' (Walter the Penniless) নামে পরিচিত ছিলেন।

৪. সৈন্যসংগ্রহ ও যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রচেষ্টা মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় পোপ ২য় আরবান অভিযান শুরুর সময় অনির্ধারিত ও উন্মুক্ত রেখে দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন নগরী থেকে আগত বিচ্ছিন্ন দল ও সৈন্যদের সমবেত হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ ও স্থানও ঘোষণা করে দেন। তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট (৪৮৯ হিজরির ২৩ শাবান) আর সকলের সমবেত হওয়ার স্থান নির্ধারণ করা হয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। বিলম্বিত তারিখ নির্ধারণের উদ্দেশ্য ছিল যেন সৈন্যসংগ্রহের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং বসন্তের শুরুতে সংগৃহীত ফল-ফসলও বাহিনীর রসদ হিসেবে সঙ্গে নেওয়া যায়।[১৫৯] সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী সংগ্রহ করার পর কালবিলম্ব না করে প্রতিটি বাহিনী কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে। এরপরও পথে কেটে যাবে প্রায় তিন মাস। আর সমবেত হওয়ার স্থান হিসেবে কনস্টান্টিনোপলকে নির্বাচনের কারণ হলো, ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা ছিল প্রথমে তারা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; এরপর শাম অঞ্চলে অভিযান চালাবে এবং সবশেষে পৌঁছবে তাদের মূল ও শেষ লক্ষ্যস্থল ফিলিস্তিনে, বিশেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাসে। আর প্রথম লক্ষ্য এশিয়া মাইনরের ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশের পূর্বে কনস্টান্টিনোপলই ছিল খ্রিষ্টান শাসনাধীন সর্বশেষ ঘাঁটি। তা ছাড়া ক্রুসেড অভিযানের যাবতীয় প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন করার জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার পথ ও পদ্ধতি সুবিন্যস্ত করার জন্য বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের সঙ্গে পোপের সাক্ষাৎ করারও প্রয়োজন ছিল।

৫. পোপ আরবান অভিযানে গমনে উদ্বুদ্ধ করতে ইউরোপের বিভিন্ন রাজা, শাসক ও সামন্তদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। পোপের প্রেরিত পত্র রাজা ও রাষ্ট্রনায়কদের মাঝে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারলেও সামন্ত বা রাজন্যবর্গের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। যেসব রাজন্য তার পত্র

---

[১৫৮]. Vasiliev : op. cit., vol 11, p. 404.

[১৫৯]. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১০৮।

পেয়ে সাড়া প্রদান করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফ্রান্সের তুলুজ (Toulouse) ও প্রভিন্স (Provence) অঞ্চলের কাউন্ট ৪র্থ রেমন্ড (Raymond IV)। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে ৪র্থ রেমন্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সেনাপতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলেন। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অধিকন্তু তার তীর্থযাত্রী হিসেবে বাইতুল মুকাদ্দাসে গমনের অভিজ্ঞতাও ছিল।[১৬০] রেমন্ড নিজেকে পুরো ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্বদানের উপযুক্ত মনে করতেন। পোপ তার এই সামরিক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপনাকে মূল্যায়ন করেন এবং তার সঙ্গে কয়েকবার বৈঠক করেন। এমনকি পরবর্তী সময়ে পোপ যখন অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য সমবেত বিশাল এক জনসমাবেশকে উৎসাহ জোগাতে ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে নিম (Nîmes) নগরীতে সম্মেলনের আয়োজন করেন, সেখানে রেমন্ডকেও সঙ্গে নিয়ে যান।[১৬১]

রেমন্ড ছাড়া আরও কয়েকজন রাজন্য পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। তাদের পরিচয়-বিবরণ অভিযানে গমনের পূর্বে ক্রুসেডার বাহিনীর বিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় আসবে।

৬. কেবল শাসক ও রাজন্যবর্গের কাছে পত্র পাঠিয়েই পোপ ক্ষান্ত হননি। তিনি আসন্ন অভিযান সহজ করতে বিভিন্ন নৌবহরের সহায়তা লাভের জন্য ইতালির জেনোভা বন্দর-সংশ্লিষ্ট সামরিক ও অর্থনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও পত্রবিনিময় করেন। তারা পোপের আহ্বানে সাদরে সাড়া দেয় এবং ক্রুসেডারদের সহায়তা করার জন্য বারোটি সমুদ্র-উপযোগী জাহাজসহ বিভিন্ন নৌযান প্রস্তুত রাখে। বিনিময়ে পোপ তাদেরকে আগামী দিনে অধিকৃত শাম অঞ্চলে বিশেষ ছাড়ে বাণিজ্য-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।[১৬২]

৭. কেবল পত্র-যোগাযোগেই সীমাবদ্ধ না থেকে অভিযানের সফলতার উদ্দেশ্যে পোপ নিজে অনেকগুলো নগরী ও জনপদে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ক্লেরমন্ট সম্মেলনের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১০৯৫

---

[১৬০]. Michel Le Syrien : (Rec. Hist. Cr Doc. Arm), 1. p. 372.
[১৬১]. Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 273.
[১৬২]. Heyd : Hist. du Commerce 1, p. 133; Setton : op. cit, 1, p. 252.

খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ফ্রান্সের লিমোজিস (Limoges) নগরীতে আরেকটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এরপর তিনি ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যে তুর্‌স (Tours), আনজের্স (Angers), মেইন-এট-লরিয়ে (Maine-et-Loire), পয়টিয়ার্স (Poitiers), বর্দো (Bordeaux), তুলুজ, নিম প্রভৃতি নগরীতে সফর করেন।[১৬৩]

পোপের এই অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বিরাট সংখ্যক জনবল সংগৃহীত হয়। সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল ফ্রান্সের নাগরিক। ইতালি, ইংল্যান্ড ও স্পেন থেকেও কিছু সৈন্য যোগ দেয়। এমনকি স্কটল্যান্ড ও ডেনমার্কের মতো দূরবর্তী বিভিন্ন দেশ থেকেও কিছু সৈন্য অভিযানে যোগ দিতে উপস্থিত হয়।[১৬৪]

৮. পোপ এই মর্মেও সতর্কবাণী প্রদান করেন যে, যারা অভিযানে অংশগ্রহণে সম্মতি জানিয়ে ক্রুশ প্রতীক ধারণ করবে, তাদের মধ্য হতে কেউ যদি পরে অভিযানে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে সে স্বর্গবঞ্চিত হওয়ার শাস্তি ভোগ করবে।[১৬৫] এই হুমকি প্রদানের কারণ হলো—পোপ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনসাধারণের এই সাময়িক উদ্দীপনা একসময় নিশ্চয়ই স্তিমিত হয়ে যাবে। তখন হয়তো এই বিপুল সংখ্যক জনগণ তার সঙ্গে থাকবে না। ফলে পরিণতি হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়াবহ। এই হুমকিদানের মাধ্যমে তিনি এই নিশ্চয়তা পেতে চাচ্ছিলেন যে, যারা অভিযানে যোগ দিতে সম্মতি জানাচ্ছে, তারা সকলেই শেষ পর্যন্ত বের হবে এবং এর মাধ্যমে তিনি তার পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

নিঃসন্দেহে পোপের পুরো পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত। যথেষ্ট সময়, মেধা, চিন্তা ও অর্থ ব্যয় করে তিনি এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তার গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমেই পুরো পশ্চিম ইউরোপের প্রচেষ্টা একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বিগত কয়েক শতাব্দীতে বরং নির্দিষ্ট করে বললে সুপ্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইউরোপে এরূপ ঐক্য ও উদ্দীপনা কখনো পরিলক্ষিত হয়নি।

---

১৬৩. Hagenmeyer, Chronologi, ROL, VI, pp. 224-225, p. 226-243; AOL, 1, pp. 109-110, 116, 119.

১৬৪. Runciman, op. cit., vol. 1, p. 112.

১৬৫. Runciman, op. cit., vol. 1, p.p. 108-109.

ক্রুসেড অভিযানের কার্যকারণসমূহ

ইউরোপের ঐতিহাসিক পটভূমি, পোপের চিন্তাগত প্রেক্ষাপট, ক্রুসেড অভিযান সফল করতে তার প্রাণান্তকর ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টা এবং তার আহ্বানে সুবিশাল জনগোষ্ঠীর সাড়াদান ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করার পর আমরা এখন ক্রুসেড যুদ্ধের প্রকৃত কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকাসমূহ সহজেই উপলব্ধি করতে পারব।

ঐতিহাসিকগণের অনেকেই ক্রুসেড অভিযানের পেছনে সুনির্দিষ্ট একটি কারণকেই মূল বা একমাত্র অনুপ্রাণিকা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং অন্যান্য কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু পেছনের দীর্ঘ আলোচনায় যে বাস্তবতা আমাদের সামনে পরিষ্কার হলো, তা তাদের এই অবস্থানকে মোটেও সমর্থন করে না। একটিমাত্র কার্যকারণ ও একক অনুপ্রাণিকা সমকালীন ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের, ভিন্ন ভাষা ও বাকরীতির এবং সামাজিক বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে ক্রুসেড অভিযানে বের হতে কিছুতেই বাধ্য করতে পারে না।

বরং এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য নিশ্চিতভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, বিভিন্নমুখী ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর এভাবে একত্রিত হওয়ার পেছনে মাত্র একটি নয়; কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকা ছিল অনেকগুলো। পোপ ২য় আরবান প্রতিটি অনুপ্রাণিকায় অনুরণন তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সকলকে অভিন্ন লক্ষ্যে এক অভিযানে বের হতে আশ্বস্ত করতে পেরেছিলেন।

ক্রুসেড যুদ্ধ-পূর্ব ইউরোপের ইতিহাস, ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীকে অভিযানে উদ্বুদ্ধ করার পন্থাসমূহ, অভিযানের প্রস্তুতিধারা এবং শামভূমিতে গমনের পথে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে এবং পরবর্তী সময়ে এশিয়া মাইনর, শাম ও ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই সেসব কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকা নির্ধারণ করতে পারব, যেগুলো এই শতধা বিভক্ত জনগোষ্ঠীকে ক্রুসেড অভিযানের জন্য একত্র করতে পেরেছিল। অনুপ্রাণিকাগুলো হলো—

১. ধর্মীয় আবেগ

নিঃসন্দেহে ধর্মীয় আবেগ ছিল ক্রুসেডারদের অভিযানে বের হওয়ার

অন্যতম মূল অবলম্বন; তবে মোটেই একমাত্র কারণ নয়। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমরা এ বাস্তবতার কথাই জানি যে, ইসলাম ও ইসলামবিরোধীদের পারস্পরিক যুদ্ধ চলবে চিরদিন। ইসলাম যদিও প্রীতি ও ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেয়, তারপরও প্রতিযুগেই এমন কিছু মানুষ থাকে, যারা কিছুতেই ইসলামের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে রাজি হয় না। আর তাই সুনির্দিষ্ট কোনো যৌক্তিক কারণ না থাকা সত্ত্বেও পোপ ২য় আরবান যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেন, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। 'প্রতিপক্ষ মুসলমান'—যুদ্ধ করার জন্য মৌলিকভাবে শুধু এতটুকুই কারণ হিসেবে যথেষ্ট! বিভিন্ন সময় পোপ আরবানের বক্তব্যে এমন সব শব্দ বারবার উচ্চারিত হয়েছে, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মৌলিকভাবে ইসলামকে ধর্ম হিসেবেই স্বীকৃতি দিতেন না। যেমন, তিনি মুসলিম জাতির জন্য অবিশ্বাসী, বিধর্মী, পৌত্তলিক ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করেন। সুতরাং পোপের এ অভিযানে বের হওয়ার পেছনে যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও কার্যকর ছিল, তা সুস্পষ্ট। অদ্রূপ কোনো কোনো পাদরি ও সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে এবং অভিযানে যোগদানকারী কতিপয় রাজন্যবর্গ ও সেনাপতিদের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আবেগের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মীয় লক্ষ্যের বিষয়টি ক্রুসেড অভিযানের সুস্পষ্ট লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। তখন ইউরোপীয়দের মুখেমুখে অভিযানের কারণ হিসেবে মুসলমানদের হাত থেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার কথাই প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু ধর্মীয় আবেগ জাগিয়ে তুলতেই পোপ দাবি করেছিলেন যে, মুসলমানরা তীর্থযাত্রী খ্রিষ্টানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে। যদিও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, এ দাবির পেছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টান যোদ্ধাপুরুষ ও জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। অন্যথায় এটা কোনোভাবেই প্রমাণিত নয় যে, মুসলমানরা খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় আচরণ করেছে। ইউরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভ্যাসিলিভ (Giorgi Vasiliev) উল্লেখ করেন—

> খ্রিষ্টানরা নির্বিশেষে সকলে ইসলামি শাসনের ছায়ায় ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। তাদেরকে শুধু তাদের পুরোনো গির্জাগুলো সংরক্ষণের অনুমতিই দেওয়া হয়নি; বরং নতুন

নতুন গির্জা ও মঠ নির্মাণের অনুমতিও দেওয়া হতো। নিজেদের গ্রন্থাগারে তারা খ্রিষ্ট-ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারত।[১৬৬]

আরেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক থমসন (James Westfall Thompson) বলেন—

সেলজুক রাষ্ট্রের অধীনে যেসব খ্রিষ্টান বসবাস করত, তারা খোদ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে বসবাসকারীদের চেয়ে অধিক সুখ-শান্তিতে ছিল।[১৬৭]

বরং স্বয়ং আল-কুদসের বিশপ ও গির্জাধ্যক্ষ (Patriarch of Jerusalem) থিওডোসিয়াস (Theodosius) কনস্টান্টিনোপলের বিশপের কাছে ২৫৫ হিজরি সনে (৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) পাঠানো এক পত্রে মুসলমানদের মহৎ হৃদয়, গণসহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের প্রশংসা করেন। মুসলমানরা যে খ্রিষ্টানদের একান্ত বিষয়াদিতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা ছাড়া তাদের অধিক হারে গির্জা নির্মাণের সুযোগ দিচ্ছে, তাও তিনি পত্রে উল্লেখ করেন। পত্রে আল-কুদসের (জেরুজালেম) বিশপ একটি অনস্বীকার্য গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন—

মুসলমানরা ন্যায়পরায়ণ জাতি। আমরা তাদের কাছ থেকে কখনো কোনো ধরনের ক্ষতি বা সীমালঙ্ঘনের সম্মুখীন হই না।[১৬৮]

এসব সাক্ষ্য এবং এ জাতীয় অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, পোপ ২য় আরবানের উল্লিখিত দাবি অসার রটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেড আগ্রাসনের পেছনে যেসব বাস্তব অনুপ্রাণিকা কার্যকর ছিল, সেগুলোকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা হিসেবেই এই বানোয়াট ও মিথ্যা দাবি তোলা হয়েছিল।

এর চেয়েও বড় কথা, ক্রুসেড অভিযানের কোনো পর্যায়েই আমরা ক্রুসেডার যোদ্ধাদের আচরণে ধার্মিকতার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। বরং তারা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বোধ ও ধর্মবিমুখ; অপরাধ ও অন্যায়ের

---

১৬৬. Vasiliev : A History of the Byzantine Empire, p. 393.

১৬৭. Thompson : Economic and Social Hist. of the Middle Ages. vol. 1, o. 391.

১৬৮. Thompson : Economic and Social Hist. of the Middle Ages. vol. 1, o. 385.

নিকৃষ্টতম স্তরে তারা পৌঁছে গিয়েছিল। কেবল মুসলমানদের সঙ্গে নয়; প্রাচ্যের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তাদের কৃত আচরণেও ধার্মিকতার কোনো ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। এই ঘৃণ্য ও জঘন্য আচরণের কিছু নমুনা আমরা আলোচ্য ইতিহাসের বিভিন্ন অংশে অবলোকন করব। আমরা দেখব—ধর্ম ও ধার্মিকদের রক্ষার দোহাই দিয়ে বের হওয়া এসব ক্রুসেডার যোদ্ধাদের আচরণ কেমন ছিল হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার খ্রিষ্টান নাগরিকদের সঙ্গে কিংবা একেবারে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে, যাদের উদ্ধারের দাবিতে তারা অভিযানে বের হয়েছিল।[১৬৯]

সুতরাং এ কথা স্বীকার্য যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও ক্রুসেড অভিযানে কার্যকর ছিল; কিন্তু নিঃসন্দেহে এটিই একমাত্র অনুপ্রাণিকা ছিল না। বরং একে বড় করে দেখাও সমীচীন নয়। কারণ, ক্রুসেডার যোদ্ধারা যদিও প্রতিটি ক্রুসেড অভিযানে কাঁধে রক্তবর্ণ ক্রুশ প্রতীক ধারণ করেছিল এবং দাবি করেছিল যে, তারা ধর্মীয় অভিযানে অংশগ্রহণের বিনিময়ে পাপমোচন ও ক্ষমাপ্রাপ্তি কামনা করে; কিন্তু বাস্তবতা হলো—কোনো ক্রুসেড অভিযানেই তাদের মাঝে নিকট-দূর কোনো দিক থেকেই ধর্মের কোনো ছাপ লক্ষ করা যায়নি।

২. অর্থনৈতিক স্বার্থ

অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল ক্রুসেড অভিযানের অন্যতম অনুপ্রাণিকা। প্রচুর সংখ্যক মানুষ ইউরোপে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের কোনো প্রকার ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে এ অভিযানে বের হয়েছিল। তারা বের হয়েছিল ফিলিস্তিনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে। তারা ভেবেছিল, এ অভিযানে এমনকি মারা গেলেও তাদের হারানোর কিছুই নেই। ইউরোপে জমিদার ও রাজন্যবর্গের নিপীড়নের অধীনে নিদারুণ কষ্টে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তাদের কাছে শতগুণে শ্রেয়তর ছিল।[১৭০]

অপরদিকে সামন্ত ও রাজন্যবর্গও বের হয়েছিল কেবল সম্পদ ও ভূমি-মালিকানা লাভের আশায়। প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিনের অভিযান ছিল

---

১৬৯. William of Tyre, 1, p. 105-106; Hagenmeyer, Chronologi, o. 243, 245-246; Anna Comnena, Alexiade, pp. 311.

১৭০. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যাহ*, ১/৩৬।

ইউরোপের অনেক রাজন্যের জন্য এমন এক স্বপ্নপূরণের দারুণ সুযোগ, যা তাদের জন্য ইউরোপে বাস্তবায়ন অসম্ভব ছিল। তৎকালীন ইউরোপীয় আইন অনুসারে মৃতব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পদ তার সকল পুত্রের মাঝে বণ্টন করা হতো না; বরং জমিদার পিতার মৃত্যুর পর পুরো সম্পদের মালিকানা চলে যেত তার বড় পুত্রের কাছে। এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ বিভক্ত হয়ে এবং ভূমির পরিমাণ কমে গিয়ে যেন প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস না পায়।[১৭১] এই আইনের কারণে ইউরোপে রাজন্যপুত্রদের এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হয়েছিল, যাদের সম্পদের মালিক হওয়ার কোনো আশা ও স্বপ্নই ছিল না। তাদের সামনে যখন ফিলিস্তিনে যুদ্ধের দুয়ার উন্মোচিত হলো, তখন তারা নিজেদের বড় ভাইদের সঙ্গে সম্পদের প্রতিযোগিতায় নামতে যেকোনো ধরনের মালিকানা লাভের আশায় ফিলিস্তিন অভিযানে অংশ নিতে ছুটে গিয়েছিল।

তদ্রূপ ইতালিয়ান বিভিন্ন নৌবন্দরের বণিকদের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক আগ্রহের বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে ভেনিস, পিসা ও জেনোভার বণিকগোষ্ঠীর কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া ফ্রান্সের মার্সেই (Marseille) নগরীসহ ইউরোপের অন্যান্য নগরীর বণিকদের কথাও বলা যেতে পারে। এসব বণিক দেখছিল যে, যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ পোপ ও গির্জার স্বার্থের প্রতিকূলে; কিন্তু এখন পোপের আহ্বানের মাধ্যমে তাদের সামনে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের এক দারুণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[১৭২] প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মাঝে স্বার্থবিনিময়ের বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। একদিকে পোপ ও গির্জাকেন্দ্রিক ক্রুসেডারদের আসন্ন অভিযানের জন্য নৌবন্দরগুলোর সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প কোনো উপায় ছিল না, অপরদিকে নৌবন্দরগুলোর নিয়ন্ত্রক ও বণিকগোষ্ঠীও সহায়তার বিনিময়ে শীঘ্রই অভাবনীয় বিনিময়প্রাপ্তির আশা করছিল। অধিকন্তু ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারী ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্রগুলোকে অধিকৃত অঞ্চলে বিশেষ ছাড় ও সুবিধাদি প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ কেবল বিজিত অঞ্চলে ব্যবসায়িক স্বাধীনতা নয়; বরং তাদেরকে বিজিত প্রতিটি নগরীতে রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, স্নানাগারবিশিষ্ট হোটেল, বেকারি

[১৭১]. সাইদ আশুর, *উরুব্বা ফিল উছুরিল উসত্বা*, ২/২৬৩।

[১৭২]. Heyd : Hist. du Commerce I, 132-133.

ইত্যাদিও প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একে কেন্দ্র করে ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড রকমের বিরোধ, এমনকি পারস্পরিক সংঘাত ও হানাহানির ঘটনাও ঘটে। মার্সেইয়ের বণিকশ্রেণিও অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং একেবারে বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে বিশেষ শক্তিশালী অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়।[১৭৩]

এটি সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের অতিলোভী বণিকশ্রেণির মন ও মস্তিষ্ক কখনোই ধর্মীয় চেতনা ও আবেগে নিমগ্ন ছিল না। মূলত প্রাচ্যের ধনভান্ডার ও উর্বর ভূমিই ছিল ক্রুসেড অভিযান সফল করার জন্য তাদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার মূল অনুপ্রাণিকা।

৩. রাজনৈতিক স্বার্থ

ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং পোপ ২য় আরবানের ক্ষেত্রে এই অভিযানের জন্য এত দৌড়-ঝাঁপের মূল অনুপ্রাণিকা ছিল রাজনৈতিক, অর্থাৎ আপন ক্ষমতার পরিধি ও প্রতিপত্তি বিস্তার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন। ইউরোপের শাসকবর্গের অনুপ্রাণিকাও এটিই ছিল। এসব শাসকের লোভ ও চাহিদা কোনো কিছুতেই স্তিমিত হতো না। আপন কর্তৃত্বাধীন ভূমির ক্ষমতার জোরে তারা আরও অনেক ভূখণ্ডের মালিকানার জন্য লালায়িত ছিল। আর তাই প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সফলতা প্রত্যক্ষ করে পরবর্তী অভিযানগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

তা ছাড়া ইউরোপের শাসকবর্গ প্রত্যক্ষ করছিল যে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ইতিমধ্যে দুর্বলতার প্রভাব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। যেকোনো সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের অর্থ হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেলজুক বা অন্য কোনো মুসলিম সামরিক শক্তির সামনে ইউরোপের পূর্ব দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। তখন একদিকে প্রাচ্য থেকে আগত মুসলমান এবং অপরদিকে আন্দালুসের মুসলমান—দুই শত্রুর মাঝে পড়ে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের অবস্থা হবে সাঁড়াশির দুই চোয়ালের মাঝে আটকা পড়ার মতো। এ কারণেই আমরা দেখেছি—ক্রুসেড অভিযানের প্রথম দিকে ইউরোপীয় শাসকগণ গড়িমসি করলেও পরবর্তী অভিযানগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য

---

১৭৩. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যাহ*, ১/৩৩-৩৪।

তারা সাগ্রহে ছুটে এসেছিল; বরং তাদের কেউ কেউ নিজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিন বা মিশর ভূমিতে পৌঁছে গিয়েছিল।

৪. সামাজিক অনুপ্রেরণা

ক্রুসেড যুদ্ধ-পূর্ব ইউরোপের অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পেছনে সেই দুঃসহ পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছি, যার মাঝে তৎকালীন ইউরোপের কৃষক ও দাসশ্রেণি দিনাতিপাত করছিল। পানাহারদ্রব্যের অপ্রতুলতা তো ছিলই; পরিস্থিতি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের শোচনীয়। কৃষকশ্রেণির ন্যূনতম অধিকারও ছিল না। জমির সঙ্গে তারাও বিক্রি হতো। কোনো ধরনের সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার তাদের ছিল না। একজন মানুষ কখনো কখনো হয়তো ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করতে পারে; কিন্তু আচরণগত অবজ্ঞা ও মানসিক নিপীড়ন অনেক সময় ক্ষুৎপিপাসার চেয়েও অসহ্য হয়ে পড়ে। এ কারণেই ইউরোপের সাধারণ কৃষকশ্রেণি ক্রুসেড অভিযানকে নিজেদের জীবনব্যবস্থা পরিবর্তনের এবং লাঞ্ছনাকর দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে সম্ভাব্য নিষ্কৃতির এক সুবর্ণ সুযোগ মনে করছিল। আর তাই কৃষকরা অভিযানে যোগ দিয়েছিল নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে, নিজেদের অতিসাধারণ সামান্য সামানাটুকুও সঙ্গে নিয়ে। তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল প্রত্যাবর্তনহীন এক অভিযাত্রা, পরিস্থিতির পূর্ণ পরিবর্তন-প্রচেষ্টা এবং দুর্দশা ও শোষণের জীবনের বিরুদ্ধে এক প্রকৃত বিদ্রোহ। এ কারণেই আমরা সামনের ঘটনাপ্রবাহে শীঘ্রই অবলোকন করব যে, এই দুর্দশাগ্রস্ত দলটি এমনকি বাহিনী-বিন্যাস ও পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের সময়টুকু পর্যন্তও ধৈর্য ধরতে পারেনি; বরং মূল প্রশিক্ষিত বাহিনীকে ছাড়া নিজেরাই দ্রুত বেরিয়ে পড়েছে। কার্যত মনে হচ্ছিল—অসহায় এ মানুষগুলো এক দীর্ঘ বন্দিদশা থেকে মুক্তির আশায় ছুটে পালাচ্ছে!

এসব দুস্থ ও বিপর্যস্ত মানুষের সঙ্গে অপরাধী ও রাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গকারীদের একটি দলও যোগ দিয়েছিল। তারা বিচারিক আইনে অপরাধী হওয়ায় হয়তো শাস্তির সম্মুখীন ছিল কিংবা শাস্তির হুমকিতে ছিল। তাদের দৃষ্টিতে ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণ কেবল আইন থেকে নিষ্কৃতির পথই ছিল না; ছিল নিজেদের সন্ত্রাসী-জীবনের নিত্যকর্ম ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদির অবারিত সুযোগ। আর পরবর্তী সময়ে এ বিষয়টিও ক্রুসেড অভিযানে নানাবিধ অন্যায়-অনাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা বিস্মৃত হওয়া মোটেও সম্ভব নয়।

মোটামুটি এসব অনুপ্রাণিকা ও কার্যকারণের দাবিতেই তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজ ইসলামি ভূমিতে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা এবং ইসলামি ভূমি, সম্পদ ও নাগরিকদের ওপর প্রভাব বিস্তারের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল।

পরবর্তী জানার বিষয়—

তাদের এত সব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, চেষ্টা ও কর্মপ্রচেষ্টা কী পরিণতি লাভ করেছিল?

সমবেত প্রথম বাহিনীটি যখন শাম অভিমুখে রওনা হয়েছিল, তখনকার চিত্র কেমন ছিল?

আর ইসলামি ভূখণ্ডে পা রাখার পূর্বে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের সঙ্গেই-বা এই বিশাল বাহিনী কীরূপ আচরণ করেছিল?!

প্রিয় পাঠক, এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আপনাকে এখানেই না থেমে অগ্রসর হতে হবে সামনের পরিচ্ছেদে!

* * *

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে ক্রুসেডার বাহিনী

ইউরোপের পথে পথে উচ্ছৃঙ্খল জনতার ধ্বংসযজ্ঞ

দুঃসহ কষ্টের জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকশ্রেণি প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে নিজ নিজ এলাকা থেকে রওনা হয়। তারা এমনকি নিয়মিত ও প্রশিক্ষিত বাহিনী প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও রাজি ছিল না। নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও প্রবল উদ্দীপনায় বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হয়ে তারা নিজেরাই ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ সম্মুখ সমর সম্পর্কে কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা দূরে থাক, সম্ভবত তাদের অধিকাংশের ইতিপূর্বে কখনো তরবারি ধরার অভিজ্ঞতাও ছিল না!



মানচিত্র নং-১০

অনিয়মিত বাহিনীগুলোর গতিপথ

উচ্ছৃঙ্খল জনতার একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন 'কাঙাল'-খ্যাত ধর্মযাজক ওয়ালটার। ওয়ালটার ছিলেন বাওয়াসি (Boissy-sans-Avoir) অঞ্চলের একজন দুর্বৃত্ত যোদ্ধা। ওয়ালটারের নেতৃত্বাধীন বাহিনীটিতে মাত্র আটজন নিয়মিত যোদ্ধা ছিল।[১৭৪]

অনিয়মিত বাহিনীটি ফ্রান্স থেকে রওনা হয়ে প্রথমে জার্মানি অতিক্রম করে। পথে অতি-উৎসাহী অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এ সময় যদিও ওয়ালটার তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করে নেন; কিন্তু তারপরও বাহিনীর সদস্যদের আচার-আচরণে সুস্পষ্টভাবেই অনভিজ্ঞতা ও অব্যবস্থাপনা প্রকাশ পাচ্ছিল।

জার্মানি অতিক্রম করার পর উচ্ছৃঙ্খল জনতার বাহিনীটি হাঙ্গেরির ভূখণ্ড পাড়ি দিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পা রাখে। এ পর্যায়ে এসে তাদের এই অভিযানের উগ্র মনোবৃত্তি ও অনৈতিক স্বভাব-প্রকৃতি পুরোপুরি উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

উচ্ছৃঙ্খল কৃষক-জনতার বাহিনীটি নিজেদের বিশাল জনশক্তির কথা ভেবে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের অতীত জীবনের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও ক্ষুৎপিপাসার ইতিহাস স্মরণ করে তারা ভুলে যায় আপন গন্তব্যের কথা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা। তারা তো রওনা হয়েছিল প্রাচ্যের 'নিপীড়িত' খ্রিষ্টানদের উদ্ধার করতে। কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে পথেই তারা বিভিন্ন নগর ও জনপদে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ এসব জনপদ ছিল সম্পূর্ণই খ্রিষ্টানঅধ্যুষিত! স্বাভাবিক প্রত্যাশা এটাই ছিল যে, ক্রুসেডার বাহিনী খ্রিষ্টানজাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে, যমদূত নয়![১৭৫]

নিঃসন্দেহে ওয়ালটারের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর এই সিদ্ধান্ত ছিল খ্রিষ্টান ইউরোপের ইতিহাসে এক অমোচনীয় কলঙ্ক-দাগ। উচ্ছৃঙ্খল কৃষকরা পথে বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের ওপর হামলা চালানোর পাশাপাশি নির্বিচারে ধনসম্পদ লুট করতে থাকে।

রাজ্যের অভ্যন্তরে হঠাৎ সৃষ্ট নৈরাজ্যে বাইজান্টাইন রাজা হতভম্ব হয়ে পড়েন। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামরিক—সব ধরনের বোধ-উপলব্ধিশূন্য

---

১৭৪. Albert D' Aix, in Peters (ed)., The First Crusades, pp. 95-96.

১৭৫. Vasiliev: op. cit., vol.II, p. 404.

এই বিশাল বাহিনীকে তিনি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?! তাদের ধর্মীয় চেতনাশূন্যতার বিষয়টি তো একেবারেই সুস্পষ্ট। কারণ, তারা ন্যূনতম যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই স্বজাতীয় খ্রিষ্টানদের হত্যা করছে। রাজনৈতিক চেতনাশূন্যতার দিকটিও সুস্পষ্ট। কারণ, তারা এই হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালাচ্ছিল সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে, যার আছে সুবিশাল ও অভাবনীয় সামরিক শক্তি। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সামরিক জ্ঞানও ছিল শূন্যের কোঠায়, যা তাদের বাহিনী-বিন্যাস ও যুদ্ধ-আচরণেই সুস্পষ্ট অনুমিত হচ্ছিল।

বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস সার্বিক দিক বিবেচনা করে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করাই সমীচীন মনে করেন। কারণ, তিনি তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। আর তাই কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বিবেচিত হলেও সম্রাট তাদের কোনো ক্ষতি না করে তাদেরকে অন্যান্য বাহিনীর অপেক্ষায় নগরপ্রাচীরের বাইরে অবস্থান করার নির্দেশ দেন।[১৭৬]

ওদিকে ধর্মযাজক পিটারও ততদিনে দরিদ্র কৃষকশ্রেণির প্রচুর নারী-পুরুষ-শিশু সমবেত করে ফেলেছেন। ভবঘুরে, অপরাধী ও ব্যভিচারিণী নারীদের একটি বড় অংশও তাদের সঙ্গে সমবেত হয়েছিল।[১৭৭] তারা সকলে জার্মানির রাইন নদীর অববাহিকায় একত্র হয়ে ৪৮৯ হিজরি সনে (১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল) জার্মানি ত্যাগ করে। এ দলেও অতি অল্প সংখ্যক পেশাদার সৈন্য ছিল। ধর্মযাজক পিটার তার ল্যাংড়া গাধায় চড়ে বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।[১৭৮]

কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনী যেমন কনস্টান্টিনোপলের পথে সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল, ধর্মযাজক পিটারের বাহিনীও একই ঘটনা ঘটায়। পিটারের বাহিনী হাঙ্গেরির সীমানায় প্রবেশ করতেই ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে লুটতরাজ ও নৈরাজ্য শুরু করে। কারণ, তার বাহিনী ছিল কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনীর তুলনায় আকারে যেমন বড়, তেমনই

---

১৭৬. Chalandom: Premiere Croisade, p. 61-62; Cam. Med. Hist. Vol. 5,p.p. 275-276.

১৭৭. William of Tyre, p. 105; Hagenmeyer, "Chronologi", p. 243.

১৭৮. Setton: op. cit. 1, pp. 263-265.

স্বভাব-প্রকৃতিতেও তুলনামূলক বেশি উচ্ছৃঙ্খল। এর ফলে ধর্মযাজক পিটারের অভিযানের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি যদিও তার বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন 'প্রভুর বাহিনী'; কিন্তু তার বাহিনীর সদস্যরা খ্রিষ্টান নাগরিকদের প্রাণ নিশ্চিহ্ন করতে এবং তাদের ধনসম্পদ লুট করতে সামান্য দ্বিধাও করেনি।

বিশেষ করে হাঙ্গেরির সেমলিন (semlin) নগরীতে ট্র্যাজেডি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ধর্মযাজক পিটারের সঙ্গীরা এই খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত নগরীটিতে হামলা চালিয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। একসঙ্গে প্রাণ হারায় চার হাজার খ্রিষ্টান নাগরিক![১৭৯]

হাঙ্গেরির রাজা কোলোম্যান (Coloman the Learned) বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমন একদল লোক, যারা নিজেদের প্রতীক হিসেবে ক্রুশ উত্তোলন করেছে, তারা এরূপ ধ্বংসাত্মক আচরণ করবে, তা তিনি মোটেও প্রত্যাশা করেননি।[১৮০] তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যসমাবেশ করে ধর্মযাজক পিটারের বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান। ফলে পিটারের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে হাঙ্গেরির বন-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু মারা পড়ে আর বাকিরা পালিয়ে নিজেদের সন্ত্রাসী অভিযান অব্যাহত রাখতে পার্শ্ববর্তী বাইজান্টাইন ভূমিতে চলে যায়।

বাইজান্টাইন ভূমিতে গিয়ে তারা নতুন করে সমবেত হয়। বাইজান্টাইন গোয়েন্দারা তাদেরকে কড়া নজরদারিতে রাখলেও ইচ্ছা করেই তাদেরকে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেয়। বাইজান্টাইন প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল পিটারের বাহিনীকে কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু বাইজান্টাইন প্রশাসনের এই শিথিলতা পিটারের সন্ত্রাসী দলটিকে নতুন করে লুটপাট শুরু করতে প্ররোচিত করে তোলে! সেমলিন-ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি ঘটে এবার বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত নিস (Niš) নগরীতে। ধর্মযাজক পিটার ও তার সঙ্গীরা প্রচুর সংখ্যক অর্থোডক্স খ্রিষ্টানকে হত্যা করে এবং বিভিন্ন জনবসতিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অবস্থাদৃষ্টে

---

১৭৯. Albert d' Aix: Rec. Hist. (cr) Hist. Occid., IV, p. 279.

১৮০. Ekkhrad D' Aura, in Petes (ed), pp. 100-101; Albert d' Aix, pp. 100; William of Tyre, p. 112; "Clermont to Constantinople", pp. 262-265.

বাইজান্টাইন সৈন্যরা নিশ্চুপ বসে না থেকে হামলা চালিয়ে পিটারের বাহিনীর প্রচুর সদস্যকে হত্যা করে। পিটার পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইতিপূর্বে যেসব দান-অনুদান সংগ্রহ করেছিলেন, বাইজান্টাইন সৈন্যরা তা-ও ছিনিয়ে নেয়। তবে এত কিছুর পরও বাইজান্টাইনরা চাচ্ছিল এই উচ্ছৃঙ্খল ও সন্ত্রাসী দলটিকে পুরোপুরি নিঃশেষ না করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাঠাতে।

পিটারের বাহিনী যখন সোফিয়া (Sofia) নগরীর কাছে পৌঁছায়, বাইজান্টাইন সম্রাট তখন তাদের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে তাদেরকে এই উচ্ছৃঙ্খল ও বর্বর আচরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং বাইজান্টাইন ভূখণ্ডের কোনো নগরীতে তিনদিনের বেশি অবস্থান না করার নির্দেশ দেন। এরপর বাইজান্টাইন বাহিনীর একটি ইউনিট তাদেরকে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের দিকে পরিচালিত করে কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করার দায়িত্ব নেয়।[১৮১]

নিঃসন্দেহে পাঠক এই উচ্ছৃঙ্খল বাহিনীর কর্মকাণ্ড পাঠ করে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করছেন। পাঠক অবাক হয়ে ভাবছেন, এমনটি হওয়াও কি সম্ভব?! কিন্তু ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠক ও সূক্ষ্মভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণকারী ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করবেন যে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই; বরং এটি একেবারেই স্বাভাবিক একটি বিষয়। ইতিহাসের পরতে পরতে বহুবার এরূপ ঘটনা ঘটেছে। বস্তুত সমকালীন ইউরোপীয় খ্রিষ্টানসমাজ ছিল এমন এক সম্প্রদায়, যাদের মাঝে দয়া ও মানবতা, ধর্মীয় বোধ ও চারিত্রিক উদারতা—এসব গুণের মোটেও অস্তিত্ব ছিল না। আর যারা এসব চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত নয়, নিঃসন্দেহে তারাই এরূপ স্বেচ্ছাচারী ও সন্ত্রাসী সম্প্রদায়ে পরিণত হবে। কাদিসিয়ার প্রান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রওনা হওয়া পারসিক বাহিনীও পথে ঠিক একই কাজ করেছিল। তারা পথে পারস্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন নগরী ও গ্রামে হামলা চালিয়েছিল। সেসব জনপদে যারা বসবাস করত, তারা রক্ত ও ধর্ম-পরিচয় উভয় দিক থেকেই পারসিক নাগরিক ছিল। তা সত্ত্বেও পারসিক বাহিনী ভূখণ্ডগুলোতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, নাগরিকদের হত্যা করে তাদের ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ি লুটপাট করে এবং নারী-শিশুদের ওপর নির্মমতা চালায়।

---

১৮১. William of Tyre, p. 105; Hagenmeyer, "Chronologi", p. 243.

এমনকি চলমান ঘটনাপ্রবাহে যে বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী এসব উচ্ছৃঙ্খল বাহিনীকে শান্তি বজায় রাখার, নিজেদের সাম্প্রদায়িক চেতনা সংবরণ করার এবং আপন ধর্মীয় ভাইদের হত্যা না করার পাঠদান করছে, কালের আয়নায় আমরা তাদের কী চেহারা দেখতে পাই?! তারাই তো শাম অঞ্চলের খ্রিষ্টান নাগরিকদের অত্যাচার ও নিপীড়নের নানা রকম স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে, তাদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এবং তাদের উৎপাদিত ফল-ফসল জোর করে রোমান সাম্রাজ্যে নিয়ে গেছে। মিশরে তো তাদের আচরণ ছিল আরও নিপীড়নমূলক। অথচ শাম ও মিশরবাসী তো ধর্মপরিচয়ে তাদের মতো অর্থোডক্স খ্রিষ্টানই ছিল!

আসুন জার্মান নাৎসি বাহিনীর কথায়। তারা যখন নিজেদের শক্তিমত্তা উপলব্ধি করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, তখন কী আচরণ করেছিল?!

যেসব জাতিবর্গ জার্মান নাৎসিদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, তারা সকলে জার্মানদের মতো খ্রিষ্টানই ছিল।

জার্মানদের কথা রাখুন! কোনো ইসলামি বাহিনীও যদি কেবল নামেই ইসলামি বাহিনী হয়, সুষম চরিত্রগুণ-শূন্য এবং শরিয়তের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন হতে বিমুখ হয়, তাহলে তারাও পরিণত হয় আরেক সন্ত্রাসী বাহিনীতে; অমুসলিমদের পূর্বে মুসলমানরা তাদের অসদাচরণের শিকার হয়। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমরা দেখে থাকি সেসব মুসলিম বাহিনীর ক্ষেত্রে, যারা ইসলাম হতে সম্পূর্ণ দূরে থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে থাকে।

কাঙাল ওয়ালটার ও ধর্মযাজক পিটার-এর অভিযানের এই প্রাথমিক বিবরণই আমাদের সামনে ক্রুসেড যুদ্ধের স্বভাব-প্রকৃতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে দেয়। যদিও প্রতীক হিসেবে ক্রুশ উত্তোলন করা হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল মূলত লুটতরাজ, জবরদখল ও সম্পদ অর্জন।

উল্লিখিত দুটি দল ছাড়াও আরও কিছু জাতি-গোষ্ঠী একই উদ্দেশ্যে পশ্চিম ইউরোপ থেকে রওনা হয়েছিল। যেমন ভল্কমারের (Volkmar) বাহিনী, গটস্চকের (Gottschock) বাহিনী, ইমিচের (Emich) বাহিনী।[১৮২]

---

১৮২. Setton: op.city. 1. pp. 263-265.

প্রতিটি বাহিনীর বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন ভূখণ্ডে রাহাজানি সৃষ্টি করা। ইমিচের বাহিনী রাইন নদীর উপত্যকায় স্পেয়ার (Spier) নগরীতে বারোজন ইহুদি নাগরিককে হত্যা করে। এরপর তারা উরমুজ নগরীতে হত্যা করে পাঁচশ ইহুদিকে। এটি ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মে-এর ঘটনা।[১৮৩] মেইনৃজ (Mainz) নগরীতে তারা হত্যা করে এক হাজার ইহুদি নাগরিককে।[১৮৪]

ভল্কমারের বাহিনীও প্রাগ (Prague) নগরীতে প্রচুর ইহুদি নাগরিককে হত্যা করে।[১৮৫] এসব অভিযানে ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর লালিত উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা পুরোপুরি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। কারণ, তারা ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলোতে ইহুদিদের হত্যা করছিল, প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থোডক্সদের হত্যা করছিল আর সামনে অগ্রসর হচ্ছিল মুসলমানদের হত্যা করার জন্য।

তবে এই শেষোক্ত বাহিনীগুলো বিশেষ করে ইমিচ ও ভল্কমারের বাহিনী পথে কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। হাঙ্গেরির রাজা কোলোম্যান তাদের জন্য ওত পেতে ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তারাও কাঙাল ওয়ালটার ও ধর্মযাজক পিটারের বাহিনীর ঘটনার পুনঃমঞ্চায়ন ঘটাতে পারে। এ কারণেই তিনি এই বাহিনীগুলোকে অবরোধ করেন এবং পুরোপুরি নিঃশেষ করে দেন। ফলে ওয়ালটার ও পিটারের বাহিনীর সঙ্গে শরিক হয়ে ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেড অভিযান পরিচালনার সুযোগ তাদের হয়নি।

নিঃসন্দেহে এ ঘটনা ছিল দুঃসহ দারিদ্র্যের জীবন থেকে পালিয়ে আসা দুর্ভাগা একদল লোকের অত্যন্ত করুণ এক পরিণতি। হাঙ্গেরির বন-জঙ্গলে অসহায় কিছু লোকেরই কেবল মৃত্যু ঘটেনি; অপমৃত্যু ঘটে তাদের ইসলামি প্রাচ্যে সুখময় জীবনযাপনের স্বপ্নেরও।

আমরা আবারও কনস্টান্টিনোপলের নগরপ্রাচীরের কাছে ফিরে আসছি, যেখানে ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টের শুরুতেই (৪৮৮ হিজরি সনে) ধর্মযাজক পিটারের বাহিনী কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পৌঁছে গেছে। উভয় বাহিনীর সম্মিলনে ইতিমধ্যেই ক্রুসেডার

---

১৮৩. Cam. Med. Hist. Vol5. p.277.

১৮৪. Albert d' Aix Iv, pp.292-293.

১৮৫. Runciman: Op. City. 1. pp 134-141.

বাহিনী বিশাল আকার ধারণ করেছে। এসব কৃষক ও দুঃসাহসী জনতার সংখ্যা নির্ণয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে বিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় পঁচিশ হাজারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোনো কোনো বর্ণনায় সর্বোচ্চ এক লক্ষের কথাও এসেছে। স্মর্তব্য যে, সব বর্ণনাই ছিল নারী ও শিশুদের বাদ দিয়ে কেবল যোদ্ধাপুরুষদের হিসাব করে।[১৮৬]

ধর্মযাজক পিটার কনস্টান্টিনোপলের কাছে পৌঁছলে বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে সহায়তা করার জন্য ইউরোপের পাঠানো এই বিশাল উচ্ছৃঙ্খল জমায়েত দেখে যদিও তিনি মুগ্ধ হন; কিন্তু তিনি জানতেন যে, এটি মূল ক্রুসেডার বাহিনী নয়; বরং মূল প্রশিক্ষিত বাহিনীর অগ্রবর্তী দল মাত্র। এ কারণেই তিনি ধর্মযাজক পিটারকে মূল বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে বলেন এবং প্রশিক্ষিত সেলজুক বাহিনীর মোকাবিলায় তাড়াহুড়া বা দুর্বিনীত ভাব প্রকাশ করতে নিষেধ করেন।

কিন্তু দারিদ্র্য ও নিপীড়নের যাতাকলে পিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল খ্রিষ্টান বাহিনীর ধৈর্যধারণের সময় কোথায়! তারা এবার বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের আশেপাশের বিভিন্ন জনপদেই লুটতরাজ শুরু করে। অবস্থাদৃষ্টে বাইজান্টাইন সম্রাট আশঙ্কা করেন যে, এভাবে চলতে থাকলে বাইজান্টাইন সৈন্যরা সাম্রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণই হারিয়ে ফেলবে। পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে এবং কনস্টান্টিনোপল ও আশেপাশের অঞ্চলের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি এবার সমবেত ক্রুসেডার বাহিনীকে কালবিলম্ব না করে দ্রুত বসফরাস প্রণালি পার করিয়ে এশিয়া মাইনরের ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে রওনা করিয়ে দেওয়াই সমীচীন মনে করেন। যদিও সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস তাদের হঠকারিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেন এবং বাইজান্টাইন জাহাজ দিয়ে প্রণালি পার হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি তাদেরকে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও প্রদান করেন এবং আসন্ন অভিযানে সহায়তা করার জন্য তাদের সঙ্গে কয়েকজন গোয়েন্দা ও

---

১৮৬. Ostrogorsky: op. cit., p. 321.

সমরবিশেষজ্ঞ প্রেরণ করেন।[১৮৭]

দৃশ্যপটে কিলিজ আরসালান, উচ্ছৃঙ্খল ক্রুসেডার বাহিনীর পতন

ওয়ালটার ও পিটারের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনী এশিয়া মাইনর অঞ্চলে প্রবেশ করার পর পেশাদার ও প্রশিক্ষিত বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে বিভিন্ন মুসলিম জনপদে হামলা শুরু করে এবং হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। বিপরীত দিক থেকে প্রবল প্রতিরোধ না থাকায় নিজেদের প্রাথমিক সাফল্যে তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এতটুকু চিন্তাও তাদের ছিল না যে, তারা ইতিমধ্যে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের সেলজুক রাষ্ট্রের তৎকালীন সুলতান কিলিজ আরসালান বিন সুলায়মান বিন কুতুলমিশের ঘাঁটি নিকিয়া নগরীর অল্প কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে।[১৮৮]

সুলতান কিলিজ আরসালান একটি সামরিক কৌশল অবলম্বন করেন এবং এই নির্বোধ-অশিক্ষিত বাহিনীটিকে মজবুত ফাঁদে আটকে ফেলতে সক্ষম হন। সেলজুক বাহিনী ক্রুসেডার বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এরপর শুরু হয় দ্রুত যুদ্ধ। যুদ্ধে সাম্প্রদায়িক চেতনা লালনকারী খ্রিষ্টান বাহিনীটির সামরিক অজ্ঞতা পুরোপুরি প্রকাশ পেয়ে যায় এবং তারা সেলজুক বাহিনীর হাতে বেঘোরে মারা পড়ে। অগ্রবর্তী এই বাহিনীটির বিপর্যয়ের সংবাদ পাওয়ার পর বাইজান্টাইন সম্রাট যদি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করতেন, তাহলে তাদের একজনও বাঁচতে পারত না। তিনি দ্রুত তাদের রক্ষায় কিছু বাইজান্টাইন সৈন্যসহ কয়েকটি জাহাজ প্রেরণ করেন। বাইজান্টাইন বাহিনী মাত্র তিন হাজার ক্রুসেডারকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বাকিরা সকলে সেলজুক বাহিনীর ফাঁদে পড়ে নিহত হয়। যুদ্ধে কাঙাল ওয়ালটারও নিহত হন। তবে ধর্মযাজক পিটার এ সময় বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কনস্টান্টিনোপলে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।[১৮৯]

---

১৮৭. William of Tyre, 1. Pp. 105-106; Anna Comnena, Alexiade, pp. 311; Duncalf, "Clermont to Constantinople:, p. 259-260; Hagenmeyer, "Chronolgie", pp. 245-246.

১৮৮. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 8.

১৮৯. অপ্রশিক্ষিত কৃষক-জনতার বাহিনীগুলোর পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : Albert D' Aix, in Peters (ed.), 108-112; William of Tyre, 1, pp. 106-109;=

নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ছিল বাইজান্টাইন সম্রাটের জন্য এবং স্বাভাবিকভাবেই ধর্মযাজক পিটারের জন্য বিরাট কঠিন এক আঘাত। সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস ধর্মযাজক পিটারসহ বেঁচে যাওয়া লোকদেরকে কনস্টান্টিনোপলেই অবস্থান করে মূল বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে বলেন।

এভাবেই সাধারণ জনগণ ও কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত সবগুলো দলের করুণ ও বেদনাদায়ক পতন ঘটে। কেউ মারা যায় হাঙ্গেরির রাজার হাতে, কেউ নিহত হয় মুসলিম সেলজুক সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। ইউরোপের দরিদ্র ও কৃষকশ্রেণি এভাবেই তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সামন্ত ও ভূ-স্বামীদের প্রতারণার মূল্য পরিশোধ করে। যুগে যুগে পরাজিত ও পরাভূত জাতিগোষ্ঠী এভাবেই নিজেদের অধঃপতন ও লাঞ্ছনার মূল্য পরিশোধ করে থাকে!

এদিকে যখন অপ্রশিক্ষিত বাহিনীগুলো নির্বিচারে কচুকাটা হচ্ছিল, ওদিকে পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সে তখন চলছিল প্রশিক্ষিত সৈন্যসমাবেশের বিশাল আয়োজন। এত বড় সৈন্যসমাবেশ ইউরোপের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। বরং সম্ভবত পৃথিবী তার সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় এরূপ বিশাল সৈন্যসমাবেশের দৃশ্য অবলোকন করেনি।

প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সামরিক প্রস্তুতি

পশ্চিম ইউরোপ তখন একতা নামক কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বরং ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বৃহৎ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে বিগত ছয় শতাব্দীর অধিক সময় পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর সেনাবাহিনী কোনো যুদ্ধে একজোট হতে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা হলো আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তর আন্দালুসের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর যুদ্ধে এসব রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে ফ্রান্স সামরিক সহায়তা প্রদান করেছিল।

=Anna Comnena, Alexiade, pp. 311-313; Gesta. Francorum, pp. 2-4; Hagenmeyer."Chronolgie" pp 245.251-254; Runciman, "Constantinople to Antioch", in setton, 1, pp. 281-284; Badford, The Sword, pp. 38-39. কাসিম আবদুহু কাসিম, *আল-খালফিয়্যাতুল আইদুলিজিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৬৫, জোযেফ নাসিম, *আল-আরাব ওয়ার-রূম ওয়াল-লাতীন*, পৃষ্ঠা : ১৫৮-১৭০ ও যাবুরুফ, *আস-সালিবিয়্যুন ফিশ-শারক্ব*, পৃষ্ঠা : ৫৭-৯৫।

পারস্পরিক ঐক্য দূরে থাক, রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও ঐক্যের অনুকূলে ছিল না। সামন্তবাদী নীতির কারণে প্রতিটি সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্র অনেকগুলো জায়গির অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি জায়গির অঞ্চলের ছিল আলাদা রাজন্য ও জমিদার, যিনি নিজ এলাকা অনেকটা স্বায়ত্তশাসন করতেন। যদিও অনেকগুলো জায়গির একটি রাষ্ট্রপরিচয়ের অধীনে আবদ্ধ থাকত এবং রাজন্যবর্গ সেই রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের শাসক বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করত; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই আনুগত্য হতো নিছক আনুষ্ঠানিক; বাস্তবে কোনো আনুগত্যের বালাই থাকত না।

এই প্রেক্ষাপটকে মনে রাখলে আমাদের পক্ষে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ উপলব্ধি করা সহজ হবে। আমরা বুঝতে পারব যে, এই সব ভিন্ন ভিন্ন জায়গির অঞ্চলের বাহিনীগুলোর একটি সুবিন্যস্ত বাহিনীতে পরিণত হওয়া কেন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে; বরং অনেকটা অসম্ভব বিবেচিত হবে। বাস্তবেও আমরা দেখব যে, আসন্ন অভিযানে অংশগ্রহণকারী ক্রুসেডার বাহিনী গঠিত হবে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি দলের সমন্বয়ে; প্রতিটি দলের থাকবে আলাদা সেনাপতি; প্রত্যেক সেনাপতির থাকবে নিজস্ব স্বপ্ন ও নিজস্ব মিত্র। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের ঘটনাও ঘটবে; কিন্তু নিঃসন্দেহে এসব বাহিনীর মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ ও কলহের ঘটনাও ঘটবে। বিশেষ করে প্রথম ক্রুসেড অভিযানে যারা শরিক হয়েছিল, তাদের অনেকেই নিজেদের মধ্যে পূর্ব থেকে বিবাদরত ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। এ সবকিছুই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করবে যে, তাদের সকলের কিংবা সতর্কতার দাবিতে বললে অধিকাংশের অভিযাত্রার একমাত্র অনুপ্রাণিকা ছিল ব্যক্তিগত লোভ-লালসা এবং বিশেষ স্বার্থ চরিতার্থ করা। তাদের চিন্তা-চেতনায় কক্ষনোই ধর্ম, গির্জা বা ক্রুশ বিদ্যমান ছিল না।

ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী সামরিক বাহিনীসমূহ

প্রথম ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষিত বাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাব যে, বাহিনীটি মূলত পাঁচটি আলাদা আলাদা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।



মানচিত্র নং-১১

প্রথম ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনীসমূহ

১. প্রথম বাহিনীটি ছিল ফরাসি নাগরিক গডফ্রে ডি বোলোন (Godfrey de bouillon)-এর নেতৃত্বাধীন। গডফ্রে ছিলেন লুক্সেমবার্গের দক্ষিণে অবস্থিত বোলোন নগরীর প্রশাসক। এরপর তিনি লোথারিঙ্গিয়া সাম্রাজ্যের ডিউক নির্বাচিত হন। তার সঙ্গে তার ভাই যুবরাজ বল্ডউইন (Baldwin I)-ও ছিলেন।[১৯০] এ ছাড়াও তার বাহিনীতে বেশ কয়েকজন সামন্ত ছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল ফ্রান্সের। বেশ কয়েকজন সামন্তের উপস্থিতির কারণে গডফ্রের বাহিনীটি বিশেষ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিল।[১৯১] বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিল উত্তর ফ্রান্সের লোরেন (Lorraine) অঞ্চলের। অবশ্য কিছু জার্মান সৈন্যও তাদের সঙ্গে ছিল।[১৯২]

ফরাসি নাগরিক হলেও গডফ্রে কিন্তু তৎকালীন ফ্রান্সের দুর্বল রাজা ১ম ফিলিপের অনুগত ছিলেন না, তিনি আনুগত্য করতেন জার্মানির

---

১৯০. Michaud: Hist. Des Croisades, 1, pp. 146-147.

১৯১. Runciman: op. cit., 1, p. 147.

১৯২. William Of Tyre 1, pp. 116-120.

শক্তিমান রাজা ৪র্থ হেনরির।[১৯৩] গডফ্রের স্বপ্ন ছিল, তিনিই হবেন সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তার বাহিনীতে অধিক সংখ্যক সামন্তের উপস্থিতি তাকে এক্ষেত্রে শক্তি জোগাচ্ছিল।

২. দ্বিতীয় বাহিনীটিও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে আগত বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন তুলুজ (Toulouse) ও প্রভিন্স (Provence)-এর ডিউক ৪র্থ রেমন্ড (Raymond IV)। রেমন্ডের উপস্থিতিই বাহিনীটির গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। গডফ্রের ন্যায় রেমন্ডও নিজেকে ক্রুসেডার বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি মনে করতেন। ডিউক রেমন্ড ছিলেন বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ সেনাপতি; অধিকন্তু তিনি পোপ ২য় আরবানের আহ্বানে শুরুতেই সাড়া দিয়েছিলেন। যোদ্ধা সংগ্রহের লক্ষ্যে পোপ যেসব সভার আয়োজন করেছিলেন, রেমন্ড তার অধিকাংশতেই যোগ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তার আন্দালুস ভূমিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও ছিল। রেমন্ড সুস্পষ্ট ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি পোপেরও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ কারণেই পোপ অন্য সব বাহিনী বাদ দিয়ে রেমন্ডের বাহিনীর সঙ্গেই রোমের গির্জার প্রতিনিধি হিসেবে লি পাই কার্থিডালের (Le Puy Cathedral) বিশপ অ্যাডমারকে পাঠিয়েছিলেন।[১৯৪] সবচেয়ে বড় কথা—রেমন্ডের বাহিনীই ছিল ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী সর্ববৃহৎ বাহিনী। এসব দিক বিবেচনা করে ৪র্থ রেমন্ড স্বপ্ন দেখছিলেন যে, অন্য কেউ নয়; তিনিই হবেন ক্রুসেডার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।[১৯৫]

৩. মূলত পশ্চিম ফ্রান্সের নরমান্দে (Normandy) থেকে আগত তৃতীয় বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন নরমান্দে অঞ্চলের ডিউক রবার্ট কার্থুজ (Robert Curthose)। তার সঙ্গে তার ভগ্নিপতি ও ব্লয়েস (Blois) নগরীর কাউন্ট স্টিভেন (Stephen II Henry)-ও ছিলেন। এই

---

১৯৩. Cam. Med Histvol . 5, p. 281.

১৯৪. Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 24-25; Runciman, Hist. of the Crusades, 1, p. 142.

১৯৫. Runciman: op. cit. 1, p. 136.

বাহিনীটির সঙ্গে অনেক ইংরেজ যোদ্ধাও যোগ দিয়েছিল।[১৯৬]

৪. চতুর্থ বাহিনীটিও ছিল ফরাসি। তবে এই বাহিনীটি ছিল তুলনামূলক ক্ষুদ্র আকৃতির। সম্ভবত এই বাহিনীটি ফ্রান্সের রাজা ১ম ফিলিপের রাজকীয় প্রতিনিধিত্ব করছিল। কারণ, বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন রাজার সহোদর হিউ (Hugh)। হিউ ছিলেন ভার্মান্ডয়েস (Vermandois) অঞ্চলের কাউন্ট।[১৯৭]

৫. পঞ্চম ও শেষ বাহিনীটিও ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ইতালি থেকে আগত এই বাহিনীটি গঠিত হয়েছিল ভয়ংকর নরম্যান যোদ্ধাদের সমন্বয়ে। বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন আরেক উচ্চাভিলাষী যুবরাজ বোহেমন্ড (Bohemond)।[১৯৮] গডফ্রে ও রেমন্ডের মতো বোহেমন্ডও পুরো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। তার পক্ষে যেসব বিষয় সহায়ক ছিল সেগুলো হলো—তার বাহিনী ছিল সবচেয়ে বিন্যস্ত, সবচেয়ে রণকুশলী এবং লড়াইয়ের ময়দানে সবচেয়ে অটল-অবিচল।[১৯৯] অধিকন্তু তিনি ছিলেন তৎকালীন পুরো ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাজন্য রবার্ট গোয়েসকার্ডের (Robert Guiscard) পুত্র, যিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে বলকান অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২০০] বোহেমন্ডের নিজের ১০৮১ খ্রিষ্টাব্দে এন্টিয়ক অবরোধ করার এবং বাইজান্টাইনদের মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা ছিল। বোহেমন্ডের সঙ্গে তার ভাগ্নে টেনক্রেড (Tancred)-ও ছিলেন। টেনক্রেড ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও কঠোর প্রকৃতির একজন সেনাপতি। বোহেমন্ডের বাহিনীতে টেনক্রেড ছাড়াও আরও কয়েকজন দক্ষ নরম্যান সেনাপতি ছিল।[২০১]

---

১৯৬. Raymond d' Aguilers, in Peters (ed.), The first Crusade, pp. 181-211. William of Tyre 1, pp. 139-140.

১৯৭. Anna Comnena, p. 314: AOL, 1, pp. 121-122, 145: Hagenmeyer "Chronologie", p. 248.

১৯৮. Gesta Francorun, pp. 6-13; Anna Comnena, pp. 326-329.

১৯৯. Runciman: op. cit. 1, p. 157.

২০০. Ostrogorsky: op. cit. 11, p. 381.

২০১. Chalandon: Premiere Croisade, p. 132.

আমাদের সামনে এ বিষয়টি আশা করি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসন্ন অভিযানের জন্য সমবেত হওয়া ক্রুসেড বাহিনীগুলোর একক কোনো নেতৃত্ব ছিল না; বরং শুরু থেকেই বাহিনীগুলোর সেনাপতিগণ সর্বাধিনায়ক হওয়ার জন্য পরস্পর স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং আপন আপন রাজ্য সম্প্রসারণের এক বিশাল স্বপ্ন প্রত্যেককেই প্ররোচিত করছিল।

ফ্রান্স থেকে কনস্টান্টিনোপলের পথে

ফ্রান্স থেকে সবার আগে রওনা হয়ে সবার আগেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পৌঁছায় চতুর্থ ও সবচেয়ে ক্ষুদ্র দলটি। কিন্তু তারা নির্মম পরিণতির শিকার হয়। সমুদ্রপথে রওনা হওয়া বাহিনীটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উপকূলের কাছে এসে প্রচণ্ড ঝড়ের শিকার হয় এবং প্রচুর সৈন্য নিহত হয়। বাইজান্টাইন নৌবাহিনীর একটি দল বাকিদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।[২০২] বাহিনীর প্রধান হিউ বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্রাটের মিত্রতা ও আনুগত্যের শপথ করে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব থেকে মুসলমানদের কেড়ে নেওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। হিউয়ের এই আনুগত্য ও নতজানু নীতি আলোচ্য পরিস্থিতিতে মোটেও আশ্চর্যের কোনো বিষয় ছিল না।[২০৩]

অবশ্য এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, চলমান ঘটনাপ্রবাহে এই ক্ষুদ্র বাহিনীটির উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাবও ছিল না।

এরপর কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায় গডফ্রের নেতৃত্বাধীন প্রথম বাহিনীটি। আলোচনার এ পর্যায়ে এ বাহিনীটি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

---

২০২. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১১৮।

২০৩. Anna Comnena, p. 315; Fulcherde Chartres, p. 72.



মানচিত্র নং-১২

ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর ইউরোপ থেকে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে যাত্রা

গডফ্রের বাহিনীটি স্থলপথেই রওনা হয়। এক্ষেত্রে তারা সে পথই অবলম্বন করে, ইতিপূর্বে ধর্মযাজক পিটার ও কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনীসহ অন্যান্য অপ্রশিক্ষিত বাহিনী যে পথে যাত্রা করেছিল।[২০৪] এর অর্থ হচ্ছে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছতে তাদের হাঙ্গেরিসহ পশ্চিম ইউরোপের সেসব অঞ্চল পাড়ি দিতে হবে, যেসব অঞ্চলে ইতিপূর্বে ক্রুসেডারদের অভিযাত্রাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাদেরকে মুখোমুখি হতে হবে হাঙ্গেরির শক্তিশালী রাজা কোলোম্যানের, যিনি বাধা প্রদান করলে গডফ্রের বাহিনীর অগ্রযাত্রাই কেবল ব্যাহত হবে না; প্রচুর শক্তিক্ষয়, এমনকি শক্তি নিঃশেষও হয়ে যেতে পারে। এসব দিক বিবেচনা করে সুচতুর গডফ্রে সিদ্ধান্ত নেন, হাঙ্গেরিতে প্রবেশের আগে জার্মানি-হাঙ্গেরি সীমান্তে তিনি রাজা কোলোম্যানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে সমঝোতা-চুক্তি করে নেবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গডফ্রে হাঙ্গেরির রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিতে শর্তারোপ করা হয় যে, গডফ্রের বাহিনী হাঙ্গেরি অতিক্রম করার সময় হাঙ্গেরি ভূখণ্ডের কোনো সম্পদ স্পর্শ করবে না, কোনো

---

২০৪. Setton: op. cit., 1, p. 12.

নাগরিকের কোনো প্রকার ক্ষতি করবে না। গডফ্রের অঙ্গীকারে রাজা যেন আস্থা রাখতে পারেন, এজন্য তিনি তার বাহিনী হাঙ্গেরি অতিক্রমের সময়ে তার ভাই বল্ডউইনকে হাঙ্গেরির রাজার কাছে জামিন রাখার সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি গডফ্রে তার বাহিনীর সদস্যদের এ অঞ্চলে কোনো ধরনের লুটতরাজ বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন।

এই চুক্তির ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর প্রথম দলটি নিরাপদে হাঙ্গেরি অতিক্রম করে। বাইজান্টাইন ভূখণ্ডে প্রবেশের সময় বেলগ্রেড ও নিস-এর মধ্যবর্তী এলাকায় পৌঁছে গডফ্রে বাইজান্টাইন সম্রাটের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রতিনিধিদলকেও প্রতিশ্রুতি দেন যে, তার বাহিনী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কোনো সম্পদ স্পর্শ করবে না। বিপরীতে বাইজান্টাইন প্রশাসন মুসলিম ভূখণ্ডে পৌঁছা পর্যন্ত গডফ্রের বিশাল বাহিনীর রসদ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।[২০৫]

এরপর গডফ্রের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনী পথচলা অব্যাহত রেখে বাইজান্টাইন নগরী সেলিমব্রিয়া[২০৬] এর কাছে মর্মর সাগরের তীরে পৌঁছে যায়। এটি ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্য ডিসেম্বরের (৪৮৯ হিজরি সনের) কথা। অভিযাত্রায় এ পর্যায়ে এসে গডফ্রে তার বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তার বাহিনীর সদস্যরা সেলিমব্রিয়ার সম্পদ-প্রাচুর্য দেখে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং নগরীজুড়ে লুটপাট শুরু করে।[২০৭]

এ ঘটনা ছিল বাইজান্টাইন সম্রাটের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী। পশ্চিম ইউরোপ থেকে আগত এই প্রশিক্ষিত বাহিনীর আচরণ সম্রাটকে অত্যন্ত শঙ্কিত করে তোলে। তিনি সূক্ষ্মভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে থাকেন।

সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস কেবল মুসলমানদের হুমকি প্রতিরোধ এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানদের কাছে হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের জন্যই পোপের সাহায্য চেয়েছেন এবং এসব বাহিনীকে এ পর্যন্ত আসার সুযোগ দিয়েছেন। আর তাই তার অনুমান ছিল, এসব বাহিনী ভাড়াটিয়া বাহিনীর ন্যায় কাজ করবে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

---

২০৫. Albert d' Aix, 1v. pp. 299-305.
২০৬. পূর্বের নাম Selymbria, বর্তমান নাম Silivri। [অনুবাদক]
২০৭. Idem, p.p. 304-305.

পূর্বেও বিভিন্ন প্রয়োজনে ভাড়াটিয়া সৈন্য আমদানি করেছে। সম্রাটের ধারণা ছিল, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করবে; এরপর নিজেদের পারিশ্রমিক নিয়ে ফিরে যাবে। ব্যস, এতটুকুতেই তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণহীন ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর আচরণ এবং এখন গডফ্রের বাহিনীর কৃত আচরণ অবলোকন করে বাইজান্টাইন সম্রাট গভীর চিন্তায় পড়ে যান। এসব বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তারা যুদ্ধ শেষে ফিরে যেতে নয়, থেকে যাওয়ার লক্ষ্যে আগমন করেছে। অধিকন্তু তারা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যেও আগমন করেনি। সম্রাট আরও লক্ষ করেন যে, গডফ্রের নেতৃত্বাধীন এই নিয়মিত বাহিনীটি আকৃতিতে যেমন বড়, তেমনই পেশাদার ও শক্তিশালী। তাদের সঙ্গে যখন অন্যান্য বাহিনীও মিলিত হবে, তখন পরিস্থিতি কেমন হবে?!

সম্রাটের অতীত স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ইতিপূর্বে একবার বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ইতালি থেকে কিছু ভাড়াটে সৈনিক সংগ্রহ করেছিল। তাদেরই একজন রাসেল ডি ব্যালিউল (Roussel de Bailleul) নামক জনৈক দুঃসাহসী নরম্যান সেনাপতি ১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দে (৪৬৫ হিজরি সনে) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধনে সক্ষম হয়। রাসেল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শেষ পর্যন্ত তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মুসলিম সেলজুকদের শরণাপন্ন হয় এবং এ মর্মে চুক্তি করে যে, সেলজুকরা যদি রাসেলকে পরাভূত করে বাইজান্টাইন প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে পারে, তাহলে বাইজান্টাইনরা রাসেলের দখলে থাকা অঞ্চলগুলো সেলজুকদের দিয়ে নেবে। সেলজুকরা রাসেলকে পাকড়াও করে বাইজান্টাইনদের হাতে তুলে দেয় এবং চুক্তিমতো রাসেলের দখলকৃত অঞ্চলগুলোর কর্তৃত্ব বুঝে নেয়। সম্রাট ভাবতে থাকেন, এক রাসেল যদি মাত্র তিন হাজার ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে এভাবে নাকানিচুবানি খাওয়াতে পারে, তাহলে গডফ্রের এই বিশাল বাহিনীর কারণে আগামীর পরিস্থিতি কেমন হবে! আর ক্রুসেডার বাহিনীর সবগুলো অংশ যদি একত্র হয়, তখন পরিস্থিতি কেমন ভয়ানক হবে তা ভাবতেই সম্রাটের দেহ-মন শিউরে ওঠে।

সবদিকে ভেবে-চিন্তে অবশেষে ঝানু সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস উপলব্ধি করেন যে, গডফ্রের বাহিনীর বিষয়ে এখনই কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আর তাই অন্যান্য ক্রুসেডার বাহিনী উপস্থিত হয়ে সমস্যা আরও জটিল করে তোলার পূর্বেই তিনি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পূর্ণ তৎপর হয়ে ওঠেন।[২০৮]

কী ছিল বাইজান্টাইন সম্রাটের সেই তৎপরতা?!

বাইজান্টাইন সম্রাট ও গডফ্রের মধ্যে চুক্তি

বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস সেনাপতি গডফ্রের কাছে দাবি জানান যে, তাকে বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্যের শপথ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রকারান্তরে তার এ অঙ্গীকারও করতে হবে যে, মুসলমানদের অধিকারে থাকা ভূখণ্ডে পৌঁছার পরও তিনি বাইজান্টাইন সম্রাটের অধীনস্থ থাকবেন এবং তিনি যদি সেসব ভূখণ্ড উদ্ধার করতে সক্ষম হন, তাহলে তা তার নিজের নয়; বরং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভূসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।[২০৯] এই শপথের ফলে সেসব অঞ্চলের আইনগত অবস্থান শুরুতেই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং বাইজান্টাইন সম্রাট সেসব অঞ্চলের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন দাবি ও সুকঠিন শর্ত!

গডফ্রে তো পূর্ব থেকেই অন্য এক সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে আছেন, যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদেশ-নির্দেশ বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। তা ছাড়া গডফ্রে এখানে এসেছেন ক্যাথলিক গির্জার আহ্বানের ভিত্তিতে। তিনি কী করে অর্থোডক্স গির্জার পরিচালক বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রতি মিত্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করবেন! সবচেয়ে বড় কথা—তিনি তো নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ভূ-মালিকানা বিস্তৃতির লক্ষ্যে বের হয়েছেন। অতীত কোনো অধিকার, ঐতিহাসিক কোনো বাস্তবতা তার মানসপটে বিবেচ্য নয়। তিনি এসেছেন দস্যুর ন্যায় সবকিছু কেড়ে নিতে; অন্যের ভূখণ্ড দখল করার জন্য তার তো কোনো যৌক্তিকতা বা কার্যকারণের প্রয়োজন নেই![২১০]

---

২০৮. Chalandon: Premiere Croisade, p.p. 119-121.

২০৯. Runciman :oip. Cit., p. 149.

২১০. Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 281.

সর্বদিক বিবেচনা করে গডফ্রে বাইজান্টাইন সম্রাটের দাবিতে সাড়া দিতে গড়িমসি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আশা করছিলেন যে, এর মধ্যেই অন্যান্য ক্রুসেডার বাহিনীও চলে আসবে এবং তখন সকলে মিলে এমন কোনো সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যাবে, যাতে সকলের স্বার্থ রক্ষা হয় এবং সম্রাট তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো জটিলতায় ফেলতে না পারেন।

কিন্তু বাইজান্টাইন সম্রাট গডফ্রের গড়িমসির কারণ অনুমান করে ফেলেন। তিনি অপেক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং গডফ্রের বাহিনীকে প্রদত্ত খাদ্যসরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শুরু হতে না হতেই গডফ্রের বাহিনী তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা এবার কনস্টান্টিনোপলের আশেপাশের জনপদগুলোতে লুটতরাজ শুরু করে। ফলে বাইজান্টাইন সম্রাট প্রভাবিত হন এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মনস্থ করে পুনরায় ক্রুসেডার বাহিনীকে রসদপ্রদান শুরু করেন; বরং এবার তিনি কনস্টান্টিনোপলের উপকণ্ঠে পেইরা[২১১] এলাকায় ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থান ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।[২১২] পাশাপাশি তিনি কোমলভাবে গডফ্রেকে তার আনুগত্য ও মিত্রতার শপথ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। গডফ্রেও নতুন করে টালবাহানা শুরু করেন। এভাবে টালবাহানার মধ্যেই ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মার্চ পূর্ণ তিন মাস কেটে যায়। একপর্যায়ে তিনি বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন।

এপ্রিলের শুরুতে বাইজান্টাইন সম্রাট জানতে পারেন যে, ইতালিয়ান নরম্যান বাহিনী (পঞ্চম ক্রুসেডার বাহিনী) কনস্টান্টিনোপলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সম্রাট এই বাহিনীটির শক্তিমত্তা সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন। গডফ্রে-সমস্যা সমাধানের পূর্বে অন্য কোনো বাহিনী কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে যাক, সম্রাট তা মোটেও চাচ্ছিলেন না। এ কারণেই তিনি নতুন করে আবারও রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে গডফ্রেকে উত্তেজিত করার সিদ্ধান্ত নেন। গডফ্রেও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পেইরা অঞ্চলে হামলা চালিয়ে প্রথমে লুটতরাজ ও পরে অগ্নিসংযোগ

---

[২১১]. বর্তমান নাম Beyoğlu। [অনুবাদক]

[২১২]. Brehier, op. cit., p 113; Chalandon: Alexis Comnene, p.p. 178-179.

করেন। এমনকি তিনি কনস্টান্টিনোপলের নগরপ্রাচীরেও হামলা চালান।[২১৩] নিরুপায় হয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট পূর্ণ শক্তির বাইজান্টাইন বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বাইজান্টাইন বাহিনীর সামনে গডফ্রে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে ব্যর্থ হন এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রকৃত শক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এবার তিনি সহজেই নিজের নীতি ও মিত্রতা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও অধীনতার শপথ গ্রহণ করেন।[২১৪]

১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গডফ্রে বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্য ও বশ্যতার শপথ করেন। চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, মানজিকার্টের যুদ্ধের পূর্বে যেসব ভূখণ্ড বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল, গডফ্রে ও তার বাহিনীর হাতে সেসব ভূখণ্ড বিজিত হলে তা পুনরায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর অর্থ হচ্ছে বাইজান্টাইন সম্রাটের লালসা কেবল এশিয়া মাইনরেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এন্টিয়ক ও এডেসাসহ শামের উচ্চ অঞ্চল এবং ইরাকের বিভিন্ন নগরীও তার চাহিদার অন্তর্ভুক্ত! বরং বাইজান্টাইন বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে বাইতুল মুকাদ্দাসও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুক্তি এই ছিল যে, সম্রাট ১ম জাস্টিনিয়ান (Justinian I)-এর আমলে (রাজত্বকাল : ৫২৭-৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) বাইতুল মুকাদ্দাস বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল। চুক্তির এই ধারাটি পরবর্তী শতাব্দীকাল ধরে বাইজান্টাইন ও ক্রুসেডারদের মাঝে এক দীর্ঘ সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২১৫]

চুক্তি সম্পাদনের পর বাইজান্টাইন সম্রাট গডফ্রের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে থাকেন এবং তাকে বহুমূল্যের উপঢৌকন প্রদান করেন।[২১৬] তবে কনস্টান্টিনোপলেই যেন গডফ্রের সঙ্গে বোহেমন্ডের বাহিনীর সাক্ষাৎ না হয়ে যায়, এ উদ্দেশ্যে তিনি দ্রুত গডফ্রের বাহিনীকে এশিয়া মাইনর অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন। এখন তিনি নিশ্চিন্তে সঙ্গীহীন

---

২১৩. Albert d' Aix p.p. 307-308.

২১৪. Runciman: op. cit., p. 151.

২১৫. Guillaman: de tyr, 1, p.p. 87-88; Grousset: op. cit. 1, p. 19.

২১৬. Michaud: Hist. des Croisades, 1, p. 179.

বোহেমন্ডের সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারবেন![২১৭]

গডফ্রে তার বাহিনী নিয়ে বসফরাস প্রণালি পাড়ি দিয়ে এশিয়া মাইনরে পা রাখতেই বোহেমন্ড তার বাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপলে এসে পৌঁছেন! বোহেমন্ডের বাহিনী ইতালি থেকে সমুদ্রপথে আলবেনিয়ার সামুদ্রিক নগরী এভ্লোনাতে (Avlona) অবতরণ করে; এরপর সেখান থেকে বলকান অঞ্চল হয়ে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায়।[২১৮] বোহেমন্ডের বাহিনীর আগমনে বাইজান্টাইন সম্রাট সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ভীত হওয়ার কারণ শুধু বাহিনীটির শক্তিমত্তাই ছিল না; বরং সম্রাটের রাসেল ডি ব্যালিউলের স্মৃতি মনে পড়ে যায়।[২১৯] সম্রাটের আরও মনে পড়ে স্বয়ং বোহেমন্ড কর্তৃক ১০৮১ খ্রিষ্টাব্দে (৪৭৩ হিজরি সনে) কনস্টান্টিনোপল অবরোধের স্মৃতি। এখন তো বোহেমন্ড আগের চেয়ে কয়েকগুণ বড় বাহিনী নিয়ে আগমন করেছেন। আর অন্যান্য ক্রুসেডার বাহিনী তো আছেই![২২০]

বোহেমন্ডের বিনম্র আচরণ!

এসব বিষয় চিন্তা করে বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায় বোহেমন্ডের অভিনব কৌশলে। আরও বড় দাঁও মারার নিশ্চয়তায় বোহেমন্ড কল্পনাতীত ভিন্ন এক পন্থা অবলম্বন করেন!

বোহেমন্ড বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তার এও জানা ছিল যে, বাইজান্টাইনদের সহায়তা ব্যতীত ক্রুসেডার বাহিনী কস্মিনকালেও ইসলামি ভূখণ্ড দখল করতে পারবে না।[২২১] সবচেয়ে বড় কথা—অতি সম্প্রতি সম্রাট ও গডফ্রের মধ্যে যে মতবিরোধের ঘটনা ঘটেছে এবং গডফ্রে যে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিসর্জন দিয়ে বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্যের শপথ করতে বাধ্য হয়েছেন, বোহেমন্ড তাও জেনেছিলেন।

পরিস্থিতির আগা-গোড়া বিশ্লেষণ করে বোহেমন্ড উপলব্ধি করেন যে,

২১৭. Chalandon: Alexis Comnene, p. 138.

২১৮. Setton: op., p. 155; Runciman: op. cit. 1, 155.

২১৯. Schomberger: Racit de Byzanceet des Croisades, Vol II, p. 82.

২২০. Cam. Med. Hist. vol. 5 p. 282.

২২১. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 21.

প্রতাপশালী বাইজান্টাইন সম্রাট যদি তাকে সহায়তা করেন, তাহলে তার সামনে পুরো ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্বলাভের সুযোগ চলে আসবে। সবকিছু বিবেচনা করে বোহেমন্ড তার বাহিনীকে বাইজান্টাইন ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পর শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেন।[২২২] এরপর তিনি সরাসরি কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হন। নগরপ্রাচীরের কাছে পৌঁছে বোহেমন্ড তার ভাগ্নে টেনক্রেডের কাছে বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে নিজে রওনা হন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও মিত্রতার শপথ করতে।[২২৩]

সুচতুর বোহেমন্ড প্রথমেই সরাসরি আনুগত্যের কথা ঘোষণা না করে সুস্পষ্ট দাবি জানান যে, তাকে এন্টিয়ক অঞ্চলে বড় ধরনের জায়গির প্রদান করতে হবে। বাইজান্টাইন সম্রাট এতে সম্মতি প্রকাশ করেন। ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালে এন্টিয়কে যে নরম্যান রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছিল, এ চুক্তি যেন ছিল সেই রাজ্যের প্রথম জন্মদিনের ঘোষণা![২২৪] বোহেমন্ড তাকে ক্রুসেডার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণারও দাবি জানান। তবে বাইজান্টাইন সম্রাট তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।[২২৫] বাইজান্টাইন সম্রাট চাচ্ছিলেন কোনো সেনাপতিকে অসন্তুষ্ট না করে সবার নিয়ন্ত্রণ-চাবি নিজের হাতে রাখতে।

চুক্তি সম্পাদনের পরই বাইজান্টাইন সম্রাট নরম্যান বাহিনীটিকে গডফ্রের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এটি ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিলের ঘটনা।[২২৬]

অবশিষ্ট দুই বাহিনীর কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিতি

এরপর কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায় তুলুজ ও প্রভিন্সের ডিউক ৪র্থ রেমন্ডের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ ফ্রান্স ও প্রভিন্সের বাহিনী। এ বাহিনীটি স্থলপথে অগ্রসর হয়ে ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষ দিকে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায়। পথে রেমন্ডের বাহিনীও এমন কিছু সীমালঙ্ঘন করে, যার কারণে বাধ্য

২২২. Chalandon: Premiere Croisade, p.p. 133-136.
২২৩. Chalandon: Premiere Croisade, p. 132.
২২৪. Iorga: Brave Hist. des Croisades, p. 51.
২২৫. Brehier: op. cit., p. 311.
২২৬. Cam. Med. Hist. vol. 5 p. 281.

হয়ে বাইজান্টাইন বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে।(২২৭) বাহিনীটি কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছতেই সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস সেনাপতি রেমন্ডকে পূর্বে আগত দুই সেনাপতির অনুসরণ করে তার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের শপথ করতে বলেন। কিন্তু এ দাবি ছিল রেমন্ডের স্বপ্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কারণ, রেমন্ড তো ক্যাথলিক পোপের রাজকীয় প্রতিনিধি হিসেবে পুরো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হতে চান। পোপের প্রেরিত প্রতিনিধি অ্যাডমারও তার বাহিনীর সঙ্গে আছেন। তিনি কীভাবে এখন অর্থোডক্স গির্জার তত্ত্বাবধায়কের বশ্যতা ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন? সমস্যা আরও আছে। রেমন্ড জানেন যে, তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী নরম্যান সেনাপতি বোহেমন্ড ইতিমধ্যে বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রিয় মিত্রতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এখন যদি তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ করেন, সম্রাট হয়তো তাকে বোহেমন্ডের অধীনে কাজ করতে বলবেন। এটা তো রেমন্ড কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।

এসব দিক বিবেচনা করে রেমন্ড সম্রাটের আনুগত্যের শপথ করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানান(২২৮) এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে, তিনি বাইজান্টাইন সম্রাটের স্বার্থরক্ষায় নয়; বরং 'যিশুখ্রিষ্টে'র মর্যাদা রক্ষায় যুদ্ধ করতে এখানে এসেছেন। এরপরও সম্রাট বারবার পীড়াপীড়ি ও চাপ প্রয়োগ করায় সশস্ত্র সংঘাত পরিস্থিতি অনিবার্য হয়ে ওঠে।(২২৯)

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবার মঞ্চে পুনঃআবির্ভাব ঘটে বোহেমন্ডের। ঘোলা পানিতে শিকার করার লোভে তিনি এবার ঘোষণা করেন, রেমন্ড যদি সম্রাটের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান, তাহলে তিনি তার শক্তিশালী নরম্যান বাহিনী নিয়ে বাইজান্টাইন বাহিনীর পক্ষে যোগ দেবেন। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। গডফ্রেও এই পরিস্থিতিতে বসে থাকবেন কেন! তিনি রেমন্ডকে এই বলে সম্রাটের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি করান যে, মুসলিম শত্রুবাহিনীর অবস্থান অতি নিকটে আর তারা অতিসত্বর ক্রুসেডারদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। সবার চাপে নতি স্বীকার করে অবশেষে রেমন্ড এমন একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনে সম্মত হন, যাতে তার মানসম্মানও রক্ষা পায়, সম্রাটও আপাতত তুষ্ট

---

২২৭. Grousset: Hist. des Croisades 1, p.p. 24-25.

২২৮. Runciman: op. cit. 1, p. 136.

২২৯. Raymond d' Aigles: Hist. Occid. 111, p. 238.

হন। তিনি আনুগত্যের শপথের পরিবর্তে বাইজান্টাইন সম্রাটের জীবন ও মর্যাদার সম্মান রক্ষার এবং সম্রাটকে ক্রুদ্ধ করবে এমন কোনো কাজ না করার শপথ করেন।(২৩০) সবদিক বিবেচনা করে সম্রাটও এতেই রাজি হন; বরং রেমন্ডের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে তাকে কৌশলে বুঝিয়ে দেন যে, তিনি বোহেমন্ডকে সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়ে আশ্বস্ত নন। সম্রাটের এই স্পষ্টকথনে যথেষ্ট কাজ হয়; রেমন্ডের মন প্রশান্ত হয় এবং তিনি বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে দৃঢ় মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।(২৩১)

সর্বশেষ বাহিনীটি অর্থাৎ নরমান্দে (Normandy) অঞ্চলের ডিউক রবার্ট কার্থুজ-এর নেতৃত্বাধীন পশ্চিম ফ্রান্সের বাহিনীটি অন্যান্য বাহিনীর চেয়ে বিলম্ব করে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রবার্টের সঙ্গে তার ভগ্নিপতি ও ব্লয়েস নগরীর কাউন্ট স্টিভেনও ছিলেন।(২৩২) এ বাহিনীটি প্রথমে ইতালি পৌঁছায়, তারপর সমুদ্রপথে বলকান অঞ্চল অভিমুখে রওনা হয়; এরপর সেখান থেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ভূখণ্ড পাড়ি দিয়ে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায়। পথে এই বাহিনীটি কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেনি।(২৩৩) বাহিনীর সেনাপতিদ্বয়ও বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকারের শপথ করতে কোনো প্রকার টালবাহানা করেননি। এজন্য তাদের দুজনকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করা হয়। এরপর সম্রাট অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাদেরকে বসফরাস পাড়ি দিয়ে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পৌঁছতে সহায়তা করেন।(২৩৪)

রবার্টের বাহিনীর এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পা রাখার মধ্য দিয়ে প্রথম ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী সবগুলো পেশাদার বাহিনীর মুসলিম ভূখণ্ডে পৌঁছা সমাপ্ত হয়। পথিমধ্যে তাদের বলতে গেলে তেমন কোনো ক্ষতি বা সংখ্যাহ্রাসের শিকার হতে হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম চতুর্থ

---

২৩০. Cam. Med. Hist. vol. 5 p. 283; Anna Comnena, pp. 239-231; Gesta Francorun, p. 13; Raymond d'Agueiler, in petrs (ed.), pp. 140-142; William of Tyre: 1, pp. 139-146.

২৩১. Runciman: op. cit. 1, p. 164.

২৩২. Michaud: Hist. des Croisades, 1. P. 178.

২৩৩. Foucher de chartres (Hist. Occid. 111), p.p. 331-332.

২৩৪. Chalandon: alexis comnene, p.p. 188-189.

বাহিনীটির কিছু সদস্য সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে মারা গিয়েছিল। তবে ওই বাহিনীটি আকারে ছোট হওয়ায় বিষয়টি তেমন প্রভাবক বিবেচিত হয়নি। এককথায় বলা চলে, এশিয়া মাইনরের মুসলিম ভূখণ্ডে সুবিশাল ক্রুসেডার বাহিনী পূর্ণ শক্তি নিয়েই সমবেত হয়েছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—প্রথম ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল? একেবারে সর্বনিম্ন অনুমান অনুসারে এই হিংস্র ও বর্বর অভিযানে অংশগ্রহণকারী ক্রুসেডার যোদ্ধার সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ! তাদের সঙ্গে নারী ও শিশুরা তো ছিলই। সবমিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ! তিন লক্ষ পুরুষ যোদ্ধা সাত লক্ষ নারী ও শিশুকে সঙ্গে নিয়ে ইসলামি ভূখণ্ডে উপস্থিত হয়েছে যুদ্ধ করে ফিরে যাওয়ার জন্য নয়; বসতি স্থাপন করে থেকে যেতে!

ক্রুসেডার বাহিনীর সেনাপতিগণ বাইজান্টাইন সম্রাটকে সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নিজে সুরক্ষিত রাজধানী কনস্টান্টিনোপলেই অবস্থান করেন এবং ক্রুসেডার বাহিনীকে 'যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা' অর্জনের পথে ঠেলে দেন। তবে তিনি জরুরি রসদপত্র, গোয়েন্দা ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক প্রদান করে ক্রুসেডার বাহিনীকে সহায়তা করেন। পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন বাইজান্টাইন সমরবিশারদকেও তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। ক্রুসেডার বাহিনী ও মুসলিম বাহিনীর সংঘর্ষ এখন সুনিশ্চিত; মাঝে দূরত্ব দুই ধনুকের কিংবা আরও কম![২৩৫]

* * *

২৩৫. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 27.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোমান সেলজুকদের সঙ্গে সংঘর্ষ

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে অবস্থিত রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের সুলতান কিলিজ আরসালান সুরক্ষিত নিকিয়া[২৩৬] নগরীকে তার রাজধানী নির্বাচন করেছিলেন। আর তাই তার মূল সামরিক শক্তি মূলত নিকিয়াকেন্দ্রিকই ছিল। এ কারণে ক্রুসেডাররা নিকিয়া থেকেই তাদের অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার—পেছনে যেন শত্রুপক্ষের বড় কোনো শক্তি থেকে না যায় এবং বাইজান্টাইনদের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা (Line of supply) যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

নিকিয়া জয় করার লক্ষ্যে ক্রুসেডার বাহিনী যাত্রা শুরু করে। মুসলিম নগরীটি অবরোধ করার জন্য তাদের সঙ্গে বাইজান্টাইন বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশও ছিল। বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস এই যুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য অবরোধে সহায়ক ভারী ভারী যন্ত্রপাতি ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও প্রদান করেছিলেন। ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (৪৯০ হিজরি সনে) নিকিয়ার উদ্দেশে অগ্রযাত্রা শুরু হয়।[২৩৭]

প্রশ্ন হলো—ক্রুসেডাররা যখন নিকিয়া অভিমুখে ছুটে আসছে, রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের সুলতান ১ম কিলিজ আরসালান তখন কোথায়?!

তার অবস্থান সম্পর্কে জানার পূর্বে তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গ্রহণ করা আমাদের জন্য সমীচীন হবে।

---

২৩৬. আরবিতে نيقية (নিকিয়া), ইংরেজিতে Nicaea (নিকায়া) এশিয়া মাইনর অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলে মর্মর সাগরের নিকটে অবস্থিত সুপ্রাচীন একটি নগরী। আধুনিক তুরস্কের বুরছা প্রদেশে অবস্থিত অঞ্চলটির বর্তমান নাম ইজনিক (İznik)। খ্রিষ্টসমাজের ইতিহাসে নগরীটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানদের প্রথম মহাসভা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। [অনুবাদক]

২৩৭. Cam. Msd. Hist., vol. 5, p. 285.

কিলিজ আরসালান ছিলেন এশিয়া মাইনরের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেলজুক নেতা। তার এই গুরুত্ব কেবল ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার কারণেই ছিল না; বরং তার শাসনামলে সংঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল, যা এ অঞ্চলের মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল। তার পিতা সুলায়মান বিন কুতুলমিশ ছিলেন রোমান সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কিলিজ আরসালান তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিক্রম এবং প্রশাসন ও যুদ্ধক্ষেত্রে সুপরিকল্পনার গুণ লাভ করেছিলেন। এ কারণেই মাত্র সতেরো বছর বয়সে রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সে সময়ই তিনি পুরো এশিয়া মাইনর অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তবে এই অত্যুচ্চ প্রশাসনিক ও সামরিক দক্ষতা সত্ত্বেও আমরা তার জীবনে সুস্পষ্ট কোনো ইসলামি চেতনা কিংবা মুসলমানদের একতাবদ্ধ করার স্পৃহা ও আগ্রহ লক্ষ করিনি। তার মূল লক্ষ্য ও স্বপ্ন ছিল আপন রাজ্য-পরিধি এবং অনুসারী-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এ কারণেই আমরা তার জীবনেতিহাসে দেখতে পাই যে, তিনি তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ ও লড়াইয়ে জড়াতে সামান্যতম দ্বিধা করেননি; হোক সেই প্রতিপক্ষ মুসলমান; হোক তার মতোই বৃহত্তর তুর্কি বংশোদ্ভূত, এমনকি খোদ সেলজুক পরিবারভুক্ত! এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদী লালসার কারণে অনেক সময় তিনি তার প্রকৃত বিপদও অনুমান করতে পারতেন না। এ কারণেই কখনো তিনি মারাত্মক বিপদকেও অবহেলা করতেন, আবার অনেক সময় সাধারণ সমস্যাকেও কঠিন গুরুত্ব দিতেন, যা তার মতো দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল। এর একমাত্র কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি কখনোই মুসলমানদের কল্যাণচিন্তা করতেন না; সর্বদাই প্রথমে চিন্তা করতেন নিজের স্বার্থের কথা।

নিকিয়ার পতন

মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। সুবিশাল ক্রুসেডার বাহিনী যখন রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের রাজধানী নিকিয়া দখলের জন্য ধেয়ে আসছিল, তখন কোথায় ছিলেন ১ম কিলিজ আরসালান?!

তিনি তখন রাজধানীর বাইরে ছিলেন। কেবল বাইরে নয়; বরং রাজধানী হতে নয়শ কিলোমিটারের অধিক দূরে ছিলেন। তিনি তখন নিকিয়া হতে পূর্ব দিকে অবস্থিত আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মালাতিয়া নগরী

অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন। নগরীটির কর্তৃত্ব নিয়ে তার সঙ্গে এ অঞ্চলের আরেক মুসলিম নেতা গাজি বিন দানিশমান্দের বিরাট দ্বন্দ্ব চলছিল। গাজি বিন দানিশমান্দ ছিলেন এশিয়া মাইনর অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব অংশ শাসনকারী একজন তুর্কি মুসলিম নেতা। নতুন নতুন অঞ্চলে রাষ্ট্র বিস্তৃতির এই সর্বনাশা নেশার কারণে অত্যন্ত ভয়ানক শত্রু ক্রুসেডারদের বিষয়ে কিলিজ আরসালান বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। বরং তিনি যখন জানতে পারেন যে, ক্রুসেডার বাহিনীগুলো বিলম্ব করে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হয়েছে, তখন তিনি ধারণা করেন যে, এ বাহিনীগুলোও পূর্বে আগত বাহিনীগুলোর ন্যায় সাধারণ ও অপেশাদার বাহিনীই হবে। এ কারণেই তিনি আশা করেছিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি যেভাবে অতি সহজে ওয়ালটার ও পিটারের বাহিনীকে পরাভূত করেছিলেন, এবারও তার বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশ দিয়েই তাদেরকেও সহজে পরাভূত করতে পারবেন।[২৩৮] এ ছাড়া তিনি ধূর্ত বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের একটি কৌশল দ্বারাও প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। সম্রাটের প্রেরিত কয়েকজন গুপ্তচর কিলিজ আরসালানকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, ক্রুসেডার বাহিনীসমূহের সেনাপতিদের সঙ্গে সম্রাটের বিরোধ এমন জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যার আশু সমাধান সম্ভব নয়। আর তাই সম্রাট কিছুতেই এসব ক্রুসেডারদের বসফরাস পাড়ি দিয়ে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পা রাখার অনুমতি দেবেন না। বাইজান্টাইন সম্রাটের কৌশলে প্রভাবিত হয়ে কিলিজ আরসালান তার বাহিনীর তুলনামূলক ক্ষুদ্র একটি অংশকে রাজধানী নিকিয়ায় রেখে নিজে মূল বাহিনী নিয়ে দূরের মালাতিয়া নগরী অবরোধ করতে রওনা হয়েছিলেন। সুলতান কিলিজ আরসালানের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাটি এ কারণেও মজবুত মনে হয় যে, তিনি তার স্ত্রী, দুই সন্তান এবং সমস্ত ধনসম্পদ নিকিয়াতেই রেখে গিয়েছিলেন। তিনি যদি ক্রুসেডারদের তরফ থেকে কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ভুলেও এমনটি করতেন না।[২৩৯]

কিলিজ আরসালান যখন রাজ্য বিস্তারের নেশায় সুদূর মালাতিয়া নগরীতে অবরোধে ব্যস্ত, এদিকে তখন তার রাজধানীই অবরুদ্ধ! ৪৯০ হিজরি সনের ২১ জুমাদাল উলা মোতাবেক ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে তারিখে

---

২৩৮. Setton: op. cit 1, p.p. 288-289.

২৩৯. Runciman, op. cit. 1. p.p. 176-177.

বিশাল ক্রুসেডার বাহিনী নিকিয়া অবরোধ করে। নিকিয়া নগরীর পশ্চিম দিকে বারো মাইল দীর্ঘ একটি হ্রদ ছিল। অথচ ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে কোনো নৌশক্তি ছিল না।[২৪০] তাই বাধ্য হয়ে তারা বাকি তিন দিক থেকে নগরী অবরোধ করে। অবরোধের সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ক্রুসেডাররা বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রদত্ত কামানের মাধ্যমে নগরপ্রাচীর ও নিরাপত্তা চৌকি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু করে। প্রথমদিকে নগরবাসী কঠিন অবরোধের মুখেও দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দেয়। তারা বিষাক্ত তির নিক্ষেপ করে ক্রুসেডারদের পাল্টা জবাব দিতে থাকে। ক্রুসেডাররা এর ফলে সমূহ ক্ষতির শিকার হলেও সামান্য ঢিল না দিয়ে অবরোধ অব্যাহত রাখে।[২৪১] এরই মধ্যে কিলিজ আরসালানের কাছে রাজধানী আক্রান্ত হওয়ার এবং দ্রুত সাহায্য প্রেরণের বার্তা এসে পৌঁছায়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে কিলিজ আরসালান তৎক্ষণাৎ মালাতিয়ার অবরোধ প্রত্যাহার করে রাজধানী অভিমুখে রওনা হন।



মানচিত্র নং-১৩

নিকিয়া অভিমুখে কিলিজ আরসালানের যাত্রাপথ

কিন্তু পথের দূরত্ব ও দুর্গমতা তার দ্রুত প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা

---

২৪০. উইলিয়াম সুরি (William of Tyre), *তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ ফী-মা ওয়ারাআল বিহার*, ১/২৩১-২৩২ ও রানচিমান (Runciman), *তারীখুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, ১/২৬৪-২৬৫।

২৪১. Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 29.

হয়ে দাঁড়ায়।[২৪২]

এরই মাঝে সুচতুর বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস তৎকালীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট জেনারেল ও সামরিক সচিব ম্যানুয়েল বুটুমিটস (Manuel Boutoumites/ Butumites)-কে তার প্রতিনিধি হিসেবে গোপনে নিকিয়াবাসীর কাছে প্রেরণ করেন। ম্যানুয়েল বুটুমিটস ক্রুসেডারদের হাতে নিকিয়ার পতন হওয়ার পূর্বেই বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে নগরীটির কর্তৃত্ব সমর্পণ করে দেওয়ার জন্য নগরবাসীকে বোঝাতে থাকেন। তিনি তাদেরকে বোঝান যে, ক্রুসেডাররা অত্যন্ত হিংস্র ও বর্বর প্রকৃতির। তাদের হাতে যদি নগরীর পতন ঘটে, তাহলে তারা নগরীর সকল নাগরিককে হত্যা করবে। অবশ্য এই ভীতিপ্রদর্শন বাস্তবেও সঠিক ছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি, ক্রুসেডারদের হাতে বাইতুল মুকাদ্দাসসহ অন্যান্য যেসব নগরীর পতন ঘটেছিল, সব জায়গায় তারা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।[২৪৩]

পাঠকমনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বাইজান্টাইন সম্রাট ক্রুসেডারদের না জানিয়ে গোপনে কেন মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করতে চেষ্টা করছিলেন? এর উত্তর হলো—তিনি ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করছিলেন। তার ধারণা ছিল, ক্রুসেড-নেতৃবৃন্দ কনস্টান্টিনোপল চুক্তির দাবি মোটেও রক্ষা করবে না এবং পূর্বে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দখলে থাকা ভূখণ্ডগুলো জয় করার পর সম্রাটের হাতে সমর্পণ করবে না।

বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্তাব নিকিয়ায় অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দ গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করছিল। বিশেষ করে এ বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যে, তিনি মুসলমানদের প্রাণরক্ষার, লুটতরাজ না করার এবং ক্রুসেডারদের হাত থেকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এরপর বাইজান্টাইন সম্রাট আরেকটি প্রতারণাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে দু-দিক থেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের স্বার্থ বাস্তবায়ন করেন। তিনি অবরুদ্ধ নিকিয়া নগরীর জন্য সাগরপথে বিভিন্ন ইসলামি

---

২৪২. Gesta Francorum, p. 37.

২৪৩. উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ ফী-মা ওয়ারাআল বিহার*, ১/২৪২-২৪৩।

রাষ্ট্র হতে আগত ত্রাণসাহায্য স্বেচ্ছায় নিকিয়ায় পৌঁছার সুযোগ করে দেন। অথচ তিনি চাইলেই শক্তিশালী বাইজান্টাইন নৌবহরকে ব্যবহার করে এতে বাধা দিতে পারতেন। এর মাধ্যমে একদিকে তিনি ক্রুসেডারদের বুঝিয়ে দেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাইজান্টাইন সম্রাটের সহায়তা ছাড়া অগ্রসর হতে পারবে না; অপরদিকে তার এই পদক্ষেপে মুসলিম শিবিরও নিশ্চিন্ত হয় যে, মুসলমানরা যদি তার হাতে নগরীর নিয়ন্ত্রণভার তুলে দেয়, তাহলে তিনি তাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন করণীয় নির্ধারণে চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত, তার মধ্যেই কিলিজ আরসালান তার বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যান। সেদিন ছিল ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মে (৪৯০ হিজরি)। নিকিয়ায় পৌঁছেই তিনি শহরে প্রবেশের জন্য পথ করে নিতে ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়—তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিলিজ আরসালান অনুভব করেন যে, তিনি এই অবরোধ কিছুতেই ভেদ করতে পারবেন না। এক দিনের যুদ্ধেই কিলিজ আরসালান নিরাশ হয়ে পড়েন এবং রাজধানী নিকিয়াকে পরিণতি বরণের জন্য ফেলে রেখে দূরে সরে পড়েন।[২৪৪] মুসলিম নগরী নিকিয়া তখন একদিকে ক্রুসেডার শক্তি, আরেকদিকে বাইজান্টাইন রাষ্ট্র—জাঁতার দুই অংশের ফাঁকে আটকে পরিণতির প্রহর গুনছে!

খেলা শেষ করতে বাইজান্টাইন সম্রাট এবার তার শেষ চাল চালেন। তিনি তার শক্তিশালী নৌবহর প্রেরণ করে সাগরপথে নিকিয়ায় সহায়তা আগমনের পথ বন্ধ করে দেন। ফলে নিকিয়াবাসী কঠিন দুর্দশার শিকার হয়ে আসন্ন ধ্বংসের প্রহর গুনতে থাকে। তাদের প্রতিরোধশক্তিও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ক্রুসেডাররা আবারও মর্মে মর্মে বাইজান্টাইন সম্রাটের ক্ষমতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

ধূর্ত ও চতুর বাইজান্টাইন সম্রাটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুসলমানরাও। আর তাই মুসলমানরা ক্রুসেডারদের হাতে নগরীর পতনের পূর্বেই সম্রাটের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়। অবরোধ শুরুর পাঁচ সপ্তাহ পর ক্রুসেডাররা হঠাৎ করেই একদিন দেখতে পায়—নগরপ্রাচীরের ওপর বাইজান্টাইন পতাকা

---

২৪৪. Albert d' Aix, p.p. 320-321.

উড়ছে! সম্রাটের প্রতিনিধি এসে সকলকে জানায় যে, নগরীটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। লুটতরাজ চালাতে পারে এই আশঙ্কায় ক্রুসেডার বাহিনীকে নগরীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয় এবং ম্যানুয়েল বুটুমিটসকে নিকিয়ার সামরিক প্রশাসক নির্বাচিত করা হয়।[২৪৫] সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার সিদ্ধান্ত নেন এবং মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদান করেন। বরং তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি কিলিজ আরসালানের স্ত্রী, বোন ও দুই পুত্রকে কোনো বিনিময় ছাড়াই তার কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন।[২৪৬]

স্বাভাবিকভাবেই ক্রুসেডাররা এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়। তারা উপলব্ধি করে যে, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। নগরবাসীর প্রতি সম্রাটের উদার আচরণে তারা আরও বেশি বিক্ষুব্ধ হয়। ক্রুসেডাররা নিকিয়ায় গণহত্যা চালিয়ে অন্যান্য ইসলামি নগরীর অধিবাসীদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা স্পষ্টতই অনুভব করে যে, তারা লেনদেন করছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পোড় খাওয়া এক শক্তিশালী নেতার সঙ্গে, যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক সুপ্রাচীন সাম্রাজ্যের, যার শেকড় ইতিহাসের সুগভীর স্তরে প্রোথিত। ফলে ক্রুসেডারদের চাওয়া আপাতত অপূর্ণই থেকে যায়।[২৪৭]

বাইজান্টাইন সম্রাটও বাস্তবেই তার অঙ্গীকার রক্ষা করেন। তবে আমার বিশ্বাস—কতিপয় ঐতিহাসিকের এই বিশ্লেষণ মোটেও সঠিক নয় যে, তিনি উদার ও উন্নত চরিত্রের দাবিতে এমনটি করেছেন। বরং আমার মনে হয়, তিনি এ ঘটনাকে এশিয়া মাইনরের অন্যান্য ইসলামি নগরীর অধিবাসীদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এমন ব্যাখ্যাই তার অতীত চরিত্র ও সামগ্রিক জীবনেতিহাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ক্রুসেডাররা যেমন ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জয় করতে চাচ্ছিল, বাইজান্টাইন সম্রাট তেমনই প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে আগামীর সংগ্রামে জয়ী হতে চাচ্ছিলেন। ক্রুসেডাররা যদি ধর্মপরিচয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আর্মেনীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় করতে পারে, তিনি কেন মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় করবেন না!

---

২৪৫. Brehier: op. cit., p. 312.

২৪৬. Runciman, op. cit., p. 180-182; Alexiad: pp 273-275.

২৪৭. Chalandon: Premiere Croisades, p. 167.

এ তো স্বার্থের যুদ্ধ! জয়ী হওয়ার লড়াই! সাম্রাজ্যবাদের নেশা!

এর আরেকটি প্রমাণ হলো, কিছুদিন পরেই কোনিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস কিলিজ আরসালানের স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে মিসিয়া (Mysia), ইওনিয়া (Ionia) ও লিদিয়া (Lydia) অভিমুখে চলে যান[২৪৮] এবং বন্দিদের ও এসব অঞ্চলের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময়ে অঞ্চলগুলোর কর্তৃত্ব লাভের জন্য দরকষাকষি শুরু করেন। তার এই পরিকল্পনা সফল হয় এবং প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই তার হাতে নগরীগুলোর কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হয়। বরং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলো নগরী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। এটি একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা যে, সমকালীন মুসলিম উম্মাহ তখন প্রচণ্ড দুর্বলতার কাল অতিক্রম করছিল এবং দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আর এ সুযোগে ক্রুসেডার বাহিনী ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মাঝে এক উত্তেজনাকর প্রতিযোগিতা চলছিল বিশাল এক পরিত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টন নিয়ে। আর তা হলো মুসলমানদের পরিত্যাজ্য সম্পদ!

নিকিয়া পতনের প্রভাবসমূহ

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যদিও নিকিয়ার পতন মানে একটি নগরীর পতনমাত্র; কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। যেমন :

১. নিকিয়া পতনের ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর মানসিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মযাজক পিটার ও কাঙাল ওয়ালটারের নেতৃত্বাধীন অপেশাদার বাহিনীর নির্মম পতনের দুঃখ অনেকটাই দূরীভূত হয়ে যায়। এ কারণেই নিকিয়া অবরোধ চলাকালে এবং কিলিজ আরসালানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় ক্রুসেডারদের প্রচুর প্রাণহানি ঘটলেও সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্য সকলেই ছিল ইসলামি ভূখণ্ডে অভিযান চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সংকল্পবদ্ধ।[২৪৯]

২. অপ্রশিক্ষিত সাধারণ জনতার বাহিনী আক্রান্ত হওয়ার পর

---

২৪৮. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 31.

২৪৯. Cam. Med. Hist. vol 5, p. 285.

ইউরোপজুড়ে যে নিরাশা ও হতাশা ছেয়ে গিয়েছিল, এবার তার পরিবর্তে ইউরোপের জনগণের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল অনেক বেড়ে যায়। নবোদ্যমে নতুন নতুন আরও বাহিনী তৈরি হতে থাকে। ইউরোপ থেকে এশিয়া মাইনর ও শাম অঞ্চল অভিমুখে স্রোতের মতো ক্রুসেডার সৈন্যদের আগমন ঘটতে থাকে। ইতালিয়ান নৌবন্দরগুলো সক্রিয়ভাবে ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে শুরু করে।[২৫০]

৩. বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মনোবলও বৃদ্ধি পায়। কারণ, ৪৬৩ হিজরি সনে সুবিখ্যাত মানজিকার্টের যুদ্ধে পরাজয়ের সাতাশ বছরেরও অধিক সময় পর নিকিয়া পতনের ঘটনা ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রথম পদক্ষেপ। নিকিয়া বিজয় ধূর্ত বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের কর্তৃত্ব বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।[২৫১]

৪. বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়ায় তারা এবার সেলজুকদের বিশৃঙ্খলাকে কাজে লাগাতে প্রবল শক্তিতে অগ্রসর হতে থাকে। এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে।[২৫২] এরপর বাইজান্টাইন বাহিনী এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চলে এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় নগরীগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করে। নিকিয়ার পতনের পর তিন শতাব্দীরও অধিক সময় এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চল বাইজান্টাইনদের দখলে ছিল।[২৫৩]

৫. ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইনদের যুগপৎ মনোবল বৃদ্ধির বিপরীতে বিভিন্ন এলাকার মুসলিম বাহিনী, সেনাপতিগণ, জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ নির্বিশেষে সকলের আত্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড ধস নামে। কারণ, নিকিয়ার পতন ছিল এশিয়া মাইনর অঞ্চলের সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরীর পতন। এর অর্থ হলো, অন্যান্য নগরীর আরও সহজে পতন ঘটবে। তা ছাড়া

---

২৫০. Runciman, op. cit., 1, p.p. 182-183, Setton: op. cit. 1, p. 201.

২৫১. Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp 42-43.

২৫২. Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 41-43.

২৫৩. সাঈদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৩৯।

পশ্চিমের ক্রুসেডার বাহিনী আর প্রাচ্যের বাইজান্টাইন বাহিনী এই দুই বিশাল শক্তির জোট বাঁধার অর্থ হচ্ছে, ইসলামি ভূখণ্ডের জন্য সামনের দিনগুলো অতীতের চেয়ে আরও কঠিন হবে!

৬. নিকিয়া পতনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো, একে কেন্দ্র করে ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন সম্পর্কের মাঝে দুষ্ট মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া আরও বৃদ্ধি পায় এবং তা পরবর্তীকালে ক্রুসেড অভিযানের গতি-প্রকৃতি ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ক্রুসেডার বাহিনীর সেনাপতিগণ বাইজান্টাইন সম্রাটের ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি তার প্রতি ভীতি অনুভব করতে থাকে। এটি সুস্পষ্ট যে, ভেতরে ভেতরে পরিস্থিতি তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল এবং ছাইচাপা আগুন জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় ছিল। এ কারণেই বাইজান্টাইন সম্রাট নিকিয়া অভিযানের পর সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দকে সমবেত করে তার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতার শপথ নবায়ন করতে চাপ দিতে থাকেন। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সকলে শপথ নবায়ন করে। বোহেমন্ড আগের মতোই সম্রাটের হৃদ্যতা লাভের আশায় বিনা দ্বিধায় দ্রুত শপথ সম্পন্ন করেন আর ৪র্থ রেমন্ড আনুগত্য ও মিত্রতার শপথ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সম্রাটের মর্যাদা রক্ষার শপথ নবায়ন করেন।[২৫৪] এ ছাড়াও বোহেমন্ডের ভাগ্নে টেনক্রেড শপথ করতে অস্বীকৃতি জানান। টেনক্রেড শুরুতে কনস্টান্টিনোপলেও তার মামার শপথের ওপর নির্ভর করে নিজে শপথ করেননি। টেনক্রেডের এই শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি পরবর্তী সময়ে তার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল।

৭. একদিকে সেলজুকদের পরাজয়, অপরদিকে (অর্থোডক্স বাইজান্টাইনদের তুলনায় তুলনামূলক আস্থার পাত্র) ক্যাথলিক মতাদর্শী ক্রুসেডারদের এশিয়া মাইনর অঞ্চলে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা—এই দুই কারণে আর্মেনীয়দের মাঝেও দৃশ্যমান উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আগামী ঘটনাপ্রবাহে আমরা লক্ষ করব যে, একে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে আর্মেনীয় ও ক্রুসেডারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য

---

[২৫৪]. Chalandon: Alexis Comnene, p. 193.

সহযোগিতা বিনিময় প্রকাশ পাবে। নিকিয়া পতনের পর বিশেষ করে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলসহ আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিভিন্ন নগরী থেকে ক্রুসেডারদের প্রতি আপন আপন অঞ্চলে আগমনের অনুরোধ আসতে থাকে। আর্মেনীয়দের এসব অনুরোধবার্তা ক্রুসেড অভিযানের পরবর্তী গতিপথ নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

৮. সামরিক প্রভাব : নিকিয়া পতনের ফলে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। নিকিয়াই ছিল এশিয়া মাইনরের ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। আর তাই নিকিয়া পতনের পর ক্রুসেডারদের সামনে এশিয়া মাইনরের গভীরে বরং শাম অঞ্চলে পৌঁছার বিরাট সুযোগ এসে যায়।[২৫৫]

৯. নিকিয়া পতনের পর কিলিজ আরসালান দ্রুত কোনিয়া[২৫৬] নগরীতে চলে যান এবং কোনিয়াকে নতুন রাজধানী নির্বাচন করেন।[২৫৭] এভাবেও বলা চলে যে, কোনিয়া পরিণত হয় তার নতুন সামরিক ঘাঁটিতে, যেখান থেকে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। কোনিয়া ছিল নিকিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় চারশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নিকিয়ার মতো না হলেও কোনিয়া নগরীও যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল।

১০. রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের নেতা কিলিজ আরসালান ও তুর্কমেনদের নেতা গাজি বিন দানিশমান্দ সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা আপাতত কিছু সময়ের জন্য পারস্পরিক বিরোধের কথা ভুলে গিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একক ফ্রন্ট গড়ে তুলবেন।[২৫৮] বাহ্যত এই ঐক্য

---

২৫৫. Oman: vol 1 p 279.

২৫৬. কোনিয়া : বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত কোনিয়া প্রদেশের রাজধানী নগরী। জগদ্বিখ্যাত সুফি সাধক জালালুদ্দিন রুমি রহ.-এর সমাধি কোনিয়া নগরীতেই অবস্থিত। হাতে-বোনা কার্পেট শিল্পের জন্য কোনিয়ার বিশ্বজুড়ে খ্যাতি রয়েছে। [অনুবাদক]

২৫৭. রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, ১/২৭৮।

২৫৮. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১৮৬, ১৬৪ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৪।

Gesta Francorum, pp. 19-22; Fulcher de Chartres, pp. 83-87; William of Tyre, 1, pp. 169-173; Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 293-294; Mayer, Crusades, pp. 50-51.

প্রচেষ্টা যদিও একটি ইতিবাচক বিষয় ছিল; কিন্তু বাস্তবে এর উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব ছিল না। এই ঐক্য ছিল দুর্বল ও ভঙ্গুরপ্রায়। কারণ, একদিকে উভয় পক্ষের বিরোধ ও শত্রুতা ছিল গভীর ও সুপ্রাচীন; অপরদিকে একতা ও সম্মিলিত লড়াইয়ের সুস্পষ্ট ইসলামি অনুপ্রাণিকাও উভয় পক্ষের মাঝে অনুপস্থিত ছিল। দ্বীন রক্ষার্থে নয়; বরং তাদের ঐক্য ছিল আপন আপন ভূখণ্ড রক্ষার জন্য।

নিকিয়া পতনের কার্যকারণসমূহ

আমরা যদি নিকিয়াতে মুসলমানদের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ ও কার্যকারণ বিশ্লেষণ করি, তাহলে এমন কিছু বিষয় আমাদের সামনে উঠে আসবে, যা ইতিহাসের যুগে যুগে মুসলমানদের পরাজিত হওয়া প্রতিটি যুদ্ধের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। কারণ, এগুলো সর্বযুগে কার্যকর শাশ্বত কিছু নীতি। আমাদের সামনে যেসব কার্যকারণ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে ইসলামি চেতনাবোধ ও দ্বীনি উদ্দীপনার অনুপস্থিতি। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে লড়াই করে আর যারা লড়াই করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা জীবন রক্ষার জন্য—উভয় দলের মাঝে কত পার্থক্য!

২. মুসলমানদের পারস্পরিক দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ-বিভক্তি এবং অধিকাংশ অঞ্চলে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই-সংঘাত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

এবং পরস্পরে কলহ করবে না। অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্যধারণ করবে। বিশ্বাস রাখো, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

[সুরা আনফাল : ৪৬]

আয়াতের ভাষ্য দ্বারা সুস্পষ্ট অনুমিত হয় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক কলহ-বিবাদ পরাজয়, ব্যর্থতা ও প্রভাব বিলুপ্তির অন্যতম মৌলিক কার্যকারণ।

৩. ঘটনাপ্রবাহের প্রতি শাম অঞ্চল, ইরাক, মিশর ও ইসলামি প্রাচ্যের

মুসলমানদের উদাসীনতা এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় এশিয়া মাইনরের সেলজুক শক্তির নিঃসঙ্গ সংগ্রাম। অথচ পরবর্তী সময়ে তাদের সকলকেই ক্রুসেড অভিযানের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার শিকার হতে হয়েছিল।

৪. উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতির অভাব। সেলজুকদের গোয়েন্দা-তৎপরতা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তারা যতক্ষণে ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রার বিষয়টি উপলব্ধি করে, ততক্ষণে সময় শেষ হয়ে গেছে। বিপরীতে ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইনরা এই দিনটির জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছিল। আর শাশ্বত নীতি হলো, যে-ই চেষ্টা করবে, আপন চেষ্টা ও প্রস্তুতির ফল অবশ্যই লাভ করবে।

মোটামুটি এগুলোই ছিল নিকিয়ার পরাজয় ও পতনের মূল কার্যকারণ। এসব কারণ যখন যেকোনো প্রজন্মের মাঝে পাওয়া যাবে, নিঃসন্দেহে তারাও একই পরিণতির শিকার হবে এবং একই ধরনের সংকট ও সমস্যার সম্মুখীন হবে।

নিকিয়া পতনের পর ক্রুসেডারদের পরবর্তী পদক্ষেপ

নিকিয়া পতনের পর এক সপ্তাহের বিশ্রাম শেষেই ক্রুসেডাররা সামনে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এবার তারা দক্ষিণ-পূর্বে কিলিজ আরসালানের নতুন রাজধানী কোনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কোনিয়ার পথে ক্রুসেডাররা নিজেদের দুই ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিল। এক অংশ ছিল সম্পূর্ণ নরম্যানদের নিয়ে গঠিত। বোহেমন্ড ও টেনক্রেডের নেতৃত্বাধীন ইতালিয়ান নরম্যানদের পাশাপাশি রবার্ট ও স্টিফেনের নেতৃত্বাধীন ফ্রেঞ্চ নরম্যানরাও এ অংশে ছিল। এই অংশের সর্বাধিনায়কত্বের দায়িত্ব ছিল বোহেমন্ডের কাঁধে। অভিজ্ঞ সেনাপতি ট্যাটিকিয়াস (Taticius)-এর নেতৃত্বে বাইজান্টাইন বাহিনীর একটি অংশও এই দলের সঙ্গে ছিল। ক্রুসেডার বাহিনীর দ্বিতীয় অংশটি ছিল ৪র্থ রেমন্ডের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ ফ্রান্সের বাহিনী ও গডফ্রের নেতৃত্বাধীন উত্তর ফ্রান্স ও লোরেন অঞ্চলের বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত। এ অংশের সর্বাধিনায়ক ছিলেন ৪র্থ রেমন্ড। উভয় বাহিনী নিজেদের মাঝে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরত্ব রেখে সমান্তরালে অগ্রসর হতে থাকে। সিদ্ধান্ত হয় যে, দোরিলায়ুম (Dorylaeum) নগরীর প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকায় উভয় বাহিনী পরস্পর

মিলিত হবে।[২৫৯] এলাকাটি নিকিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রেখে ক্রুসেডার বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে রওনা হয়েছিল। একটি বিষয় হলো, এর ফলে তাদের রসদ ও খাবার-দাবার সংগ্রহ সহজতর হবে। কারণ, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা পথের বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রে বিদ্যমান ফল-ফসলের ওপরই নির্ভর করছিল। অপরদিকে পানির জন্য তারা নির্ভর করছিল এ অঞ্চলে বিদ্যমান বিভিন্ন ঝরনা ও কূপের ওপর। আরেকটি দিক হলো, এর ফলে সৈন্যদের চলার গতি দ্রুত ও সহজতর হবে। কারণ, বিদ্যমান পথঘাট যতই প্রশস্ত হোক না কেন, এই বিশাল বাহিনীর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

ক্রুসেডার বাহিনীর এভাবে বিভক্ত হয়ে চলার আরেকটি লক্ষ্য ছিল, পথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেলজুক সৈন্যদের নিরাপত্তা চৌকিগুলো (pocket of resistance) ধ্বংস করা।[২৬০] সেলজুক গোয়েন্দাদের ধোঁকা দেওয়াও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, সম্ভাবনা ছিল যে, সেলজুক বাহিনী ক্রুসেডার বাহিনীর একটি অংশকেই পূর্ণ বাহিনী মনে করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। আর এমনটি ঘটলে নিশ্চিত করেই মুসলমানদের যুদ্ধ পরিকল্পনায় বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে। বাস্তবেও এই সুবিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে এমনটিই ঘটেছিল।

দোরিলায়ুমের যুদ্ধ

বোহেমন্ডের নেতৃত্বাধীন অংশটি দোরিলায়ুম অঞ্চলে পৌঁছে দেখতে পায় যে, সেখানকার সমতলভূমি ও উচ্চভূমিতে মুসলিম বাহিনী তাদের অপেক্ষায় আছে। কিলিজ আরসালান ও গাজি বিন দানিশমান্দ উভয়ের বাহিনী মিলে মুসলিম বাহিনী গঠিত হয়েছিল। ক্রুসেডারদের প্রত্যাশামতোই মুসলিম বাহিনী মনে করেছিল যে, বোহেমন্ডের নেতৃত্বাধীন এই বাহিনীটিই অন্তত এ অঞ্চলের পূর্ণ ক্রুসেডার বাহিনী।

১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই (৪৯০ হিজরি) উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড

---

২৫৯. Alexiad: p. 279; Oman: vol, 1, p.272; Gesta Francorum, pp. 19-22; Fulcher de chartres, pp. 83-87; William of Tyre, 1, pp. 169-1773; Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 293-294; Mayer, Crusades, pp. 50-51.

২৬০. সাঈদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৩৪।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম দিকে যুদ্ধপরিস্থিতি ক্রুসেডার বাহিনীর প্রতিকূলে চলে যায় এবং উজ্জীবিত মুসলিম বাহিনী প্রত্যাশা করে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জয় তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। কিন্তু এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে ৪র্থ রেমন্ড ও গডফ্রের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনীর অপর অংশটি উপস্থিত হয়ে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে যুদ্ধ-পরিস্থিতি উল্টে যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ক্রুসেডার সেনাপতি বোহেমন্ড এ সময় আহত হন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম বাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং তারা তিক্ত পরাজয়ের শিকার হয়। কিলিজ আরসালান বিপুল পরিমাণ রসদ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফেলে দ্রুত পালিয়ে এশিয়া মাইনরের গভীরতম অংশে চলে যান। ইতিহাসে দোরিলায়ুমের যুদ্ধ নামে খ্যাত এ যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়।[২৬১]



মানচিত্র নং-১৪

দোরিলায়ুমের যুদ্ধক্ষেত্র

দোরিলায়ুমের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে নিকিয়া পতনের প্রভাব আরও গভীরে পৌঁছায়; ক্রুসেডার, বাইজান্টাইন ও আর্মেনীয়দের মনোবল

২৬১. Grousset: Op cit., 1, p. 35.

আরও অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়, মুসলিম বাহিনীর মনোবল পতনের সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হয়। রোমান সেলজুক নেতা কিলিজ আরসালান এরপর আর সরাসরি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রসর হননি। তিনি পথের সকল নগরী ও জনপদ অরক্ষিত ফেলে পালিয়ে চলে যান। ফলে ক্রুসেডাররা উল্লেখযোগ্য কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই বিস্তৃত অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।



মানচিত্র নং-১৫

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর গতিপথ

এর চেয়েও দুঃখজনক বিষয় হলো, নিকিয়া পতনের পর যে কোনিয়া নগরীকে কিলিজ আরসালান তার নতুন রাজধানী নির্বাচিত করেছিলেন, ক্রুসেডাররা সেখানে পৌঁছে নগরীটিকে সম্পূর্ণ জনশূন্য অবস্থায় পায়। অল্প কিছু আর্মেনীয় নাগরিক সেখানে ক্রুসেডারদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিল।[২৬২] ক্রুসেডার বাহিনী অতি সহজে কোনিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার করার পর সামনে অগ্রসর হয়ে হিরাক্লিয়া (Heraclea) নগরীও দখল করে নেয়।[২৬৩] এরপর তারা উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হয়ে কায়সারিয়া

২৬২. Gesta Francorum, pp. 55-57.

২৬৩. Setton: op. cit., vol. 1, p. 295.

(Kayseri) নগরী জয় করে।[২৬৪] কায়সারিয়া জয় করার পর ক্রুসেডার বাহিনী তোরোস পর্বতমালার বিভিন্ন পাহাড় অতিক্রম করে মারআশ নগরীতে পৌঁছায়। মারআশ[২৬৫] নগরীর অধিকাংশ নাগরিক ছিল আর্মেনীয় জাতিগোষ্ঠীর। তারা ক্রুসেডার বাহিনীকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর (৪৯০ হিজরি) ক্রুসেডাররা নগরীটির কর্তৃত্ব বুঝে নেয়।

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, ক্রুসেডার বাহিনী এ সময় পর্যন্ত বিজিত সবগুলো নগরীর কর্তৃত্ব কনস্টান্টিনোপল-চুক্তির দাবি অনুসারে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দেয়।[২৬৬] এটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা যে, এই সমর্পণ মোটেও স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিল না; বরং ক্রুসেডার বাহিনী অভিযান চলাকালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সমরবিশেষজ্ঞ, পথপ্রদর্শক ও অবরোধসামগ্রীসহ বিভিন্ন সাহায্যের পুরোপুরি মুখাপেক্ষী থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়েই বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্য করে যাচ্ছিল। এটিও সুস্পষ্ট অনুমিত হচ্ছিল যে, পরবর্তী সময়ে প্রথম সুযোগেই ক্রুসেডাররা বাইজান্টাইন প্রভাব থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, তারা অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের প্রতি হৃদ্যতার কারণে কিংবা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়নি এবং নিজেদের জান-মাল বিসর্জন দেয়নি। ক্রুসেড অভিযানের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি বাহিনীর সেনাপতিদের সাম্রাজ্যবাদী লালসা বাস্তবায়ন, ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি ও ইসলামি প্রাচ্যের সম্পদ ভোগ করা। ক্রুসেডারদের পরবর্তী পদক্ষেপসমূহে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

ইসলামি প্রাচ্যের বুকে প্রথম ক্রুসেড রাজ্য

সম্ভবত এই সাম্রাজ্যবাদী লালসার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে বোহেমন্ডের ভাগ্নে টেনক্রেড ও গডফ্রের ভাই বল্ডউইনের মাধ্যমে। এ সময় তারা দুজন মূল ক্রুসেডার বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত কিলিকিয়া অঞ্চল জয় করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়।[২৬৭] ১০৯৭

---

২৬৪. Gesta Francorum, pp. 61.

২৬৫. ইংরেজি নাম Kahramanmaraş। [অনুবাদক]

২৬৬. Cam. Med Hist. vol. 5, p. 287.

২৬৭. Chalandon: premiere Croisades, p. 172.

খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর (৪৯০ হিজরি) উভয়ের নেতৃত্বাধীন বাহিনী মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ২১ সেপ্টেম্বর সরাসরি তারসুস[২৬৮] নগরী অভিমুখে রওনা হয়।

টেনক্রেডের বাহিনী দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারসুস নগরীর কাছে পৌঁছে যায় এবং নগরীর নিরাপত্তা-দায়িত্ব পালনরত তুর্কি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তুর্কি বাহিনী ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে থাকলেও হঠাৎ করেই বল্ডউইনের বাহিনীও উপস্থিত হয়। ফলে মুসলিম বাহিনী উপলব্ধি করে যে, প্রতিরোধ প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।[২৬৯] তাই তারা নগরী ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে টেনক্রেড নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে নিজের পতাকা উত্তোলন করেন। টেনক্রেডের যেন মনেই নেই যে, কনস্টান্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী বিজিত প্রতিটি নগরীর অধিকার বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের! তারসুসের আর্মেনীয় নাগরিকরা টেনক্রেডকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানায়।[২৭০] কিন্তু বল্ডউইন এতে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। একে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির উপক্রম হয়। স্বভাবতই বল্ডউইনের ক্রোধ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের স্বার্থহানির কারণে ছিল না; তার ক্রোধ ছিল আপন স্বার্থহানির কারণে। তার আশা ছিল টেনক্রেড নয়; তিনিই হবেন তারসুসের অধিপতি। শেষ পর্যন্ত টেনক্রেড নগরীটির কর্তৃত্ব বল্ডউইনের হাতে ছেড়ে দিতে সম্মত হন এবং নিজে মপসুয়েসটিয়া (Mopsuestia) নগরীর দিকে অগ্রসর হন। বল্ডউইন এবার নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিদর্শন হিসেবে তারসুস নগরীর শীর্ষদেশে তার পতাকা উত্তোলন করেন।[২৭১]

এরই মধ্যে এমন দুটি ঘটনা ঘটে, যার কারণে তারসুস অঞ্চলের পরিস্থিতি

---

২৬৮. তারসুস ও তারতুস দুটি ভিন্ন নগরীর নাম। ঐতিহাসিক কিলিকিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তারসুস (Tarsus)-এর অবস্থান আধুনিক তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে। জনসংখ্যার বিচারে তারসুস তুরস্কের চতুর্থ বৃহত্তম নগরী। অপরদিকে তারতুস (Tartus)-এর অবস্থান আধুনিক সিরিয়ায়। তারতুস লাতাকিয়ার পর সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর-নগরী। উভয় নগরীর অবস্থান ভূমধ্যসাগরের তীরে হলেও মাঝের দূরত্ব চারশ কিলোমিটারেরও বেশি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে নগরীদুটির আলোচনা আসবে। [অনুবাদক]

২৬৯. ফুশিয়া আশ-শারতিরি, *তারীখুল হামলাতি ইলাল কুদস*, পৃষ্ঠা : ৫১-৫২।
Grousset: vol 1 p 46.

২৭০. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 41.

২৭১. Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 288.

অনেকটা বদলে যায়। প্রথম ঘটনাটি হলো, বোহেমন্ড তার বাহিনীর তিনশ সদস্যের একটি অংশকে ভাগ্নে টেনক্রেডের সহায়তায় প্রেরণ করেছিলেন। তারা রাতের বেলা তারসুসে পৌঁছে জানতে পারে যে, টেনক্রেড ইতিমধ্যে তারসুস ত্যাগ করে চলে গেছেন এবং নগরীটি এখন বল্ডউইনের কর্তৃত্বে আছে। তারা পরদিন সকাল পর্যন্ত নগরীর অভ্যন্তরে রাতযাপনের অনুমতি চাইলে বল্ডউইন তাদেরকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাদেরকে নগরীর বাইরেই রাত কাটাতে বাধ্য করেন। তিনশ সৈন্য খোলা প্রান্তরে ঘুমিয়ে পড়ার পর আকস্মিকভাবে একদল তুর্কি সৈন্য তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে দেয়।[২৭২] এ সংবাদ ক্রুসেডার বাহিনীর কাছে পৌঁছলে সকলে বল্ডউইনের ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয় এবং তাকেই এই তিনশ সৈন্যের নিহত হওয়ার জন্য দায়ী করে।[২৭৩]

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, বল্ডউইনের আস্থাভাজন জনৈক আর্মেনীয় নাগরিক বল্ডউইনকে সীমিত পরিসরের তারসুস নগরী ছেড়ে ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত এডেসা নগরী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেয়। এডেসা ছিল তারসুসের তুলনায় বিস্তৃত, উর্বর ও সমৃদ্ধ এক নগরী।

বল্ডউইনের লালসা এবং বাইজান্টাইনদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ

আর্মেনীয় বন্ধুর পরামর্শ শুনে বল্ডউইনের লোভাতুর চোখ চকচক করে ওঠে। তিনি এবার তারসুস ত্যাগ করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। পথে মপসুয়েসটিয়া নগরীর প্রবেশদ্বারে তার টেনক্রেডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তারসুসের নগরপ্রাচীরের বাইরে নিঃশেষ হওয়া ইতালিয়ান সৈন্যদের ইস্যুকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে এ সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[২৭৪] শেষ পর্যন্ত উভয়ে সমঝোতায় উপনীত হন এবং মূল ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন।

বিচ্ছিন্ন বাহিনীদুটি মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতেই বল্ডউইনের ভাই গডফ্রেসহ সকল সেনাপতি বল্ডউইনকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে থাকে। সকলের সম্মিলিত আগ্রাসী আচরণে বল্ডউইন বিক্ষুব্ধ হয়ে তার

---

২৭২. Albert d` Aix, (Hist Occid) IV, p.p. 346-347.

২৭৩. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৪৩।

২৭৪. Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 288.

বাহিনী নিয়ে আবারও মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং পূর্বে এডেসা অভিমুখে রওনা হন।[২৭৫] তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাস দখল, 'নিপীড়িত' খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তাবিধান ইত্যাদি সব লক্ষ্য ভুলেই গেছেন! আবারও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার একমাত্র লক্ষ্য হলো নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা; যদিও তা হোক বাইতুল মুকাদ্দাস ও তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের পথ থেকে অনেক দূরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলে।

বল্ডউইনের বাহিনী এডেসা অভিমুখে রওনা হওয়ার পর পথের প্রতিটি নগরী যুদ্ধ ছাড়াই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এসব নগরীর অধিকাংশ নাগরিক ছিল আর্মেনীয়। একে একে বিভিন্ন নগরী জয় করে অবশেষে বল্ডউইন এডেসায় পৌঁছান। এডেসার আর্মেনীয় নাগরিকরাও বল্ডউইনকে স্বাগত জানায়। থোরোস (Thoros) নামক জনৈক গ্রিক সেনাপতি নগরীটির প্রশাসক ছিলেন। থোরোস ইতিপূর্বে মুসলমানদের জিজিয়া প্রদান করে আসছিলেন।[২৭৬] তার আশা ছিল—তিনি যদি কোনোদিন নগরীটির একক কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নেবেন। বল্ডউইনের বশ্যতা স্বীকারের ইচ্ছা তার মোটেও ছিল না। স্বভাবতই বল্ডউইনের প্রতি আর্মেনীয় নাগরিকদের উচ্ছ্বাস আচরণও তার মনঃপূত হচ্ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া তার সামনে ভিন্ন কোনো পথও খোলা ছিল না। তাই থোরোস এমন একটি মধ্যবর্তী সমাধান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে নিজ স্বার্থও রক্ষা পায়, বল্ডউইনও তুষ্ট থাকে। প্রৌঢ় থোরোস বল্ডউইনকে তার পোষ্য পুত্র হওয়ার প্রস্তাব দেন এবং তাকে বোঝান যে, এর ফলে বল্ডউইন ভবিষ্যতে এডেসা নগরীসহ আশেপাশের উর্বর ও সমৃদ্ধ জনপদসমূহের বৈধ উত্তরাধিকারীতে পরিণত হবেন।[২৭৭] বল্ডউইন থোরোসের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে এডেসায় প্রবেশ করেন। এরপর তিনি থোরোসের দফারফার জন্য এডেসার অধিবাসী কয়েকজন আর্মেনীয় নাগরিকের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করেন। কদিন পরই সকলে মিলে থোরোসকে হত্যা করে এবং নগরীর কর্তৃত্ব চলে

---

২৭৫. Albert d' Aix, (Hist Occid) III XX VII.

২৭৬. Guibert de Nogent. 111. p. 156.

২৭৭. Matthieu d' Edesse (Doc ar.) 1, p. 35; Runciman, op. cit., 1, p. 204.

আসে বল্ডউইনের হাতে। এর মাধ্যমে বল্ডউইনের হাত ধরে ৪৯১ হিজরি সনে (১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) ইসলামি বিশ্বের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে প্রথম ক্রুসেড রাজ্য—এডেসা রাজ্য।[২৭৮]

রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরই বল্ডউইন অনুভব করেন যে, তার সঙ্গে থাকা সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই অল্প, বিপরীতে এ অঞ্চলের অধিকাংশ নাগরিক আর্মেনীয়। তাই নবগঠিত রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করতে এবং যেকোনো প্রকার অস্থিরতা বা আন্দোলন সৃষ্টির সুযোগ বন্ধ করে দিতে বল্ডউইন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বল্ডউইনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পশ্চিমা ক্রুসেডার ও আর্মেনীয়দের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। বল্ডউইন নিজেই এর সূচনা করেন এবং জনৈক আর্মেনীয় নেতার কন্যা আরডা (Arda)-কে বিয়ে করেন।[২৭৯]

তার গৃহীত আরেকটি পদক্ষেপ হলো এডেসা রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। এডেসা অঞ্চলের আশেপাশে ছিল আর্মেনীয়দের পরম শত্রু তুর্কিদের কর্তৃত্ব। বল্ডউইন তার নিজস্ব সৈন্য এবং আর্মেনীয় সৈন্যদের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করে এডেসা থেকে একদিনের দূরত্বে (পয়তাল্লিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে) অবস্থিত সুমাইসাত (Samosata) অভিমুখে অগ্রসর হন। সুমাইসাতের কর্তৃত্ব ছিল জনৈক তুর্কি-সেলজুক সেনাপতির হাতে। বল্ডউইন-বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে মুসলিম সেনাপতি প্রথমেই এই চিন্তা করেন যে, বিশেষত এশিয়া মাইনর অঞ্চলে সেলজুকদের ধারাবাহিক পরাজয় এবং পারসিক সেলজুক ও শামীয় সেলজুকদের এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনের পর তার পক্ষে ক্রুসেডার-আর্মেনীয় সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। হতাশা ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে সুমাইসাত নগরীর মুসলিম প্রশাসক এক নিন্দনীয় কাজ করে বসেন। তিনি প্রতিরোধ যুদ্ধের পরিবর্তে বল্ডউইনকে অর্থের বিনিময়ে নগরীটি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। তুর্কি প্রশাসক জনগণসহ নগরীটির কর্তৃত্ব সমর্পণের বিনিময়ে বল্ডউইনের কাছে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দাবি করেন। বল্ডউইন সামান্য দ্বিধা না করে এ প্রস্তাবে সম্মত হন।

---

২৭৮. Matthieu d' Edesse (Doc ar.) 1, pp. 37-38.

২৭৯. Guillaume de Tyr, p. 402.

কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি এডেসার প্রয়াত গ্রিক প্রশাসক থোরোসের রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদভান্ডারের অধিকারী হয়েছেন। বল্ডউইন দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করে যুদ্ধ ব্যতীতই ইসলামি নগরীটির কর্তৃত্ব বুঝে নেন।[২৮০]

ইসলামি ভূখণ্ডে বর্বর ক্রুসেড আগ্রাসন ও চলমান ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাখ্যা যারা খুঁজছেন, তারা আশা করি এর ব্যাখ্যা পেয়ে গেছেন! নিঃসন্দেহে জাতীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীন এবং অর্থের বিনিময়ে সবকিছু বিক্রি করতে আগ্রহী এ ধরনের নেতার অস্তিত্বই একটি ভূখণ্ডের ধ্বংস টেনে আনে।

সুমাইসাত অধিকার করেই তুষ্ট না হয়ে বল্ডউইন এরপর সামনে অগ্রসর হন এবং রাজ্যপরিধি সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে একে একে সারুজ ও আলবেরা (Birecik) নগরী অধিকার করেন।[২৮১] এভাবে পর্যায়ক্রমে একের পর এক নগরী ফরাসি সেনাপতি বল্ডউইনের লালসার শিকার হতে থাকে।

এডেসা অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার জন্য বল্ডউইনের গৃহীত আরেকটি পদক্ষেপ হলো, তিনি বিশেষ করে সুমাইসাতসহ প্রতিটি ইসলামি নগরীকে নিজের রাজ্যে যুক্ত করার সময় সেখানে তুর্কি কারাগারে বন্দি আর্মেনীয়দের মুক্ত করে দেন এবং তাদেরকে কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন। বল্ডউইন এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্মেনীয় নাগরিকদের হৃদ্যতা ও সমর্থন লাভ করতে চাচ্ছিলেন।

তার গৃহীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পদক্ষেপ হলো, তিনি বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় কনস্টান্টিনোপল চুক্তি হতে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন।[২৮২] তিনি মূলত এর মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করেন। একদিকে তিনি কারও আনুগত্য ব্যতিরেকে নিজের একক নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন; অপরদিকে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্মেনীয় নাগরিকদেরকেও তুষ্ট করতে সক্ষম হন। চরম সাম্প্রদায়িক আর্মেনীয়রা

---

২৮০. Guillaume de Tyr, p. 159.

২৮১. Albert d' Aix, (Hist Occid) IV, pp. 356-357, 445-446; Grousset : L'Empire. du Levant, p. 402.

২৮২. Runciman, op. cit., I, p. 206.

অর্থোডক্স মতাদর্শীদের প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ ছিল। অপরদিকে আর্মেনীয়দের মতাদর্শ ক্যাথলিক মতাদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও অর্থোডক্সদের তুলনায় তুলনামূলক অধিক নিকটতর ছিল।

বল্ডউইন তার নবগঠিত রাষ্ট্রে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি পশ্চিমা ক্যাথলিক মতাদর্শ গ্রহণ করতে আর্মেনীয়দের ওপর মোটেও চাপ সৃষ্টি করেননি। তার এই নীতি আর্মেনীয় জনসাধারণের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।[২৮৩]

বল্ডউইন সুস্পষ্ট ভাষায় বিদ্রোহ করলেও বাইজান্টাইন সম্রাট তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। কারণ, এডেসা ছিল বাইজান্টাইনদের কর্তৃত্বপূর্ণ অঞ্চল থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। বাইজান্টাইন সম্রাটের মূল শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে এবং কিলিকিয়া অঞ্চলের নগরীগুলোতে; বিশেষ করে তারসুস, আদানা (Adana) ও মপসুয়েসটিয়া নগরীতে। অধিকন্তু তিনি তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী এন্টিয়ক নিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। মূল ক্রুসেডার বাহিনীও তখন এন্টিয়ক অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল।[২৮৪]

একজন ঝানু ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে বল্ডউইন আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর প্রীতি আচরণে মোটেও প্রবঞ্চিত হননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তারা আজ তাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে কেবল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বশ্যতা ও তুর্কিদের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য। পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় হলেই তারা তাকে ও তার সৈন্যদেরকে গলাধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। এ কারণেই বল্ডউইন ক্রুসেডারদের স্বার্থ রক্ষায় এডেসা রাজ্যের নাগরিক বিন্যাসেও পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। বর্তমানে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে যে নীতি অবলম্বন করেছে, বল্ডউইন এডেসা রাজ্যে ঠিক একই নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সে বার্তা পাঠিয়ে সেখানকার জনসাধারণকে তার প্রতিষ্ঠিত ক্রুসেড রাজ্য এডেসায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপনের অনুরোধ জানান। বল্ডউইন ভাড়াটে সৈন্য পাঠাতে বলেননি; বরং ইউরোপীয় পরিবারগুলোকে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে এডেসায় চলে আসতে বলেছিলেন।

---

২৮৩. Runciman, op. cit., 1, p. 211.

২৮৪. Setton: op. cit., 1, p. 304.

পাশাপাশি তিনি প্রচুর অর্থসম্পদ প্রদান ও এডেসা নগরপ্রাচীরের বাইরে বড় বড় এলাকাজুড়ে জায়গির প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইউরোপের প্রভাবশালী ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং জায়গির মালিকদের এডেসায় চলে আসতে প্ররোচিত করেন। বল্ডউইনের এই নীতির ফলে এডেসা রাজ্য একখণ্ড পশ্চিম ইউরোপিয়ান ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ইউরোপের ন্যায় এডেসায়ও সামন্তব্যবস্থা চালু করা হয়। ক্রুসেডার যোদ্ধারা বড় বড় জায়গির-ভূমি লাভ করে। আর ভূমিহারা আর্মেনীয় জনসাধারণ ক্রুসেডারদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কৃষিকর্ম ও বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে।[২৮৫]

স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতি কিছু আর্মেনীয়কে উত্তেজিত করে তোলে। তারা বিভিন্ন সময় বল্ডউইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টাও চালায়। কিন্তু বল্ডউইন অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও দমননীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এর ফলে পরবর্তী সময়ে পুরো রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলামুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৮৬]

এভাবে ভীতি ও প্রীতি সঞ্চার, আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও পশ্চিম ইউরোপের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সুদৃঢ় সহযোগিতা বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে বল্ডউইন ইসলামি বিশ্বের বক্ষমূলে প্রতিষ্ঠিত ক্রুসেড রাজ্য এডেসার শাসনক্ষমতা মজবুত করতে সক্ষম হন।

এডেসা রাজ্যের একদিকে ছিল পারসিক সেলজুক রাষ্ট্র ও ইসলামি প্রাচ্য অঞ্চল, অপরদিকে ছিল শাম অঞ্চল ও বাইতুল মুকাদ্দাস। আর তাই পরবর্তী সময়ে যখন শাম ও বাইতুল মুকাদ্দাসে আরও কিছু ক্রুসেড রাজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেসব ক্রুসেড রাজ্যের বিরুদ্ধে পারসিক সেলজুক ও ইসলামি প্রাচ্যের আক্রমণ প্রতিরোধে এডেসা রাজ্য প্রথম প্রাচীর হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকন্তু এডেসা রাজ্যের অবস্থান ছিল নাগরিক বিন্যাসের বিচারে সম্পূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র মসুল, দিয়ারে বকর ও জাযিরা অঞ্চলের অতি নিকটে। আর তাই এডেসা রাজ্য পরিণত হয় মুসলমানদের ক্ষতিসাধনে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ক্রুসেড রাজ্যে।

আরেক দিক থেকে বিবেচনা করলে এডেসা ছিল সবচেয়ে দুর্বল ক্রুসেড

---

২৮৫. Michaud: op. Cit. 1, p. 235; Runciman, op. cit., 1, p. 211.

২৮৬. Albert d' Aix, p. 443, & Guillaman de tyr. 285.

রাজ্য। কারণ, এরপর শাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ক্রুসেড রাজ্য হতে এডেসার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বেশ দূরে। ওদিকে ভূমধ্যসাগর হয়ে আগত ইতালিয়ান নৌবহরগুলোর কাছ থেকে সাহায্য লাভের সুযোগও এডেসা রাজ্যের ছিল না।[(২৮৭)] তা ছাড়া পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এডেসায় প্রচুর আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করত; যাদের ছিল নিজস্ব স্বার্থচিন্তা ও অভিলাষ। অধিকন্তু এডেসা ছিল মসুল নগরী থেকে বেশ নিকটে, আর মসুল থেকেই পরবর্তী সময়ে এক ইসলামি জাগরণ সূচিত হয়, যা এডেসা রাজ্যের শক্তি ও অস্তিত্বে ব্যাপক আঘাত হানে।

এডেসা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে আমরা আবারও মূল ধারাবর্ণনায় ফিরে আসছি। বল্ডউইন চলে যাওয়ার পর মূল ক্রুসেডার বাহিনী এশিয়া মাইনর অঞ্চলের দুর্গম বিভিন্ন অঞ্চল পাড়ি দেয়। পথে তারা অতিক্রম করে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, ক্ষেত্রবিশেষে মোকাবিলা করে পানির প্রচণ্ড অভাব। পথের বিভিন্ন স্থানে তুর্কিদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে, যাকে আমরা নামকরণ করতে পারি 'গেরিলা যুদ্ধ' নামে। তবে শেষ পর্যন্ত সব প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে ক্রুসেডার বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নগরীর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর (৪৯০ হিজরি সনে) তারা পৌঁছে যায় এন্টিয়ক নগরীর কাছে।[(২৮৮)]

* * *

---

[২৮৭]. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখু সালাজিকাতির রূম ফী আসিয়াস সুগরা*, পৃষ্ঠা : ৯২।

[২৮৮]. Raymond d' Agueiler, in peters, pp. 160.ff; William of Tyre, 1, pp. 204-220.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক।

এন্টিয়কের গুরুত্ব

এন্টিয়ক নগরীকে তৎকালীন শাম অঞ্চল ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী বিবেচনা করা হতো। বরং এই দাবি করলে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, এন্টিয়ক ছিল সেই প্রাচীনকালে সমগ্র বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী। বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণে এন্টিয়ক অন্যান্য নগরীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। যথা—

১. আবহমান কাল ধরে এন্টিয়ক একটি কেন্দ্রীয় নগরী হিসেবে বিবেচিত হতো। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিগত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে নগরীটিকে পুরো শাম অঞ্চলের রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল।

২. এন্টিয়ক প্রথম শ্রেণির ধর্মীয় নগরী হিসেবে বিবেচিত হতো। খ্রিষ্টসমাজ নগরীটিকে বিশেষ সমীহ ও মর্যাদার নজরে দেখে থাকে। এন্টিয়ক নগরীতেই প্রথম ঈসা মাসিহের অনুসারীদের জন্য 'খ্রিষ্টান' নামটি ব্যবহৃত হয়। বাইবেলের শিষ্যচরিত অধ্যায়ে (The Acts of the Apostles) আছে—'এন্টিয়কেই অনুগামীরা প্রথম খ্রিষ্টান নামে অভিহিত হলো।'[২৮৯] অধিকন্তু এন্টিয়কেই সেন্ট পিটার (Saint Peter) তার প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯০]

৩. ইসলামি বিজয়াভিযানের একেবারে শুরুর দিকেই এন্টিয়ক বিজিত হয়। পঞ্চদশ হিজরি সনে (৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) বিশিষ্ট মুজাহিদ সাহাবি

---

২৮৯. নববিধান, শিষ্যচরিত অধ্যায়, ১১/২৬।

২৯০. মুহাম্মাদ হামিদ আন-নাসির, *আল-জিহাদ ওয়াত-তাজদীদ*, পৃষ্ঠা : ৭৯ ও Runciman, op. cit., 1, p. 213.

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর হাতে নগরীটি বিজিত হয় এবং এরপর একটানা চারশ ষাট বছর ইসলামি শাসনের অধীনে থাকে।[২৯১]

এন্টিয়ককে ইসলামি নিদর্শনসমৃদ্ধ একটি নির্ভেজাল ইসলামি নগরীতে পরিণত করার কৃতিত্ব আরেক মহান সাহাবি হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর। মুয়াবিয়া রাযি. যখন প্রত্যক্ষ করেন যে, এন্টিয়ক নগরী বারবার বাইজান্টাইন আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তখন তিনি নগরীটির অভ্যন্তরে ও আশেপাশে এলাকায় মুসলমানদেরকে বড় বড় জায়গির প্রদান করে সেখানে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। মুয়াবিয়া রাযি.-এর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দামেশক, হিমস ও লেবানন থেকে এমনকি সুদূর ইরাক অঞ্চল থেকেও মুসলমানরা এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। ফলে এন্টিয়কের নাগরিক বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী সময়ে মারআশ, তারসুস ও মালাতিয়াসহ এন্টিয়কের উত্তরে অবস্থিত বিভিন্ন নগরীতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এন্টিয়ক একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ ইসলামি নগরীতে পরিণত হয়।[২৯২]

৪. এন্টিয়ক সুপ্রাচীন ও সুমহান বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের অধিকারী একটি নগরী। এন্টিয়ক ছিল এ অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র। বরং যে সময় ইসলামি সাম্রাজ্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মাঝে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল, তখন এন্টিয়ক ছিল উভয় সাম্রাজ্যের পারস্পরিক বাণিজ্য বিনিময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।[২৯৩]

৫. এন্টিয়ক নগরীকে শাম অঞ্চলের বরং তৎকালীন পুরো বিশ্বের অন্যতম সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য নগরী বিবেচনা করা হতো।

---

২৯১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ২/৪৯৪-৯৫, ইবনে খালদুন, *আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খবার*, ২/১০৫ ও ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ১/২৬৯।

২৯২. আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-বালাযুরি, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃষ্ঠা : ১৬০।

২৯৩. Runciman, op. cit., 1, p. 213.

নিরাপত্তাব্যবস্থার দিক থেকে এন্টিয়ক তুল্য হতো প্রাচীন বিশ্বের[২৯৪] সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে।[২৯৫]

এন্টিয়কের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি ত্বরিত দৃষ্টি বোলালেই নগরীটির প্রাকৃতিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিকভাবে নগরীটিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দান করেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানবনির্মিত বিভিন্ন দুর্গ ও প্রাচীর। এন্টিয়ক নগরী দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে সুউচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমে নগরীটির সীমা ছিল আছি নদী[২৯৬] পর্যন্ত। উত্তর দিক থেকেও এন্টিয়ক নগরী বিভিন্ন জলাভূমি ও বনভূমি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাকৃতিক এই নিরাপত্তার পাশাপাশি নগরীটি সব দিক থেকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের ওপর থেকে নজরদারি এবং তীর-বর্শা ও জ্বলন্ত গোলা নিক্ষেপের জন্য ছিল তিনশ ষাটটি বুর্জ বা নিরাপত্তা চৌকি। এ ছাড়াও এন্টিয়কের অভ্যন্তরে ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি দুর্গ, যেখানে প্রবেশ করা কার্যত অসম্ভব ছিল!

৬. এন্টিয়ক নগরী এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে শাম অঞ্চলে গমন-পথের একেবারে গোড়ায় অবস্থিত ছিল।[২৯৭] এ কারণে এন্টিয়ক পতনের অর্থ ছিল শামের পথ উন্মুক্ত ও বিজিত হওয়া। তদ্রূপ প্রচুর সৈন্য ও নিরাপত্তারক্ষীতে সমৃদ্ধ এন্টিয়ক জয় না করে সামনে অগ্রসর হলে

---

[২৯৪]. ইতালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬ খ্রি.)-এর সুবিখ্যাত অভিযাত্রার পূর্বে অর্থাৎ ইউরোপীয় মধ্যযুগ ও ধ্রুপদি সভ্যতার সময়ে পৃথিবীর যেসব অঞ্চল মানুষের জ্ঞাত ছিল, সেগুলোর পারিভাষিক নাম প্রাচীন বিশ্ব (Old World)। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং তৎসংলগ্ন দ্বীপসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের আরেক নাম আফ্রো-ইউরেশিয়া। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষের কাছে এই অংশটিই ছিল পৃথিবী। আমেরিকা অঞ্চল, ওশেনিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।
অপরদিকে এর পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত দুই মহাদেশ উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জন্য আধুনিক (নতুন) বিশ্ব (New world) পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। ওশেনিয়া অঞ্চল ও অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ প্রাচীন বিশ্ব বা আধুনিক বিশ্ব কোনো পরিভাষারই অন্তর্ভুক্ত নয়। [অনুবাদক]

[২৯৫]. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 72.

[২৯৬]. উক্ত অঞ্চলের অন্যান্য নদীর বিপরীতে এ নদীটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছিল 'আছি' বা অবাধ্য নদী। ইংরেজিতে নদীটির নাম Orontes (ওরোন্টেস)। [অনুবাদক]

[২৯৭]. Chalandon: Premiere Croisade, p. 181.

নিশ্চিত ঝুঁকির মুখে পড়ার আশঙ্কা ছিল। এ কারণেই ক্রুসেডারদের জন্য এন্টিয়কে থেমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথ খোলা ছিল না।

৭. এন্টিয়ক যদিও উপকূলীয় নগরী নয়; কিন্তু তা ভূমধ্যসাগর,[২৯৮] সেন্ট সাইমন নৌবন্দর (The ports of Saint Simon) ও লাতাকিয়া (Latakia) নৌবন্দর হতে অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। ফলে খ্রিষ্টানবিশ্ব হতে সাগরপথে এন্টিয়কে রসদসামগ্রী পৌঁছানো কেবল সম্ভবই নয়; সহজতর ছিল।

৮. নাগরিক জনবিন্যাসের দিক থেকেও এন্টিয়ক ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুসলমানরা যদিও সেখানে অনেক আগেই বসতি স্থাপন করেছিল, তবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে নগরীটির বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা থাকায় সেখানে প্রচুর পরিমাণ অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ও আর্মেনীয় খ্রিষ্টান নাগরিকও বসবাস করত। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে তারা সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছিল। কখনোই সেখানে কোনো প্রকার সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা বা জাতিগত নিপীড়নের ঘটনা ঘটেনি।

৯. এন্টিয়ক নগরী ক্রুসেড অভিযান-পূর্ববর্তী নিকট অতীতে এমন কিছু পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে, যা চলমান ঘটনাপ্রবাহে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি করে। সম্রাট ২য় নিকিফোরস ফোকাস (Nikephoros II Phokas)-এর শাসনামলে ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর (৩৫৮ হিজরি সনে) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাতে এন্টিয়কের পতন ঘটে।[২৯৯] এ ঘটনা হিলাল ও ছালিব উভয় শিবিরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ, পতনের পূর্বে তিনশ বছরেরও অধিক সময় নগরীটি মুসলিম শাসনাধীন ছিল। একই সময় নগরীটি ছিল অর্থোডক্স ও ক্যাথলিক উভয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সহ ব্যাপকভাবে পুরো খ্রিষ্টান বিশ্বের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মীয় নগরী। নগরীটি জয় করার পরই বাইজান্টাইন সৈন্যরা সেখানকার প্রচুর নাগরিককে হত্যা করে, বাকিদের নগরত্যাগে বাধ্য করে। এরপর তারা সেখানে বসবাস করার

---

২৯৮. ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে এন্টিয়কের দূরত্ব ত্রিশ কিলোমিটার। [অনুবাদক]

২৯৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ২/৪৯৪-৯৫।

জন্য প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান নাগরিককে নিয়ে আসে। একাদশ শতকের অষ্টম দশক পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৬৩ হিজরি সনে (১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে) ঐতিহাসিক মানজিকার্টের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল। এরপর এন্টিয়কে ব্যাপকহারে সেলজুক ও আর্মেনীয়দের আগমন ঘটতে থাকে এবং এর ফলে এন্টিয়কের নাগরিক বিন্যাসে আবারও পরিবর্তন ঘটে। বরং এবার আর্মেনীয়রা নগরীটির সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকে পরিণত হয়। বাইজান্টাইনরা যদিও আর্মেনীয়দের প্রতি ঐতিহ্যগতভাবেই বিরাগভাজন ছিল; কিন্তু এ সময় সেলজুকদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বিপর্যস্ত বাইজান্টাইন শক্তি সেলজুকদের মোকাবিলা করার জন্য আর্মেনীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ে উদ্যোগী হয়। ফলে এন্টিয়ক অঞ্চলে আর্মেনীয়দের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একপর্যায়ে তারা ধৃষ্টতা দেখিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনতা ত্যাগ করে। ফিলারেটোস (Philaretos Brachamios) নামক জনৈক আর্মেনীয় সেনাপতি ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে (৪৬৯ হিজরি সনে) এডেসা নগরী অবরোধ করেন এবং বাইজান্টাইনদের পরাভূত করে সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে (৪৭০ হিজরি সনে) ফিলারেটোস এন্টিয়কের বাইজান্টাইন প্রশাসককে হত্যা করে সেখানেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[৩০০]

অবশ্য এন্টিয়কে আর্মেনীয় শাসন মাত্র সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে (৪৭৭ হিজরি সনে) রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সুলায়মান বিন কুতুলমিশের হাতে নগরীটির পতন ঘটে[৩০১] এবং একটানা একশ উনিশ বছরের বিচ্ছিন্নতার পর পুনরায় নগরীটিতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন করে আবারও এন্টিয়কে সেলজুক ও অন্যান্য মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানরা এবার বাইজান্টাইন মতাদর্শের অনুসারী অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ও বিগত কয়েক বছরে প্রচুর পরিমাণে বসতি স্থাপনকারী আর্মেনীয়দের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে থাকে।

---

৩০০. হামিদ গানিম আবু সাঈদ, *আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া ফী মুওয়াজাহাতিল মুখাত্তাতাতিস সালিবিয়া*, পৃষ্ঠা : ৯১।

৩০১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ১০/১৩৮-১৩৯।

এভাবে বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এন্টিয়ক পরিস্থিতি এ সময় তুলনামূলক জটিল আকার ধারণ করেছিল এবং নগরীটি একসঙ্গে তিনটি সম্প্রদায়ের বিরোধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল—সেলজুক নেতৃত্বাধীন মুসলিম জাতি, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী। এর সঙ্গে এবার নতুন করে যুক্ত হতে যাচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ থেকে আগত নতুন শক্তি—ক্রুসেডার বাহিনী!

১০. দশম ও সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্রুসেডার বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি এবং হিংস্র ও দুর্বিনীত নরম্যান নেতা বোহেমন্ডের মনমস্তিষ্কজুড়ে এন্টিয়ক একটি বিশেষ স্বপ্নরূপে বিরাজমান ছিল। বোহেমন্ড কখনোই এ বিষয়টি ভুলতে পারেননি যে, এন্টিয়ক ছিল তার পিতা ও বিখ্যাত ইতালিয়ান নরম্যান নেতা রবার্ট গোয়েসকার্ডের স্বপ্নের নগরী। আরও সতেরো বছর পূর্বে ৪৭৩ হিজরি সনে (১০৮১ খ্রিষ্টাব্দে) রবার্ট এন্টিয়ক দখলের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং স্বয়ং বোহেমন্ডই সেই বাহিনীটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বোহেমন্ড তখন সুরক্ষিত এন্টিয়কের পতন ঘটাতে ব্যর্থ হন।

এসব দস্যুর অভিধানে ব্যর্থতা অতি লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক একটি বিষয়। কারণ, তারা লুটতরাজ, দস্যুবৃত্তি ও চুরি-ডাকাতিমুক্ত জীবন কল্পনাই করতে পারে না। এ কারণেই বোহেমন্ড এন্টিয়কের কথা কখনোই ভুলতে পারেননি। তার কাছে এন্টিয়ক ছিল পুরোনো প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্র। এন্টিয়কের কর্তৃত্ব লাভের জন্য তিনি সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বোহেমন্ডের অন্তরে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ, ক্রুশ প্রতীকের প্রতি মর্যাদাবোধ এসব বিষয়ের কোনো স্থান ছিল না; আল-কুদস বা তীর্থযাত্রীদের প্রতি তার হৃদয়ে সামান্য স্পন্দনও ছিল না। যদিও তিনি বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের প্রতি বাহ্যত বদান্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু এন্টিয়ক প্রশ্নে তিনি সম্রাট বা অন্যান্য ক্রুসেডার সেনাপতি—কারোই তোয়াক্কা করতে রাজি ছিলেন না। এন্টিয়ক ছিল তার কাছে সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ইস্যু। সবকিছু বিক্রি করে হলেও তিনি এন্টিয়কের মালিকানা লাভে উন্মুখ ছিলেন।

এই দশটি কারণে এন্টিয়ক পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এন্টিয়ক পরিণত হয়েছিল সকলের লক্ষ্যবস্তুতে। আর তাই এ অঞ্চলটিকে ঘিরে বিদ্যমান সকল শক্তির মধ্যে ঘনীভূত হচ্ছিল এক কঠিন সংঘাত পরিস্থিতি।

এন্টিয়কের তৎকালীন প্রশাসক

ক্রুসেড অভিযানের অব্যবহিত পূর্বে এন্টিয়কের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ইয়াগিসিয়ান (Yağısıyan) নামক জনৈক প্রতাপশালী তুর্কমেন সেনাপতি। ইয়াগিসিয়ানের আলোচনার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একজন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তিনি অত্যুচ্চ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। অবশ্য তিনি সমুন্নত ইসলামি জীবনধারা ও নীতি-আদর্শের অধিকারী ছিলেন না। তার কোনো নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। আজ তিনি যার সঙ্গে মিত্রতা করতেন, আগামীকালই হয়তো স্বার্থের বিরোধের কারণে তার সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করতেন।[৩০২] তিনি আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে লড়াই করতেন না; লড়াই করতেন টিকে থাকার জন্য এবং আপন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। অর্থাৎ তার সবকিছু জুড়ে ছিল পার্থিব স্বার্থচিন্তা।

এ জাতীয় শাসক-প্রশাসকগণ যতই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামরিক দক্ষতার অধিকারী হন না কেন, উম্মাহর কল্যাণে এবং জাতির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রক্ষায় তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। আর তাই তাদের স্খলন ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে পতন ঘটে তাদের অনুসারী জনগণের, পতন ঘটে তাদের শাসনাধীন নগর, জনপদ ও রাষ্ট্রের। প্রকৃত অর্থে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির নুসরত ও বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আর আল্লাহ তাকেই বিজয় দান করেন, যে আল্লাহকে সহায়তা করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

> তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন। [সুরা মুহাম্মাদ : ০৭]

৩০২. আলি ছাল্লাবি, *দাওলাতুস সালাজিকা*, পৃষ্ঠা : ৪৬৯।

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ﴾

বিজয় তো অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়; কেবল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে লাভ হয়, যিনি ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার মালিক।

[সুরা আলে-ইমরান : ১২৬]

আল্লাহর দ্বীনের সহায়তা-চিন্তা যাদের মানসপটে থাকে না, তারা যদি যুগের পর যুগ ক্ষমতার গদি কুক্ষিগত করে রাখে, সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করে এবং নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কক্ষনো সহায়তা করবেন না।

আমরা যদি ইয়াগিসিয়ানের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তাহলে একদিকে যেমন তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারব, অপরদিকে এর মধ্য দিয়ে এন্টিয়ক অবরোধের পটভূমিও যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

ইয়াগিসিয়ান ছিলেন বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সুলতান মালিকশাহ বিন আলপ আরসালানের অন্যতম সুদক্ষ সেনাপতি। ৪৬৪ হিজরি হতে ৪৮৫ হিজরি (১০৭২-১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত পারস্য, ইরাক ও শাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালিকশাহর ভাই তুতুশ বিন আলপ আরসালান তখন শাম শাসন করতেন। দীর্ঘ একশ উনিশ বছর পর যিনি এন্টিয়ককে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, সেই রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের অধিপতি সুলায়মান বিন কুতুলমিশের সঙ্গে তুতুশের যুদ্ধ সংঘটিত হলে এন্টিয়ক পুনরুদ্ধারের পরের বছরই ৪৭৮ হিজরি সনে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুলায়মান নিহত হন। এন্টিয়ক চলে যায় তুতুশের দখলে।[৩০৩] তবে ৪৭৯ হিজরি সনে (১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) মালিকশাহ তার ভাইয়ের কাছ থেকে এন্টিয়ক কেড়ে নেন এবং ইয়াগিসিয়ানকে নগরীটির প্রশাসনদায়িত্ব প্রদান করেন।[৩০৪] এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তুতুশ ইয়াগিসিয়ানের প্রতি

---

৩০৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৬/৩০০।

৩০৪. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/১৯।

ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তবে ভাই মালিকশাহর সুবিস্তৃত ক্ষমতা ও প্রবল কর্তৃত্বের কারণে তুতুশ ইয়াগিসিয়ানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি।

ইয়াগিসিয়ান এন্টিয়কের দায়িত্ব গ্রহণের পাঁচ বছর পর ৪৮৪ হিজরি সনে (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে) মালিকশাহ ইন্তেকাল করলে স্বাভাবিকভাবেই তুতুশ ও ইয়াগিসিয়ানের মধ্যে এন্টিয়কের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রচণ্ড সংঘাত সৃষ্টি হওয়া প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ইয়াগিসিয়ান এ সময় আপন কূটনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে তুতুশের আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম হন এবং তুতুশ ইয়াগিসিয়ানকে এন্টিয়ক অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে মেনে নেন। ইয়াগিসিয়ানের উদ্যোগে এরপর থেকে এন্টিয়কে জুমার খুতবায় তুতুশের নাম উচ্চারিত হতে থাকে।[৩০৫] ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) তুতুশ তার ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুক বিন মালিকশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ালে ইয়াগিসিয়ান তুতুশের পক্ষে যুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে ইয়াগিসিয়ান হতোদ্যম হয়ে সরে পড়লে তুতুশ পরাজিত ও নিহত হন।[৩০৬] তুতুশের মৃত্যুর ফলে ইয়াগিসিয়ান পুনরায় এন্টিয়কের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হন। ওদিকে তুতুশের শামকেন্দ্রিক সেলজুক রাষ্ট্র তার দুই পুত্রের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। রিজওয়ান বিন তুতুশ গ্রহণ করেন আলেপ্পোর দায়িত্ব আর দাক্কাক বিন তুতুশ গ্রহণ করেন দামেশকের দায়িত্ব।[৩০৭]

যেন তৎকালীন রীতি মেনেই এরপর রাজ্যবিস্তৃতি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা নিয়ে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। রিজওয়ান ও দাক্কাক উভয়ে নিজ শাসনাধীন অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী নগর-জনপদ দখল করার অভিলাষী হয়ে ওঠেন। আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ান নিকটবর্তী এন্টিয়ক নগরী দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলে তার সঙ্গে ইয়াগিসিয়ানের বিরোধ ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে ইয়াগিসিয়ান রিজওয়ানকে পরাজিত করে এন্টিয়কে নিজ কর্তৃত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হন। এরপর ৪৮৯ হিজরি সনে (১০৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) দুই ভাই রিজওয়ান ও দাক্কাকের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিস্ময়ের বিষয়—ইয়াগিসিয়ান এবার রিজওয়ানের পক্ষ অবলম্বন

---

৩০৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১০৮।

৩০৬. প্রাগুক্ত, ৩/১১১।

৩০৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ১০/১৪৪-৪৫ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১২০।

করেন! ইয়াগিসিয়ানের সহায়তায় রিজওয়ান দাক্কাকের কাছ থেকে দামেশকের অধিকার কেড়ে নিতে চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।[৩০৮] কিছুদিন পর দাক্কাক রিজওয়ানের কাছ থেকে আলেপ্পোর অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে ইয়াগিসিয়ান এবার রিজওয়ানের বিপক্ষে দাক্কাকের পক্ষে যুদ্ধ করেন! অবশ্য দাক্কাক-ইয়াগিসিয়ান সম্মিলিত বাহিনীও আলেপ্পো জয় করতে ব্যর্থ হয়।[৩০৯]

ইয়াগিসিয়ান মূলত সেসব ভাড়াটে সৈন্যের মতো জীবন কাটাতেন, যারা এক-দুই পয়সা কামাই করার আশায় কোনো বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করে; এরপর প্রতিপক্ষ যদি দুই পয়সার জায়গায় চার পয়সা প্রদানের আশ্বাস দেয়, তাহলে দল পাল্টে তাদের পক্ষেই ভিড়ে যায় এবং ভুলে যায় প্রথম দলের সঙ্গে মিত্রতা ও তাদের নিমকভোগের কথা!

এসব ঘটনা আমাদের সামনে কেবল এন্টিয়ক প্রশাসক ইয়াগিসিয়ানের চরিত্রই তুলে ধরে না; বরং সামগ্রিকভাবে সে যুগের শাসকগণের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কেও ব্যাপক ও বিস্তৃত ধারণা প্রদান করে। আমরা উপলব্ধি করতে পারি—ক্রুসেডার বাহিনী যখন ইসলামি প্রাচ্যে আগ্রাসন চালাচ্ছিল, তখন কারা ছিল শাম অঞ্চলের বিভিন্ন নগরীর প্রশাসক।

তবে সমস্যা কেবল শাসক-প্রশাসকদেরই ছিল না। শাসকগণ তো একা একা যুদ্ধ করেন না। তারা যুদ্ধ করেন নিজ নিজ বাহিনী ও সৈন্যদের নিয়ে আর সৈন্যদের পেছনেই সমর্থন জোগাতে থাকে সাধারণ জনগণ। যে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন সেনাদল পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর থাকে এবং যে বিবেকশূন্য জনসাধারণ থাকে চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে উদাসীন, তারা প্রকৃতপক্ষে এমন দুর্যোগ ও সংকটেরই উপযুক্ত।

১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে (৪৯০ হিজরি সনে) ক্রুসেডার বাহিনী এন্টিয়কে পৌঁছানোর পূর্বের দশ বছর ধরে ইয়াগিসিয়ানই ছিলেন এন্টিয়কের প্রশাসক। এন্টিয়কের সবচেয়ে নিকটবর্তী ইসলামি নগরী ছিল আলেপ্পো। ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনী যখন প্রবল বিক্রমে এন্টিয়ক অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, ইয়াগিসিয়ান তখন সম্পূর্ণই নিঃসঙ্গ ও মিত্রহারা! আলেপ্পোর প্রশাসকের সঙ্গে তো চলছিল চরম বিরোধ ও সংঘাত;

---

৩০৮. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩২।

৩০৯. আবুল ফিদা, *আল-মুখতাসার ফী তারীখিল বাশার হাওয়াদিছু সানাতা ৪৯১ হি.*।

আশেপাশের অন্যান্য নগরীর সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট দুর্বল ও সম্পূর্ণই পার্থিব স্বার্থনির্ভর।

ওদিকে ক্রুসেডাররা আসছে অস্ত্রবল ও জনবলে বলীয়ান হয়ে। এন্টিয়কে পৌঁছে তারা নগরীটিকে ঘিরে কঠিন অবরোধ আরোপ করে।

বোহেমন্ডের চতুরতা

বোহেমন্ডের নেতৃত্বে ইতালিয়ান নরম্যান বাহিনী এন্টিয়ক নগরীর উত্তর প্রান্তে পল (Saint Paul's gate) নামক ফটকের কাছে অবস্থান গ্রহণ করে। গডফ্রের বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে উত্তর-পশ্চিম দিকে ডিউক (Duke's gate) ফটকের কাছে। আর রবার্ট, স্টিভেন, হিউ ও ৪র্থ রেমন্ডের নেতৃত্বাধীন অন্যান্য সৈন্য অবস্থান গ্রহণ করে পশ্চিম দিকে ডগ (The dog's gate) ফটকের সামনে।[৩১০] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে নগরীটি সুউচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাই এই দুই দিকে কোনো সৈন্যদল অবস্থান গ্রহণ করেনি।[৩১১]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভিজ্ঞ সেনাপতি ট্যাটিকিয়াসের নেতৃত্বে বাইজান্টাইন বাহিনীর একটি অংশও অবরোধে অংশ নিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল এন্টিয়কের পতনের পর সেখানে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিকার ও স্বার্থ নিশ্চিত করা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এন্টিয়কে প্রচুর পরিমাণ অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ও আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করত। ল্যাটিন বর্ণনানুসারে ক্রুসেডার বাহিনী উপস্থিত হতেই এসব খ্রিষ্টান নাগরিক নগরী থেকে বেরিয়ে আসে এবং ক্রুসেডারদের প্রচেষ্টা সহজসাধ্য করার জন্য নগরীর ভেতর-বাইরের বিভিন্ন গোপন তথ্য, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, রসদ ও সৈন্যের পরিমাণসহ বিভিন্ন তথ্য ক্রুসেডারদের কাছে সরবরাহ করে।[৩১২]

ইয়াগিসিয়ান এ জাতীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যথেষ্ট পরিমাণ রসদ প্রস্তুত রেখেছিলেন।[৩১৩] ক্রুসেডাররাও আসার পথে বিভিন্ন জনপদে

---

৩১০. Guillaman de tyr 1. pp.174-175.

৩১১. ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ভুক্তিঃ আন্তাকিয়া।

৩১২. Gesta Francorum, p. 69.

৩১৩. Runciman, op. cit., 1, p. 215.

লুটপাট চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ রসদপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।[৩১৪] এ ছাড়াও এন্টিয়কের অতি নিকটে ওরোন্টেস নদীর মোহনায় অবস্থিত সেন্ট সাইমন নৌবন্দরে ইতিমধ্যে ক্রুসেডারদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়ে ইতালির জেনোভা থেকে একটি নৌবহর এসে পৌঁছেছিল।[৩১৫]

ওদিকে এন্টিয়কের নিকটবর্তী আরেক নৌবন্দর লাতাকিয়া তখন ছিল বোলোনিয়ান (Boulogne-Billancourt) দস্যু ওয়েনমারের দখলে।[৩১৬] সেও ক্রুসেডারদের প্রয়োজনীয় রসদপত্র দিয়ে সহায়তা করত।

অবরোধ শুরু করার পরই ক্রুসেডাররা এন্টিয়কগামী সকল পথ বন্ধ করে দেয় এবং পশ্চিমের নৌবন্দরগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে অবরুদ্ধ মুসলমানদের জন্য নগরীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসামগ্রী ব্যতীত বাইরে থেকে কোনো সাহায্যপ্রাপ্তির সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

এন্টিয়কে অবরুদ্ধ ইয়াগিসিয়ান পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন ইসলামি নগরীর প্রশাসক ও নেতৃবৃন্দের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন। যেহেতু তিনি কিছুদিন পূর্বেই আলেপ্পোর শাসনকর্তা রিজওয়ানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এবং তার মিত্রতা পরিত্যাগ করে দাক্কাকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই রিজওয়ানের কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো পথ ইয়াগিসিয়ানের সামনে খোলা ছিল না। বাধ্য হয়ে ইয়াগিসিয়ান দামেশকের অধিপতি দাক্কাক ও হিমসের শাসনকর্তা জানাহুদ্দৌলার কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন। অথচ দামেশক ও হিমস এন্টিয়ক থেকে একশ চল্লিশ কিলোমিটারেরও অধিক দূরত্বে অবস্থিত। এমনকি তিনি সাতশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মসুলের প্রশাসক কারবুগার কাছেও সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন; সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন অনেক অনেক দূরে অবস্থিত পারসিক সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা সুলতান বারকিয়ারুকের কাছেও।[৩১৭] কিন্তু এন্টিয়ক থেকে ষাট কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে অবস্থিত আলেপ্পোর শাসনকর্তা রিজওয়ানের

---

৩১৪. Raymond d' Agueiler, in peters, pp. 160.ff; William of Tyre, 1, pp. 204-220; Hagenmeyer, "Chronologie", pp. 514-516, 529-530.

৩১৫. Raymond d' Agiles (Hist. Occid, LII), p. 242 & Carfo (Hist., Occid V), p. 50.

৩১৬. Heyd: Hist. du Commerce, 1, p. 133.

৩১৭. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৪।

কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো সুযোগ ইয়াগিসিয়ানের ছিল না!

অবরোধ চলতে থাকে। অতিবাহিত হতে থাকে কঠিন ও ক্লান্তিকর একেকটি দিন। অবরুদ্ধ নগরীতে বাইরে থেকে কোনো সহায়তা না পৌঁছতে পারায় মুসলমানদের অবস্থা যেমন সংকটাপন্ন ছিল, তেমনই ক্রুসেডাররাও সুস্পষ্ট সংকটের মাঝে দিনাতিপাত করছিল। কারণ, বিশাল ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য এই সীমিত অঞ্চলে পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট পরিমাণ রসদসামগ্রী ছিল না। আবার রসদ সংগ্রহের জন্য তাদের পক্ষে এন্টিয়ক থেকে বেশি দূরে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ, সেক্ষেত্রে অবরোধ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং অবরুদ্ধ মুসলমানরা বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। একবার ক্রুসেডার বাহিনীর কিছু সদস্য পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জনপদে হামলা ও লুটতরাজ চালানোর উদ্দেশ্যে এন্টিয়ক থেকে দূরে সরে পড়লে ইয়াগিসিয়ান অন্যদের ওপর হামলা চালান এবং বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। কিন্তু বোহেমন্ড তার সামরিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অন্যরা ফিরে আসা পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন।[৩১৮]

এভাবে অবরোধকারী ও অবরুদ্ধ উভয় পক্ষেরই কঠিন সময় অতিবাহিত হতে থাকে। বরং ক্রুসেডারদেরই বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল। এ বিষয়টিও বিশেষত লক্ষণীয় যে, অবরোধ শুরু হয় ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর। তখন যেহেতু শীতের মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই ক্রুসেডার বাহিনীকে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করার পাশাপাশি উন্মুক্ত প্রান্তরে শীতের কষ্টও ভোগ করতে হচ্ছিল।

অবরোধের দুই মাসেরও অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দামেশক থেকে সেলজুক সুলতান দাক্কাকের নেতৃত্বে এবং হিমস থেকে জানাহুদ্দৌলা হুসাইন মালাইবের নেতৃত্বে সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছায়। আগত বাহিনী ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ দিকে এন্টিয়কের দক্ষিণাঞ্চলে বারা[৩১৯] নামক এলাকায় খাদ্যজোগানের সন্ধানে বের হওয়া ক্রুসেডার বাহিনীর মুখোমুখি হয়।[৩২০] যুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত না হলেও

---

৩১৮. Idem. P. 202.

৩১৯. বারা : শামের ইদলিব প্রদেশের আরিহা অঞ্চলের একটি জনপদ। বারা এলাকায় প্রাচীন একটি দুর্গ আছে, যার ভগ্নাবশেষ এখনো তার বিশালতার সাক্ষ্য বহন করে। মুজামুল বুলদান।

৩২০. Setevenson: op. cit., p. 26.

মুসলিম বাহিনীর সুস্পষ্ট প্রাধান্য প্রতিভাত হচ্ছিল।[৩২১] কিন্তু হঠাৎ করেই দাক্কাক দামেশকে ফিরে নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নতুন করে পরিস্থিতি বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেন! এ সময় ক্রুসেডাররাও বার্তা পাঠিয়ে তাকে প্রভাবিত করে। ক্রুসেডাররা বার্তায় উল্লেখ করে যে, তারা এ অঞ্চলে এসেছে এডেসা ও এন্টিয়কসহ উত্তরের কেবল সেসব নগরী পুনরুদ্ধার করতে, যেগুলো ইতিপূর্বে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন ছিল। দামেশক যদি তাদের সঙ্গে বিরোধে না জড়ায়, তাহলে তাদের দামেশক নিয়ে কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা নেই। ক্রুসেডারদের অম্ল-মধুর বার্তায় 'আশ্বস্ত' হয়ে দাক্কাক দামেশকে ফিরে যান আর এন্টিয়ককে রেখে যান আপন পরিণতি বরণের অপেক্ষায়![৩২২]

দাক্কাকের লাঞ্ছনাকর প্রস্থানে পরিস্থিতি আবারও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু নতুন খ্রিষ্টাব্দ ও জানুয়ারি মাস শুরু হতেই প্রচণ্ড শীত ও রসদ-স্বল্পতার কারণে ক্রুসেডার শিবির প্রচণ্ড সংকটের মুখোমুখি হয়। সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়, জনেজনে ক্ষোভের আওয়াজ ঘনীভূত হয়, এমনকি অবরোধ প্রত্যাহারের দাবিও ওঠে। ক্রুসেডারদের জন্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বাহিনীর সদস্যগণ অবরোধ ছেড়ে এ অঞ্চল থেকে পালাতে শুরু করে। আকস্মিকভাবে এই পলায়নকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন ধর্মযাজক পিটার, যিনি ইতিপূর্বে ফ্রান্স থেকে স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন! এর মাধ্যমে এ দাবি আরও দৃঢ়তা লাভ করে যে, তার চিন্তা-ভাবনায় মোটেও ধর্মীয় চেতনাবোধ বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য বোহেমন্ডের ভাগ্নে টেনক্রেড পিটারের পিছু নেন এবং কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হওয়া পিটারের নাগাল পেয়ে তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করেন।[৩২৩] পিটার লাঞ্ছনাকর ও কলঙ্কজনক অবস্থায় এন্টিয়কে ফিরে আসেন। এর মাধ্যমে ক্রুসেড অভিযানের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

নরম্যান সেনাপতি বোহেমন্ড এ সবকিছুর ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি পরিস্থিতির প্রতিটি পরিবর্তন ও বাঁককে নিজের স্বার্থে এবং এন্টিয়কের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে

---

৩২১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩২।

৩২২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫।

৩২৩. Gesta Francorum, pp. 77-79.

সচেষ্ট ছিলেন। তিনি জানতেন যে, এন্টিয়কের কর্তৃত্ব নিয়ে শীঘ্রই ক্রুসেডার বাহিনীর অন্য সেনাপতিগণ তার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়বে। অধিকন্তু তার বন্ধু বাইজান্টাইন সম্রাটও তাকে এন্টিয়কে কর্তৃত্ব বিস্তার করার সুযোগ দিতে রাজি হবেন না।[৩২৪] কারণ, এন্টিয়ক এ অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত নগরী। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে বোহেমন্ড কী করবেন?!

বোহেমন্ড ছিলেন চূড়ান্ত স্তরের চাতুর্য ও প্রতারণা-গুণের অধিকারী!

অবরোধের এই কঠিনতর পরিস্থিতিতে এসে বোহেমন্ড ঘোষণা করেন—তার পক্ষে আর অভিযান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইতালিতে নিজ রাজ্যে অনিবার্য কিছু ব্যস্ততা ও বাধ্যবাধকতা থাকায় তিনি অচিরেই তার বাহিনীকে নিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে ইতালিতে ফিরে যাবেন।[৩২৫]

নিঃসন্দেহে তার এ ঘোষণা ছিল ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য এক বিরাট আঘাত! কারণ, সকলে জানত—সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর মধ্যে বোহেমন্ডের বাহিনীই সবচেয়ে শক্তিশালী আর সেনাপতি বোহেমন্ডও সম্ভবত রণদক্ষতা, সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যুদ্ধক্ষেত্রে অটল-অবিচল থাকার বিবেচনায় বাহিনীর শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি। আর তাই বোহেমন্ডের ইতালিতে ফিরে যাওয়ার অর্থ ক্রুসেড অভিযানই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া, অর্জিত ও প্রত্যাশিত সকল সাফল্য হারিয়ে যাওয়া এবং এ পর্যন্ত ব্যয় হওয়া জান-মাল ও সময় সবকিছু বিনষ্ট হওয়া।

নিঃসন্দেহে বোহেমন্ডের এই হুমকি ক্রুসেডারদের জন্য ছিল এক চরম দুর্যোগ। ধূর্ত ও প্রতারক সেনাপতি বোহেমন্ড ক্রুসেডার বাহিনীতে নিজের মূল্য সম্পর্কে জানতেন। মুখে যদিও তিনি ফিরে যাওয়ার কথা বলছিলেন; কিন্তু তার মানসপটে মোটেও প্রত্যাবর্তনের চিন্তা ছিল না। তিনি তো এ অঞ্চলে 'প্রভু মাসিহ'-এর সহায়তা কিংবা তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগমন করেননি; আগমন করেননি বাইজান্টাইন সম্রাটের মিত্রতার দাবিতেও; তিনি এসেছেন এন্টিয়কের জন্য; শুধুই এন্টিয়কের অধিপতি হওয়ার জন্য। সুতরাং তার এই অবস্থান ছিল নিছক একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চালমাত্র। স্বীকার করতেই হবে, রাজনীতির খেলার

---

[৩২৪]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

[৩২৫]. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 70.

ময়দানে বোহেমন্ড পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করছিলেন।

বোহেমন্ডের ঘোষণা শুনে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের অন্তরে ভীতি ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। সকলে একত্র হয়ে তাকে তাদের সঙ্গ প্রত্যাহার না করার অনুরোধ করে। এরপর সকলে একমত হয় যে, এন্টিয়কের পতন হলেই তারা সকলে কোনো প্রকার অংশীদারিত্বের দাবি না তুলে এন্টিয়কের পূর্ণ কর্তৃত্ব বোহেমন্ডের হাতে তুলে দেবে! লক্ষ্য বাস্তবায়ন হওয়ায় বোহেমন্ড এবার তাদের অনুরোধ মেনে নিয়ে আপাতত 'ত্যাগ' স্বীকার করার এবং তাদের সঙ্গে থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন!

এভাবে বোহেমন্ড ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাপতিদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।[৩২৬]

কিন্তু এখনো একটি সমস্যা রয়ে গেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ট্যাটিকিয়াসের নেতৃত্বে বাইজান্টাইন বাহিনীর একটি অংশও এন্টিয়ক অবরোধে শরিক ছিল। অধিকন্তু অন্যান্য ক্রুসেডার নেতার সঙ্গে বোহেমন্ডও কনস্টান্টিনোপল চুক্তিতে শরিক ছিল, যাতে এন্টিয়ক নগরী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়ার শর্তের পাশাপাশি বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্য ও বশ্যতার শপথও নেওয়া হয়েছিল।[৩২৭]

এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?!

বোহেমন্ড এবার বাইজান্টাইন সেনাপতি ট্যাটিকিয়াসকে উত্তেজিত করতে শুরু করেন। তিনি অবরোধে কোনো ধরনের বাইজান্টাইন সহায়তার উপস্থিতি অস্বীকার করেন। বরং এর পরপরই তিনি অতি মারাত্মক ও কঠিন এক চাল চালেন। তিনি প্রচার করতে থাকেন যে, ট্যাটিকিয়াস গোপনে মুসলিম তুর্কিদের সঙ্গে আঁতাত করে ক্রুসেডারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

ইতিপূর্বে নিকিয়া পতনের সময়ও বাইজান্টাইনরা বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল। এখনো যে তা ঘটছে না, তার নিশ্চয়তা কী?!

বোহেমন্ডের এই অপপ্রচারে ট্যাটিকিয়াস উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি অন্যান্য সেনাপতির কাছে গিয়ে বোহেমন্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ

---

৩২৬. রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ১/৩১৬-১৭।

৩২৭. Chalandon: Alexis Comnene, p. 201. & Premiere Croisade, p. 193; Brehier: op. cit., p. 213.

জানান। কিন্তু তারাও তো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের আনুগত্য ও দায়ভার থেকে নিষ্কৃতির সুযোগ তালাশ করছিল। তারা তাকে সাফ জানিয়ে দেয় যে, তাদের সংকটের সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ্য কোনো সহায়তা করেনি। সুতরাং এখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের আনুগত্যের জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলার সময় হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে ক্রুসেডাররা তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা সামনে আর চুক্তির দাবি মেনে চলবে না। এতক্ষণে ট্যাটিকিয়াস নিজের নাজুক অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। রাতের অন্ধকারে তিনি সেন্ট সাইমন বন্দর হয়ে সাইপ্রাসের উদ্দেশে পালিয়ে যান।[৩২৮]

এভাবে বোহেমন্ডের দ্বিতীয় সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় এবং অন্তত এন্টিয়ক পতনের সময়ে হলেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে ময়দান থেকে দূরে রাখার লক্ষ্য বাস্তবায়ন হয়। এখন বোহেমন্ড নিশ্চিত যে, এন্টিয়কের পতন ঘটলে এন্টিয়ক একান্ত তারই হবে, অন্য কারও নয়। এবার শুধু ধৈর্য ধরে শিকার মুঠোয় পুরে নেওয়ার অপেক্ষা!

বোহেমন্ড নতুন করে ক্রুসেডার বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন এবং বিভিন্ন অংশকে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য ও রসদ সংগ্রহে প্রেরণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি ক্রুসেডার বাহিনীর সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যদের অন্তরে বীরত্ব ও উদ্দীপনা জাগাতে শুরু করেন।[৩২৯]

উবায়দি প্রতিনিধিদল

এরই মাঝে ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (৪৯১ হিজরি সনে) এমন এক ঘটনা ঘটে, যা চলমান পরিস্থিতিকে অনেকটা বদলে দেয় এবং ক্রুসেড শিবিরে দৃশ্যমান শক্তি বৃদ্ধি করে। এ সময় মিশর থেকে একটি প্রতিনিধিদল যৌথ স্বার্থ নিশ্চিত করতে ক্রুসেডারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও সমঝোতার জন্য আগমন করে!

মিশরে তখন ফাতিমি নামে প্রসিদ্ধ উবায়দিদের শাসন চলছিল। আমরা পূর্বে যেমন বলে এসেছি—তারা ছিল শিয়া ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সুন্নি সেলজুকদের সঙ্গে শিয়া উবায়দিদের ব্যাপক বিরোধ ছিল।

---

৩২৮. Setton: op. cit., pp. 313-314; Runciman, op. cit., 1, p. 224.

৩২৯. Michaud: op. cit., 1, p. 304.

একইভাবে উবায়দিরা সুন্নি আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গেও বিরোধ জিইয়ে রেখেছিল। আর তাই উবায়দিরা এ সময় সুন্নি সেলজুকদের দমন করার জন্য ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ের পরিকল্পনা করে! তৎকালীন উবায়দি সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন মুসতালি বিল্লাহ। তবে তখন চলছিল উবায়দি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় স্তর তথা উজিরদের অবাধ কর্তৃত্বের যুগ। ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি ছিল উজির আফজাল বিন বদর আল-জামালির হাতে।

উবায়দি প্রতিনিধিদল ক্রুসেডারদের শাম অঞ্চলে পারস্পরিক বণ্টননীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। তাদের প্রস্তাব ছিল—এন্টিয়ক ও উত্তরের নগরীগুলো ক্রুসেডাররা লাভ করবে আর বাইতুল মুকাদ্দাসে থাকবে উবায়দিদের কর্তৃত্ব। কদিন পূর্বেই উবায়দিরা বাইতুল মুকাদ্দাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। ৪৯১ হিজরি সনে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) সেলজুকরা যখন এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, তখন সুযোগ কাজে লাগিয়ে উবায়দিরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নিয়েছিল।[৩৩০]

নিঃসন্দেহে উবায়দি প্রতিনিধিদলের আগমন ছিল ক্রুসেড শিবিরের জন্য অনেক বড় এক সুসংবাদ; বিপরীতে তা ছিল মুসলিম উম্মাহর বুকে বরং পৃষ্ঠদেশে এক প্রচণ্ড ছুরিকাঘাত! এর নেতিবাচক প্রভাব ছিল কল্পনারও ঊর্ধ্বে। যেমন :

১. উবায়দি প্রতিনিধিদলের আগমনের ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর মনোবল ও আত্মবিশ্বাস অনেক গুণ বেড়ে যায়। কারণ, তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তাদের প্রতিপক্ষ পারস্পরিক হানাহানিতে ভগ্নপ্রায় এক জাতি। তারা লড়ছে এমন এক জাতির সঙ্গে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য সম্পদ ও ভূখণ্ড। তারা নিজেরা একে অপরকে বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত আছে; এমনকি ক্রেতা পরম শত্রু ক্রুসেডাররা হলেও!

২. উবায়দিদের এই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে সুন্নি সেলজুকদের বিভক্তি ও অস্থিরতার কারণে পরিণত হয়। উত্তর দিক থেকে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন আর দক্ষিণ দিক থেকে শিয়া উবায়দিদের আক্রমণ—একই সঙ্গে দুই শত্রুর মোকাবিলা করার চিন্তা সেলজুকদের ভীষণ

---

৩৩০. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

উদ্বিগ্ন করে তোলে।

৩. ক্রুসেডাররা আপাতত মিশরের দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। মিশর ছিল বিরাট সামরিক শক্তির অধিকারী। কেবল প্রচুর দক্ষ জনবলই নয়; মিশরের ছিল শক্তিশালী নৌবহর। যদি মিশরের সামরিক শক্তি নিষ্ঠাবান মুসলমানদের হাতে থাকত, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তা ব্যবহার করে এন্টিয়কের পরিস্থিতি পাল্টে দেওয়া যেত।

৪. এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, উবায়দি প্রতিনিধিদলের আগমন ছিল প্রকারান্তরে ইসলামি ভূখণ্ডের ওপর এই নতুন ক্রুসেড কাঠামোর অধিকারকে মিশর কর্তৃক স্বীকৃতিদান এবং এই স্বীকারোক্তি যে, ক্রুসেডাররা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এন্টিয়ক ভূমির বৈধ হকদার।[৩৩১] আর তাই ভবিষ্যতে মুসলমানদের এই ভূখণ্ড দাবি করার কোনো অধিকার নেই। কারণ, মুসলমানরা তো বাইতুল মুকাদ্দাসের বিনিময়ে এই ভূখণ্ড ক্রুসেডারদের দিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন পর মানুষ ভুলেই যাবে যে, এটি কোনো বিনিময় চুক্তি নয়; বরং উভয় ভূখণ্ডই মুসলমানদের ছিল!

নিঃসন্দেহে মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের এই পদক্ষেপ ছিল সর্ব বিবেচনায়ই সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা!

ক্রুসেডাররা মনেপ্রাণে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের বিষয়ে পূর্ণ সংকল্পবদ্ধ থাকলেও বাহ্যিকভাবে উবায়দি প্রতিনিধিদলকে সাদরে স্বাগত জানায় এবং সর্বত্র প্রকাশ্যে এই চুক্তির কথা ঘোষণা করতে থাকে। মূলত তারা এ প্রস্তাব সীমিত সময়ের জন্য গ্রহণ করেছিল।[৩৩২] ইতিপূর্বে তারা যেমন বাইজান্টাইন সম্রাটকে প্রদত্ত অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়েছিল, ভবিষ্যতে ভুলে যাবে উবায়দিদের প্রদত্ত অঙ্গীকারের কথাও! তাদের পরিভাষায় এরই নাম 'রাজনীতি'। যদিও এ ধরনের ছেলে-ভোলানো রাজনীতি কেবল নির্বোধ ও সরল ক্রেতাদের সঙ্গেই কাজে লাগে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তখনকার বেশিরভাগ মুসলিম নেতা এই দুই গুণের কোনো একটি বা যুগপৎ উভয়টির অধিকারী ছিল!

---

৩৩১. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৬৩।

৩৩২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪১৮।

যাই হোক, এন্টিয়ক অবরোধ চলাকালে এই ছিল শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্যের অবস্থান।

সহায়তাকারী বাহিনীর পরাজয়

এন্টিয়ক অবরোধের সময় আলেপ্পোর প্রশাসক রিজওয়ান বিন তুতুশের অবস্থান ও ভূমিকা কী ছিল?!

তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ইয়াগিসিয়ানের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল; কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, এন্টিয়ক তার নিজস্ব সম্পত্তি,[৩৩৩] যা ইয়াগিসিয়ান জবরদখল করে রেখেছেন। তাই তার বিবেচনায় ক্রুসেডারদের অবরোধ প্রচেষ্টা ছিল তার নিজের সম্পদই ক্রুসেডারদের জবরদখল করার অপচেষ্টা। তা ছাড়া ক্রুসেডারদের অবস্থান তখন আলেপ্পোর খুবই নিকটে। এন্টিয়কের পতন ঘটাতে পারলে তারা নিশ্চিতভাবেই আলেপ্পো অভিমুখে অগ্রসর হবে। আর তাই ইয়াগিসিয়ান যখন দাক্কাক ও অন্যদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রিজওয়ানের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তখন রিজওয়ান এ সুযোগকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত সৈন্যসমাবেশ ঘটান। অভিযানে তার সঙ্গে হামার প্রশাসক ও দিয়ারে বকর অঞ্চলের কিছু সৈন্যও যোগ দেয়।[৩৩৪] সকলে মিলে এন্টিয়ক হতে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে হারিম এলাকায় সমবেত হয়।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তারা ইসলাম ও ইসলামি ভূখণ্ডের হেফাজত কিংবা মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে বের হয়নি!

তারা বের হয়েছে নিজ নিজ ভূখণ্ড রক্ষার জন্য কিংবা চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য!

স্বভাবতই এ জাতীয় বাহিনী আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য লাভ করে না।

রিজওয়ান ও ইয়াগিসিয়ানের মধ্যে চুক্তি হয় যে, উভয়ে একই সময়ে একযোগে হারিম ও এন্টিয়ক থেকে ক্রুসেডারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম দু-দিক থেকে ক্রুসেডাররা দুই দলের মাঝে ফাঁদে আটকা পড়বে।[৩৩৫]

---

৩৩৩. Setton: op. cit., 1, p. 315.

৩৩৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১২৯।

৩৩৫. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 86.

পরিকল্পনা ছিল খুবই সুদৃঢ়; কিন্তু পরিকল্পনাকারীদের দেহ-মন যে অসুস্থ ও জরাগ্রস্ত!

আলেপ্পোর খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে এই পরিকল্পনার সংবাদ ক্রুসেড শিবিরে পৌঁছে যায়।(৩৩৬) তখন বোহেমন্ড মূল ক্রুসেডার বাহিনীকে এন্টিয়ক অবরোধে ব্যস্ত রেখে নিজে মাত্র সাতশ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বের হয়ে আসেন। এরপর তিনি এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই এন্টিয়ক হতে পূর্ব দিকে অবস্থিত আমিক হ্রদের (Lake Amik/the Lake of Antioch) কাছে আলেপ্পো, হামা ও দিয়ারে বকরের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হন।(৩৩৭) অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, প্রতিপক্ষের তুলনায় সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও রিজওয়ানের বাহিনী প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। সাতশ সৈন্যের ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই বোহেমন্ড দ্রুত পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। রিজওয়ানের বাহিনীর সৈন্যরা তখন পালাতে শুরু করে।(৩৩৮) ক্রুসেডারদের আক্রমণে প্রচুর মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। বোহেমন্ড তাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বর্শার শীর্ষদেশে গেঁথে নিয়ে দ্রুত এন্টিয়কে ফিরে আসেন।

এদিকে বোহেমন্ড যখন রিজওয়ানের বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য এন্টিয়ক থেকে দূরে সরে পড়েছিলেন, ইয়াগিসিয়ান তখন ক্রুসেডারদের ওপর হামলা করার লক্ষ্যে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয়—তিনিও পরাজিত হয়ে দ্রুত নিজ দুর্গে ঢুকে পড়েন। এরপর বোহেমন্ড ফিরে এসে কর্তিত মস্তকগুলো এন্টিয়কের নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করেন। এটি ছিল তার পক্ষ থেকে ইয়াগিসিয়ান ও এন্টিয়কবাসী মুসলমানদের প্রতি হুমকি-বার্তা।(৩৩৯)

এন্টিয়কের অবরোধ চলতে থাকে। মুসলমানদের ওপর চাপ আরও বৃদ্ধি করতে এন্টিয়কের প্রাচীরে গোলা নিক্ষেপে ব্যবহার করার জন্য এবং মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত তির থেকে আত্মরক্ষার জন্য ক্রুসেডাররা এবার নগরপ্রাচীরের নিকটবর্তী একটি টিলার ওপর দুর্গ নির্মাণ শুরু করে।(৩৪০)

---

৩৩৬. Guillaman: de tyr, 1, p.194.

৩৩৭. Chalandon: Premiere Croisade, pp. 195.

৩৩৮. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১২৯ ও Guillaman de tyr 1. p. 196.

৩৩৯. Gesta Francorum, pp. 80-86.

৩৪০. Cam. Med. Hist. Vol. 5,p. 291.

দুর্গ নির্মাণ চলাকালে ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মার্চ প্রচুর পরিমাণ রসদসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অবরোধসামগ্রী নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আগত একটি নৌবহর সেন্ট সাইমন বন্দরে এসে পৌঁছায়। এর ফলে ক্রুসেডারদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়। এর কদিন পরই ১৯ মার্চ দুর্গ নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ফলে অবরোধ আরও মজবুত ও কঠিন রূপ ধারণ করে।[৩৪১]

ইয়াগিসিয়ান আবারও পারসিক সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান বারকিয়ারুক ও তার অধীনস্থ মসুলের প্রশাসক কারবুগার কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন।[৩৪২] ইয়াগিসিয়ানের আবেদনে সাড়া দিয়ে কারবুগা এবার বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এন্টিয়ক অভিমুখে আগমনের পূর্বে এডেসা অবরোধ করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত ক্রুসেড রাজ্যের পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। কারবুগার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ হলো, ধূর্ত ক্রুসেডার সেনাপতি বল্ডউইনের প্রতিষ্ঠিত ক্রুসেড রাজ্য এডেসা ছিল মসুলের বেশ কাছে। কারবুগা আশঙ্কা করছিলেন যে, তিনি যদি তার বাহিনী নিয়ে মসুল থেকে সাতশ কিলোমিটারের অধিক দূরে এন্টিয়কে গমন করেন, তাহলে বল্ডউইন হয়তো সামরিক শক্তিশূন্য মসুলে হামলা চালাবেন। তাই এন্টিয়কে গমনের পূর্বেই এডেসার দফারফা করা তার দৃষ্টিতে জরুরি ছিল। বাস্তবতা যাই হোক, কারবুগার এই সিদ্ধান্তের কারণে অতি মূল্যবান কয়েক সপ্তাহ সময় নষ্ট হয়ে যায়। এডেসার পতন ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা শেষে অবশেষে তিনি মে মাসের শেষ দিকে এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন।[৩৪৩]

কারবুগার এন্টিয়ক অভিমুখে আগমনের সংবাদে ক্রুসেড শিবিরে ব্যাপক ভীতি সৃষ্টি হয়। কারণ, তারা জানতে পারে যে, কারবুগা বেশ বড় এক বাহিনী নিয়ে আগমন করছেন। এদিকে দীর্ঘ অবরোধের কারণে ক্রুসেডার বাহিনী তখন অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সাত মাসেরও অধিক সময় ধরে তারা এন্টিয়কের নগরপ্রাচীরের বাইরে শিবির স্থাপন করে আছে। এই দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেই ২ জুন ব্লয়েসের কাউন্ট স্টিভেন এন্টিয়ক জয়ের বিষয়ে নিরাশ হয়ে ময়দান ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফরাসি

---

৩৪১. Guillaman: de tyr, 1, p. 198.

৩৪২. Michaud: op. cit. 1, pp. 264-267.

৩৪৩. উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ যী-মা ওয়ারাআল বিহার*, ১/৩১৮-১৯ ও রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, ১/৩৪৬।

সৈন্যদের বড় একটি অংশ সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি ইসকানদারুন (İskenderun) বন্দর অভিমুখে রওনা হন।[৩৪৪]

ফলে আবারও উভয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও সংকটপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

এন্টিয়কের পতন

এরপর হঠাৎ করেই পটপরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শিবিরে আঘাত হানে বিশ্বাসঘাতকতার দুষ্ট ব্যাধি। এন্টিয়কের অধিবাসী আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত ফিরোজ নামক জনৈক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিত। সে গোপনে ক্রুসেড শিবিরে অবস্থানরত আর্মেনীয়দের সঙ্গে পত্রবিনিময় করতে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এন্টিয়কের অধিবাসী অনেক আর্মেনীয় নাগরিক অবরোধের শুরুতেই এন্টিয়ক থেকে বের হয়ে ক্রুসেড শিবিরে যোগ দিয়েছিল।[৩৪৫] ফিরোজ ইয়াগিসিয়ানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিল। ইয়াগিসিয়ান তাকে এন্টিয়কের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চৌকির প্রহরার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সে আর্মেনীয়দের জানায় যে, তার এমন কিছু গোপন তথ্য জানা আছে, যার মাধ্যমে সহজেই এন্টিয়কের দুর্গসমূহ জয় করা যাবে। এ সংবাদ ব্যক্তিগতভাবে বোহেমন্ডের কাছে পৌঁছানো হয়। বোহেমন্ড অন্যান্য ক্রুসেডার সেনাপতির কাছে সবকিছু গোপন রাখেন এবং নিজে ফিরোজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর্মেনীয় ফিরোজ তথ্যপ্রদানের বিনিময়ে এন্টিয়ক পতনের পর অর্থসম্পদ ও নগরীর অভ্যন্তরে জায়গির লাভের দাবি জানালে বোহেমন্ড তার দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩৪৬] এরপর বোহেমন্ড ক্রুসেডার সেনাপতিদের একত্র করে পুনরায় তাদের সামনে পরিস্থিতির নাজুকতা তুলে ধরেন। তিনি সকলের কাছ থেকে পুনরায় নিশ্চিন্ত হন যে, পতন ঘটার পর সকলে এন্টিয়কের কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দেবে।[৩৪৭] এরপর বোহেমন্ড হামলা শুরুর সময়ক্ষণ নির্ধারণ করেন।

---

৩৪৪. Runciman, op. cit., 1, p. 234.

৩৪৫. Gesta Francorum, p. 69.

৩৪৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/১৬৮ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩৪।

৩৪৭. Gesta Francorum, p. 100.

স্টিভেন ও তার সঙ্গী ফরাসিরা চলে যাওয়ার একদিন পর ৩ জুন সকালে মুসলিম বেশধারী আর্মেনীয় খ্রিষ্টান ফিরোজ তার প্রহরাধীন চৌকিগুলোসহ আশেপাশের বিভিন্ন চৌকির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনামতে এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা যেন প্রকাশ না পায়, এ উদ্দেশ্যে সে তার এক ভাইকে হত্যা করে। নগরপ্রাচীরের কয়েকটি দ্বার উন্মুক্ত হতেই বিশাল ক্রুসেডার বাহিনী ভোরের প্রথম প্রহরে ঝড়ের গতিতে এন্টিয়কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। নগরীর অভ্যন্তরে অবস্থানরত আর্মেনীয়রাও দ্রুত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হয়।[৩৪৮] ইয়াগিসিয়ান ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি এবার একদল তুর্কিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু এন্টিয়কের অধিবাসী আর্মেনীয়রা তাকে ঘিরে ফেলে হত্যা করে এবং তার কর্তিত মস্তক নিয়ে ক্রুসেডারদের কাছে পৌঁছায়।[৩৪৯] ইয়াগিসিয়ানের মৃত্যুতে মুসলিম সৈন্য ও সাধারণ জনগণের দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে।

ভীতি ও আতঙ্কের এক বিশাল স্রোত এন্টিয়কের অভ্যন্তরে বয়ে যায়। দীর্ঘ অবরোধের পর ক্রুসেডাররা নগরীটি দখল করে নেয় এবং অগণিত নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। প্রচুর নারী ও শিশুকে বন্দি করে দাসে পরিণত করা হয়।[৩৫০] এন্টিয়কের নগরপ্রাচীর ও চৌকিসমূহের শীর্ষদেশে নরম্যান সেনাপতি বোহেমন্ডের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এন্টিয়কের ভয়ংকর পতনে পুরো ইসলামি বিশ্ব প্রকম্পিত হয়ে ওঠে; কেঁপে ওঠে খ্রিষ্টান বিশ্বও!

এন্টিয়ক অত্যন্ত সুরক্ষিত ও সুপ্রাচীন অনিন্দ্যসুন্দর এক নগরী। এন্টিয়কের আছে দীর্ঘ ইসলামি ও খ্রিষ্ট ইতিহাস। তা ছাড়া এই মর্মান্তিক পতনের ঘটনা ঘটেছে একটানা সাত মাসেরও অধিক সময়ের অবরোধের পর। অধিকন্তু পতনের পরই ঘটেছে হাজার হাজার মুসলমানের নির্মম হত্যাযজ্ঞ।[৩৫১]

---

৩৪৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪১৭।
৩৪৯. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩৪।
৩৫০. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৫।
৩৫১. ক্রুসেডারদের বিভিন্ন সূত্রগ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে এন্টিয়কে ক্রুসেডাররা দশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে।

মহামারি ছড়িয়ে নিজেরা সমূলে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কায় ক্রুসেডাররা দ্রুত স্তূপীকৃত লাশগুলো মাটিচাপা দেয়। এরপর তারা দুর্গ ও চৌকিগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং নগরীর ভেতরে-বাইরে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।[৩৫২]

এদিকে মসুল অধিপতি কারবুগা এডেসা পতনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তার বাহিনী নিয়ে এডেসা থেকে এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে তিনি এন্টিয়ক থেকে প্রায় ছয়শ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে মার্জ-দাবিক এলাকায় যাত্রাবিরতি করেন এবং এন্টিয়ক পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বৃহৎ বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আমির ও প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কারবুগার নেতৃত্বাধীন এই বাহিনীটি ছিল সেলজুক সুলতান ও তৎকালীন সবচেয়ে শক্তিশালী সেলজুক নেতা সুলতান বারকিয়ারুক কর্তৃক প্রেরিত। এ কারণে দামেশকের প্রশাসক দাক্কাক, সিনজারের প্রশাসক আরসালান তুতুশ, হিমসের প্রশাসক জানাহুদ্দৌলাসহ অনেক প্রশাসক কারবুগার আনুগত্য স্বীকার করে। তবে আলেপ্পোর প্রশাসক রিজওয়ান এমন বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান, যে বাহিনীতে তার সহোদর ও 'পরম শত্রু' দাক্কাক আছেন![৩৫৩]

সাহায্যকারী মুসলিম বাহিনীর এন্টিয়ক অবরোধের ব্যর্থ চেষ্টা

এভাবে কারবুগার উদ্যোগে বিরাট এক মুসলিম বাহিনী এন্টিয়কের উদ্দেশে রওনা হয়। এন্টিয়ক পতনের প্রায় ছয়দিন পর তারা এন্টিয়কে পৌঁছায়। কারবুগা নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা চালালেও সুরক্ষিত নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে ব্যর্থ হন।[৩৫৪] এরপর তিনি এন্টিয়ক অবরোধ করেন।

এবার বিপরীত দৃশ্য! ক্রুসেডাররা এন্টিয়কের ভেতরে অবরুদ্ধ আর মুসলমানরা বাইরে অবরোধকারীর ভূমিকায়! ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন এই অবরোধ শুরু হয়।[৩৫৫]

---

৩৫২. Michaud: op. cit. 1, 292.

৩৫৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪১৮ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৬।

৩৫৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩৬।

৩৫৫. Cam. Med. Hist. vol. 5,p. 292.

ক্রুসেডাররা এবার প্রকৃত দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। কারণ, পূর্বের সাত মাসের অধিক সময়ের অবরোধে এন্টিয়ক বলতে গেলে সম্পূর্ণই খাদ্যশূন্য হয়ে পড়েছে। পূর্ব দিকে চলে আসায় ক্রুসেডাররা এবার অনুতাপ করতে থাকে। খাদ্যের অভাবে তারা ক্ষুধার চরম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং মৃতদেহ ও গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়।[৩৫৬]

এই কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কী করবে ক্রুসেডার শক্তি?

ক্রুসেডাররা এবার বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার পরিকল্পনা করে। এরই নাম স্বার্থ! এরই নাম স্বার্থের রাজনীতি!

এখন ক্রুসেডারদের বাইজান্টাইন সম্রাটের সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। সুতরাং আবারও চাটুকারিতা, তোষামোদ-খোশামোদ ও কপটতার পথ অবলম্বনে বাধা কীসের!

বাইজান্টাইন সম্রাট দেখতে পান যে, তার সামনে প্রিয় এন্টিয়ক নগরীর কর্তৃত্ব লাভের এক পরম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তিনি নিজে এবার বিরাট এক বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনর অতিক্রম করে এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু পথে থাকতেই তিনি বিভিন্ন ইসলামি রাজ্যের সৈন্যদের সমন্বয়ে সেলজুকদের বিরাট সৈন্যসমাবেশের বিষয়ে জানতে পারেন। এতে সম্রাট নিজের ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেন, 'এন্টিয়ক ও ক্রুসেডারদের নিরাপত্তারক্ষার চেয়ে আমার কাছে কনস্টান্টিনোপল ও বাইজান্টাইনদের নিরাপত্তারক্ষা হাজার গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' এরপর বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ক্রুসেডার বাহিনীর প্রতিনিধিগণ শত অনুনয়-বিনয় করেও তার সিদ্ধান্ত বদলাতে ব্যর্থ হয়।[৩৫৭]

আবারও প্রমাণিত হয় যে, ক্রুসেড অভিযান মোটেও ধর্মীয় কোনো ইস্যু ছিল না!

প্রত্যেক নেতা ও সেনাপতির চিন্তাজুড়ে ছিল নিজ নিজ ক্ষমতা ও সিংহাসন!

---

৩৫৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩৭ ও Runciman, op. cit., I, p. 238.

৩৫৭. Gesta Francorum, pp. 147-148.

বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রত্যাবর্তনে ক্রুসেডারদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। অবরোধ শুরু হওয়ার মাত্র চার দিন পরই ক্লান্ত-অবসন্ন ও ক্ষুধায় কাতর ক্রুসেডার সৈন্যরা নিজ নিজ প্রহরার স্থান ত্যাগ করতে শুরু করে এবং নগরীর অভ্যন্তরে বাড়িঘরে অবস্থান নিতে থাকে। এটি ছিল তাদের ওপর ছেয়ে বসা নিরাশা ও হতাশার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বোহেমন্ড যখন দেখতে পান যে, তার লালিত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে যাচ্ছে এবং এত পরিশ্রম ও কষ্টের পর অর্জিত অনিন্দ্যসুন্দর নগরী এন্টিয়ক তার হাত থেকে ছুটে যেতে বসেছে; বরং তার ও তার সৈন্যদের জীবনই ধ্বংস হতে যাচ্ছে, তখন তিনি বিস্ময়কর কঠোরতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। তিনি নগরীর অভ্যন্তরের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে শুরু করেন, যেন সৈন্যরা বাধ্য হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে নগরীর সম্মুখভাগে নিরাপত্তারক্ষায় ফিরে আসে। এটি ১২ জুনের ঘটনা।[৩৫৮]

বাস্তবেই বোহেমন্ড ছিলেন বড় বিস্ময়কর চরিত্রের এক নেতা!

তবে এ সবকিছুর পরও এন্টিয়কের আশেপাশে মুসলমানদের অবরোধ দৃঢ়তার সঙ্গে চলতে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, কেবল বোহেমন্ডের বাহিনী নয়; পুরো ক্রুসেডার বাহিনীই নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

কিন্তু এরই মধ্যে মুসলিম বাহিনীর নিজেদের মধ্যে ঘটে এক দুঃখজনক বিভাজন! আবারও প্রমাণিত হয় সেই শাশ্বত বাস্তবতা—

> "আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তিবলে জয়লাভ করে না; জয়লাভ করে আমাদেরই দুর্বলতার কারণে।"

মুসলিম শিবিরে দুঃখজনক বিভাজন

কারবুগা অনুভব করেন যে, মুসলিম বাহিনী আকারে বেশ বড় হলেও ক্রুসেডার বাহিনী তদাপেক্ষা বিশাল। আর তাই অবরোধ যদি দীর্ঘায়িত হয় আর ক্রুসেডাররা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসে, তাহলে পরিস্থিতি মুসলিম বাহিনীর প্রতিকূলে চলে যাবে। তাই কারবুগা চিন্তা করেন যে, মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করার সর্বোত্তম পথ হলো আলেপ্পোর প্রশাসক রিজওয়ানের সঙ্গে পুনরায় সমঝোতার চেষ্টা করে তার বাহিনীকেও মুসলিম

---

৩৫৮. Guillaman: de tyr, 1, p. 255.

বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা। কারণ, আলেপ্পোর বাহিনীতে যেমন প্রচুর সৈন্য ছিল, তেমনই আলেপ্পোর প্রশাসক রিজওয়ান নিজেও ছিলেন খ্যাতিসম্পন্ন সামরিক দক্ষতার অধিকারী। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আলেপ্পো ছিল এন্টিয়কের অতি নিকটে অবস্থিত তুলনামূলক সমৃদ্ধ এক নগরী। ফলে মুসলিম বাহিনী সেখান থেকে অত্যাবশ্যকীয় রসদসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অবরোধসামগ্রী লাভ করতে পারবে।

এই ছিল কারবুগার পরিকল্পনা। নিঃসন্দেহে তার পরিকল্পনা ছিল সঠিক ও যথাযথ। কিন্তু তা সমকালীন মস্তিষ্কশূন্য নেতৃবৃন্দের জন্য উপযোগী ছিল না। তার এই পরিকল্পনার কথা জেনে দাক্কাক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।[৩৫৯] একে কেন্দ্র করে মুসলিম বাহিনীতে বিরোধ ও বিভক্তির ঘটনা ঘটে। দাক্কাক অবরোধ ত্যাগ করে দামেশকে ফিরে যাওয়ার মনোভাব প্রকাশ করেন। বিশেষত তিনি শামের দক্ষিণাঞ্চলে উবায়দিদের আগ্রাসনের আশঙ্কা করছিলেন।[৩৬০] দাক্কাকের এই সিদ্ধান্ত মুসলিম বাহিনীর মাঝে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এদিকে হিমসের প্রশাসক জানাহুদ্দৌলা হুসাইন বিন মালাইব রিজওয়ানের মিত্র এবং রাহবা (Al-Rahba) ও মানবিজ (Manbij) অঞ্চলের প্রশাসক ইউসুফ বিন আবাকের প্রতিশোধমূলক আচরণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। জানাহুদ্দৌলা আশঙ্কা করছিলেন যে, মুসলিম বাহিনীতে তার উপস্থিতি রিজওয়ান ও তার মিত্রদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করতে পারে। জানাহুদ্দৌলার এই আশঙ্কা ও উত্তেজনা পুরো বাহিনীর আত্মবিশ্বাস ও মনোবলে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।[৩৬১]

মুসলমানরা বিগত কয়েকদিন নিজেদের সাময়িক ঐক্যের ফল ভোগ করছিল; ক্রুসেডাররা এন্টিয়কের অভ্যন্তরে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছিল। এখন যখন মুসলমানরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তখন তো নিজেদের বিভেদ ও বিভক্তির দুর্ভোগ তারা ভোগ করবেই!

---

৩৫৯. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩৬।

৩৬০. Runciman, op. cit., 1, p. 249.

৩৬১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩৬।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

এবং তোমরা সে সকল লোকের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পরস্পরে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। [সুরা আলে-ইমরান : ১০৫]

এরপর পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে পড়ে এবং মুসলিম বাহিনীর মাঝে সাম্প্রদায়িক ফিতনার দুর্যোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বাহিনীর তুর্কি ও আরব অংশের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ শুরু হয়। তুর্কিদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান সেনাপতি ও মসুলের অধিপতি কারবুগা আর আরবদের নেতৃত্বে ছিলেন ওয়াছাব বিন মাহমুদ আল-মিরদাসি নামক জনৈক আমির। দূর থেকে আলেপ্পোর আমির রিজওয়ান আরবদের বিরুদ্ধে তুর্কিদের উত্তেজিত করে একের পর এক বার্তা পাঠিয়ে ফিতনাকে আরও উসকে দেন।[৩৬২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ»

আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহিলি-যুগের মিথ্যা অহংকার ও বাপ-দাদাদের নিয়ে দাম্ভিকতা প্রদর্শনের ব্যাধি বিদূরিত করেছেন। (মানুষ দু-ধরনের) মুমিন আল্লাহভীরু ও ফাসিক দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদম-সন্তান আর আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কাজেই মানুষের কর্তব্য—তারা যেন নিজেদের বংশ-গোত্র নিয়ে গৌরব করা পরিহার করে। তারা তো জাহান্নামের এক টুকরো কয়লা। কিংবা অবশ্যই তারা আল্লাহ তাআলার নিকট ওই গুবরে

---

[৩৬২] প্রাগুক্ত, ২/১৩৬।

পোকার চেয়েও তুচ্ছ, যা তার নাসিকায় মল-ময়লা বহন করে।[৩৬৩]

এই ছিল এন্টিয়ক অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীর পরিস্থিতি!

আমরা আবারও এন্টিয়ক নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ফিরে আসছি। বোহেমন্ড আপন একগুঁয়েমি ও গোয়ার্তুমি সত্ত্বেও অনুভব করেন যে, ক্রুসেডারদের পতন ঘনিয়ে আসছে। তাই অবরুদ্ধ হওয়ার উনিশ দিন পর ২৭ জুন তিনি মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি কারবুগার কাছে ধর্মযাজক পিটার ও আরেকজন ব্যক্তিকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। দূতদ্বয়ের মাধ্যমে বোহেমন্ড প্রস্তাব দেন যে, অবরোধ প্রত্যাহার করে নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিলে ক্রুসেডার বাহিনী নিজ দেশে চলে যাবে।[৩৬৪] যদিও কারবুগার বাহিনীতে অনৈক্যের ভাঙন সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু তিনি প্রথমত আশঙ্কা করেন যে, প্রস্তাব গ্রহণ করার পর বোহেমন্ড হয়তো প্রতারণা করবেন। আর তার মতো ধূর্ত লোকের কাছ থেকে প্রতারণাই ছিল প্রত্যাশিত আচরণ। দ্বিতীয়ত কারবুগা উপলব্ধি করেন যে, ক্রুসেডাররা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই তিনি তাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরিবর্তে চূড়ান্ত যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে ফেলার মনস্থ করেন। সম্ভবত তিনি মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ও সৈন্যদের ওপর ছেয়ে বসা দুর্বলতার পরিমাণ আন্দাজ করতে পারেননি। সবমিলিয়ে তিনি দূতদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বোহেমন্ডের সামনে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর যুদ্ধও শুরু করতে হবে অতি দ্রুত, ক্ষুধার তাড়নায় ক্রুসেডার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বেই।

বোহেমন্ড নিজ বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি বোলান। তিনি দেখতে পান যে, তাদের মানসিক শক্তি একেবারেই নিম্নমুখী। বোহেমন্ড এবার ক্রুসেডার সৈন্যদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস উন্নত করার এবং তাদের অন্তরে আসন্ন যুদ্ধে সুনিশ্চিত বিজয়ের বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক অভিনব কৌশল অবলম্বনের মনস্থ করেন।

কী সেই কৌশল?!

---

৩৬৩. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫১১৬, ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৭২১ ও বায়হাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ২০৮৫১।

৩৬৪. Chalandon: Premiere Croisade, p. 220.

তিনি পিটার বার্থোলোমিউ (Peter Bartholomew) নামক মার্সেই-এর জনৈক পাদরির মাধ্যমে ক্রুসেডারদের মাঝে প্রচার করেন যে, যিশুশিষ্য সেন্ট আন্দ্রে (Andrew the Apostle) তিনবার স্বপ্নযোগে তার কাছে আগমন করেছেন এবং তাকে এন্টিয়কের সেন্ট পিটার চার্চের (The Church of Saint Peter) একটি স্থান দেখিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন যে, এখানেই যিশুখ্রিষ্টকে হত্যার সময় ব্যবহৃত বর্শাটি (The Holy Lance) মাটিচাপা দেওয়া আছে। যদি তারা উক্ত স্থানের মাটি খুঁড়ে বর্শাটি বের করে আনে এবং যুদ্ধের সময় তা ক্রুসেডার বাহিনীর সামনে রাখে, তাহলে অবশ্যই এই বাহিনী জয়লাভ করবে!

এরপর বোহেমন্ড উক্ত পাদরি ও আরও কয়েকজন সন্ন্যাসীকে তথাকথিত স্থানটি খনন করে বর্শাটি অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন। তারা উদ্দিষ্ট স্থানটি খনন করে বর্শা বের করে আনে। সকলে সমস্বরে বলে ওঠে—'এ তো অলৌকিক বিষয়; নিশ্চয়ই এই বাহিনী বিজয় লাভ করবে'![৩৬৫]

স্বভাবতই এ ঘটনা ছিল সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করার জন্য সম্পূর্ণই বোহেমন্ড ও তার অনুসারীদের সাজানো নাটক। ব্যাপকভাবে ঐতিহাসিকগণ বোহেমন্ডের এই দাবির সত্যতা স্বীকার করেননি। আর এতে বিস্ময়েরও কিছু নেই। যারা এই নাটক সাজিয়েছিল, তারা তো পাদরি ও যাজক সম্প্রদায়; তারাই তো নিজ হাতে বিধান রচনা করে দাবি করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে! আমরা আমাদের আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত বিশ্বাসী যে, বর্শা, বর্শা-দাফন ও সমাধিস্থ বর্শা আবিষ্কারের সত্যতা তো বহু দূরের বিষয়, হজরত ঈসা আ. নিহতই হননি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾

তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল। [সুরা নিসা : ১৫৭]

নিঃসন্দেহে এই বর্শা-নাটক ছিল ক্রুসেডার যোদ্ধাদের মনোবল উন্নত

৩৬৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫-১৬, যাবুরাফ, *আস-সালিবিয়্যুন ফিশ-শারক*, পৃষ্ঠা : ৯৩-১০৭। Raymond d' Aguiler, in Peters (ed.), The First Crusades, pp. 166-168, 174-175, 178-185, 189-194.

করার জন্য একটি সাজানো ঘটনা। আর তাদের উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল। বর্শা-কাহিনি মঞ্চস্থ হওয়ার পর অনেক সৈন্যের মনোবল ফিরে আসে এবং তারা পরের দিনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

নিকৃষ্টতর পরাজয়!

পরের দিন ২৮ জুন সকালে ক্রুসেডাররা যুদ্ধের জন্য এন্টিয়ক নগরী হতে বের হতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যগণ কারবুগাকে সকল ক্রুসেডার সৈন্য বের হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধ শুরু করার পরামর্শ দেয়। কারণ, তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বের হচ্ছিল। কিন্তু কারবুগা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সব ক্রুসেডার সৈন্য বের হওয়ার পর যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে এর মাধ্যমে কারবুগা এক সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। কারণ, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পরাস্ত করা সহজ ছিল। তবে সম্ভবত কারবুগা চেয়েছিলেন যে, ক্রুসেডাররা সকলে বের হয়ে আসুক, যেন নগরীর অভ্যন্তরে সুরক্ষিত অবস্থায় একজনও বাকি না থাকে। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তিনি যদি বের হওয়া ক্ষুদ্র দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, তাহলে হয়তো বাকিরা আর বের হবে না।[৩৬৬] এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কারবুগা আত্মবিশ্বাস ও নিজ বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের গৌরবে প্রবঞ্চিত ছিলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর ক্রুসেডার বাহিনীর দুর্ভোগ ও দুরবস্থা এবং তার কাছে অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন ইত্যাদি বিষয়ও তাকে বিভ্রান্ত করেছিল।

কারবুগা ক্রুসেডারদের সবাইকে বের হওয়ার সুযোগ দেন। ক্রুসেডার বাহিনীর সকল সৈন্য বের হয়ে নিজ নিজ সেনাপতির অধীনে সারি বিন্যস্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ৪র্থ রেমন্ড সকলের সামনে তথাকথিত পবিত্র বর্শাটি নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এন্টিয়ক নগরপ্রাচীরের সামনে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শুরুতে জয়ের পাল্লা মুসলমানদের দিকে হেলে ছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। ক্রুসেডাররা যুদ্ধ করছিল নিজেদের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নির্ধারণের জন্য আর মুসলমানরা যুদ্ধ করছিল নিজেদের ভূখণ্ড ও ধনসম্পদ রক্ষা করার জন্য। ভূখণ্ড ও সম্পদ রক্ষার

৩৬৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৩৭।

লক্ষ্যে যারা যুদ্ধ করে, তারা কখনো মরতে চায় না। বিজয়ের প্রত্যাশী মুসলিম বাহিনীর জন্য এ জাতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কখনোই উপযোগী নয়। বদর যুদ্ধের আগের রাতে নবীজি যখন সাহাবায়ে কেরামকে পরের দিন ভোরে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন, তখন কত মর্যাদাপূর্ণ এক উক্তি করেছিলেন! নবীজি তাদেরকে বলেছিলেন—

«وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ»

ওই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! আজ যে ব্যক্তিই সাওয়াবের আশায় সবরের সঙ্গে (পিছু না হটে) সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং শাহাদাত বরণ করবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দান করবেন।[৩৬৭]

এই পরিস্থিতিতে নবীজি তাদেরকে জীবনরক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেননি, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করার প্রতি। নবীজি শত্রুপক্ষের সম্পদ বা ভূখণ্ডের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি; যদিও তা হোক চির সম্মানিত মক্কা ভূমি। বরং নবীজি জান্নাত অর্জনের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বদরের রাতে নবীজির কর্মপন্থা আর ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনার মাঝে কত পার্থক্য!

আর তাই কিছুক্ষণ পরই মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকে নিজেকে ও নিজ সৈন্যদের লড়াই থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। সবার আগে পলায়ন করে তুর্কমেনরা, যাদের মাঝে দামেশকের আমির দাক্কাকও ছিলেন। কিছুক্ষণ অবিচলতার সঙ্গে যুদ্ধ করার পর জানাহুদ্দৌলাও পলায়নের পথ ধরেন। সবশেষে সেনাপতি কারবুগাও পলায়ন করেন।[৩৬৮] মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করে। ক্রুসেডার বাহিনীর সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্যদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে পলায়নরত মুসলিম সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেয়। ক্রুসেডার সৈন্যরা এন্টিয়ক হতে পূর্ব

---

৩৬৭. ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ১/৬২৭, ইবনু সায়্যিদিন-নাস, *উয়ূনুল আছার*, ১/৩৩৮, ইবনে কাছির, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ২/৪২০ ও সুহায়লি, *আর-রাওযুল উনিফ*, ৩/৭১।

৩৬৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৬।

দিকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হারিম দুর্গ পর্যন্ত মুসলিম সৈন্যদের তাড়া করে।[৩৬৯] ক্রুসেডারদের আক্রমণে প্রচুর মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। এরপর ক্রুসেডাররা ফিরে এসে পড়ে থাকা গণনাতীত পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, রসদসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে নেয়। কারবুগা পালিয়ে মসুলে চলে যান, দাক্কাক চলে যান দামেশকে।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল মুসলিম বাহিনীর কঠিন ও দুঃখজনক এক পরিণতি!

কত মিল এই ব্যর্থ সৈন্যসমাবেশ ও ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৬৭ হিজরি সনে) ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আরবদের সৈন্যসমাবেশে! এন্টিয়কের ন্যায় সেদিনও মুসলিম সৈন্যরা আল্লাহর জন্য বের হয়নি, আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য বের হয়নি। তারা কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তারা বের হয়েছিল চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য, ক্ষণস্থায়ী রাজত্বকে রক্ষার জন্য অথবা একখণ্ড ভূমি লাভ করার জন্য। যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তাজগৎজুড়ে এসব বিষয় কার্যকর থাকে, তাদের কপালে কখনো বিজয় জোটে না।

নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পরতে পরতে আমাদের জন্য নিহিত আছে উপদেশ ও শিক্ষা!

বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে বিভিন্ন বাধা

কারবুগার বাহিনীর পলায়নের মধ্য দিয়ে এন্টিয়ক পুরোপুরি খ্রিষ্টান নগরীতে পরিণত হয়। তৎকালীন মুসলিমসমাজ এন্টিয়ক পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। তবে বিজয়ী ক্রুসেডাররা এন্টিয়কে বড় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যা তাদের এই অভিযানের মূল লক্ষ্য বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে সরাসরি অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যথা—

১. উল্লেখযোগ্য অন্যতম বড় সমস্যা ছিল ক্রুসেডারদের আশঙ্কাজনক সংখ্যাহ্রাস। ক্রুসেডাররা এশিয়া মাইনরে অবতরণ করার পরই সেলজুকদের মুখোমুখি হয়েছিল। ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে নিকিয়া যুদ্ধ হতে এক বছরের বেশি সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত হয়েছিল প্রচুর সংখ্যক ক্রুসেডার যোদ্ধা। এরপর তাদের অনেকে বিশাল দূরত্বের পথ পর্যাপ্ত

---

৩৬৯. Gesta Francorum, p. 159.

পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় ছাড়াই পাড়ি দিতে গিয়ে মারা যায়। দীর্ঘদিন এন্টিয়ক অবরোধ চলার সময়ও প্রথম স্তরে ক্রুসেডাররা মুসলমানদের অবরোধ করার সময় এবং দ্বিতীয় স্তরে মুসলমানরা ক্রুসেডারদের অবরোধ করে রাখার সময় মারা যায় বহু সৈন্য। এরপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য নিহত হয় কারবুগার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে। সবশেষে ব্যাপক প্রাণহানির কারণে এন্টিয়কে ছড়িয়ে পড়া মহামারিতেও মারা যায় প্রচুর সংখ্যক ক্রুসেডার সৈন্য।

এভাবে ক্রুসেডারদের সৈন্যসংখ্যা এত হ্রাস পায় যে, তাদের পক্ষে এন্টিয়কের সুদীর্ঘ প্রাচীরের প্রতিটি চৌকিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।[৩৭০] তাহলে কীভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে?! তা ছাড়া বেঁচে থাকা সৈন্যরা ক্লান্তি ও দুর্বলতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। এন্টিয়ক থেকে প্রায় ছয়শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাইতুল মুকাদ্দাসের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার মতো শক্তি তখন তাদের নেই। অধিকন্তু সেখানে তাদের লড়তে হবে তৎকালীন মিশরের পূর্ণ সামরিক শক্তির অধিকারী উবায়দি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে।

এসব সংকট বিবেচনা করে ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবসাদ অল্প কদিনের ছিল না; পুরো ছয় মাস এভাবেই কেটে যায়।[৩৭১]

২. এই সংকটের কারণেই ক্রুসেডাররা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সরাসরি বিরোধিতার ঘোষণা প্রদান হতে বিরত থাকে। যদিও ক্রুসেডাররা শুরু থেকেই বাইজান্টাইন সম্রাটকে অপছন্দ করে আসছিল, যিনি তাদের বিরোধী মতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও নিজ সিদ্ধান্ত তাদের ওপর চাপিয়ে যাচ্ছিলেন; যদিও তারা অনুভব করছিল যে, সম্রাট তাদের সঙ্গে এন্টিয়ক অবরোধে নিষ্ঠাপূর্ণ অংশীদারিত্ব ও সহায়তা প্রদান করেননি এবং যদিও কারবুগার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্রাট তাদেরকে সহায়তা না করায় তারা তার প্রতি প্রচণ্ড রকম বিক্ষুব্ধ ছিল; কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আগামী দিনগুলোতে যেকোনো মুহূর্তে তাদের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের

---

৩৭০. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৭৩।

৩৭১. Gesta Francorum, p. 74-82; William of Tyre, pp. 298-315.

শক্তি ও সহায়তার প্রয়োজন পড়তে পারে।[৩৭২]

এই উপলব্ধির কারণেই এন্টিয়ক জয়ের পর মুখোমুখি হওয়া আরেকটি বড় সমস্যার মোকাবিলা করতে করণীয় নির্ধারণে ক্রুসেডারদের ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এন্টিয়ক জয়ের পর ক্রুসেডাররা দেখতে পায় যে, নগরীটির অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক অর্থোডক্স খ্রিষ্টান নাগরিক বসবাস করে। ক্রুসেডাররা তাদের মোটেও বিশ্বাস করত না; বরং তারা জানত যে, এসব অর্থোডক্স খ্রিষ্টান মনেপ্রাণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং সুযোগ পেলেই বাইজান্টাইন স্বার্থ বাস্তবায়নে কাজ করতে পারে। কিন্তু ক্রুসেডাররা অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সক্ষম হয়নি।[৩৭৩] বরং তারা বাহ্যত তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে থাকে। ক্রুসেডাররা এন্টিয়কের অর্থোডক্স বিশপ ৪র্থ জন-কে যথেষ্ট মর্যাদা প্রদান করে এবং তাকে এন্টিয়ক চার্চের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করে। তারা অর্থোডক্স পাদরিদের বরখাস্ত করার পরিবর্তে আপন আপন পদে বহাল রাখে এবং যেসব গির্জায় শূন্য পদ সৃষ্টি হয়েছিল, কেবল সেখানেই ক্যাথলিক পাদরিদের দায়িত্ব প্রদান করে।[৩৭৪] এ সবকিছুই করা হচ্ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের নৈকট্য অর্জন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের হৃদ্যতা ক্রয়ের প্রচেষ্টা হিসেবে।

৩. ক্রুসেডাররা আরেকটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। আর তা হলো ক্রুসেডারদের প্রত্যাশার বিপরীতে এন্টিয়ক নগরীর শস্যভান্ডার ও রসদভান্ডার শূন্য হয়ে গিয়েছিল।[৩৭৫] দীর্ঘদিনের অবরোধ ও সকলের যুদ্ধব্যস্ততায় নগরীর সঞ্চিত সম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং গুদামে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কিছুই ছিল না। ক্রুসেডাররা উপলব্ধি করছিল যে, আগামী দিনগুলোতে তাদের নিজেদের করণীয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। যদি ইউরোপ বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে সাহায্য আসে, তাহলে তো ভালো, নয়তো নিজেদেরই পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোতে হামলা চালিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায়

---

৩৭২. Brehier, op. cit., 314.

৩৭৩. Runciman, op. cit., 1, p. 236.

৩৭৪. Albert d' Aix, p. 433.

৩৭৫. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৭৪।

অচিরেই ক্রুসেডার বাহিনী ভীষণ খাদ্যসংকট ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

অবশ্য এসব সমস্যার চেয়েও বড় যে সমস্যা ও প্রশ্নের মুখোমুখি ক্রুসেডাররা হয়েছিল, তা হলো—কে হবে এন্টিয়কের নতুন শাসক?![৩৭৬]

এন্টিয়কের নতুন শাসক

পূর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, বোহেমন্ড শুরু থেকেই এন্টিয়ক অভিযানকে নিজের ভাগ্যনির্ধারক লড়াই হিসেবে বিবেচনা করে আসছিলেন। ইতালি ত্যাগ করার পর থেকে এন্টিয়কে প্রবেশ করা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও তার মনমস্তিষ্ক এই লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হয়নি। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় অন্যান্য সেনাপতিকে এ শর্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি তাদের সঙ্গে অভিযানের শেষ পর্যন্ত শরিক থাকেন, তাহলে অবশ্যই তারা তাকে এন্টিয়কের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দেবে।[৩৭৭]

এন্টিয়কই ছিল বোহেমন্ডের স্বপ্ন!

প্রশ্ন হলো—এন্টিয়ককে ঘিরে স্বপ্ন দেখা কি কেবল একজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল?!

উত্তর হলো—'না!'

বোহেমন্ডের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে প্রবল বাধারূপে বিবেচিত হচ্ছিলেন আরেক অতি উচ্চাভিলাষী ক্রুসেডার সেনাপতি তুলুজের কাউন্ট ৪র্থ রেমন্ড। ঘটনাপ্রবাহের শুরুতে রেমন্ড যদিও আপন ধার্মিকতা ও পোপের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, মাসিহের অনুসারী হওয়ায় তিনি বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্যের শপথ করতে পারবেন না, এরপর তিনি কথিত পবিত্র বর্শা বহন করে ক্রুসেডার বাহিনীর অগ্রভাগে থেকে লড়াই করেছিলেন; কিন্তু এন্টিয়ক পতনের পর তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত চেতনা প্রকাশ করতে থাকেন। রেমন্ড বোহেমন্ডের প্রতি উত্তেজিত হয়ে দাবি করেন যে, বোহেমন্ড অন্যান্য সেনাপতির চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অধিকার বা ক্ষমতা লাভ করতে পারেন না। ইতিপূর্বে যদিও রেমন্ড এন্টিয়ক পতনের পর তা বোহেমন্ডকে দিয়ে দেওয়ার

---

৩৭৬. Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 294-295.

৩৭৭. Chalandon: Alexis Comnene, p.p. 201 & Premiere Croisade, p. 193.

বিষয়ে অন্যান্য সেনাপতির সঙ্গে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু এখন তিনি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। রেমন্ডের বিদ্রোহ কেবল মৌখিক আপত্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি অস্ত্রের ভাষায়ও আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন! তার সৈন্যরা এন্টিয়কের বিভিন্ন ফটক ও চৌকির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং বোহেমন্ডের হাতে কর্তৃত্ব সমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়। এন্টিয়কে এবার শুরু হয় বোহেমন্ড-সমর্থক ও বোহেমন্ডবিরোধী শিবিরের সংঘাত।[৩৭৮]

এন্টিয়কের ক্ষমতা নিয়ে একমাত্র রেমন্ডই বোহেমন্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না; বাইজান্টাইন সম্রাটও এন্টিয়ককে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় অধিকার মনে করতেন। তা ছাড়া ক্রুসেড অভিযান শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই সম্পাদিত কনস্টান্টিনোপল চুক্তি অনুসারে ক্রুসেডার সেনাপতিগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাচীন অধিকারভুক্ত নগরীগুলো বাইজান্টাইন সম্রাটের হাতে তুলে দিতে বাধ্য ছিল। এন্টিয়ক ছিল এই তালিকার সর্ব শীর্ষে।[৩৭৯]

সুতরাং এক কঠিন প্রশ্ন সকলের সামনে সৃষ্টি হয় যে, কে লাভ করবে এন্টিয়কের শাসনক্ষমতা?!

এন্টিয়কের ক্ষমতা নিয়ে খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দের এই পারস্পরিক সংঘাত আমাদের সামনে আবারও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, এসব নেতা মোটেও ধর্মের সেবা, ক্রুশের মর্যাদা রক্ষা বা মাসিহের সন্তুষ্টিলাভের প্রত্যাশায় অভিযানে বের হয়নি; বরং তাদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, তারা আপন আপন মর্যাদা ও ক্ষমতা অর্জনে সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিল। যে ধর্মীয় দায়িত্বের কথা বলে তারা অভিযানে বের হয়েছিল, সেদিকে তাদের মোটেও দৃষ্টি ছিল না।

যে বাইজান্টাইন সম্রাট পোপের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেছিলেন এবং খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের অবস্থা চরম শোচনীয়রূপে তুলে ধরেছিলেন, তার চিন্তা-চেতনাজুড়ে একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেলজুকরা ইতিপূর্বে যেসব জনপদ কেড়ে নিয়েছে, সেগুলোতে নিজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং আপন সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করা। এন্টিয়ক অবরোধের সময় যখন

---

৩৭৮. Guillaman: de tyr, p. 274.

৩৭৯. Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade, p. 203-205.

প্রথমবারের মতো তার বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের বাস্তব পরীক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখনই তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে দূরে সরে পড়েন এবং পতন পরিস্থিতির মুখোমুখি ক্রুসেডারদের সহায়তা করতে অস্বীকার করে প্রত্যাবর্তন করেন। অথচ বাহ্যত ক্রুসেডাররা তাকে সহায়তা করার জন্যই অভিযানে বের হয়েছিল!

এদিকে অন্যতম ক্রুসেডার সেনাপতি বল্ডউইন মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং এডেসায় রাজ্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেই তুষ্ট হয়ে গেছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত অভিযান পূর্ণ করার কোনো চিন্তাই তার নেই!

বোহেমন্ডও এখন এন্টিয়ক জয় করেই তুষ্ট। তিনি ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে এন্টিয়কের একক কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দিতে সকলকে বাধ্য করছেন। আল-কুদস ইস্যু এবং অন্যদের অধিকার ও স্বপ্নের প্রতি তার মোটেও ভ্রুক্ষেপ নেই।

ধর্মযাজক পিটার দীর্ঘস্থায়ী এন্টিয়ক অবরোধের কষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত টেনক্রেড তাকে অনেকটা জোর করে লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন।

টেনক্রেড নিজে ইতিপূর্বে তারসুসের অধিকার নিয়ে বল্ডউইনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলনও করেছিলেন!

আরেক সেনাপতি স্টিভেনও হতাশ হয়ে লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন। এন্টিয়ক অবরোধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন তিনি অনুভব করেন যে, তার রাজ্যজয়ের স্বপ্ন নিঃশেষ হতে চলেছে, তখন তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যান!

যুগে যুগে আগ্রাসী ও জবরদখলকারী সকল নেতাই নিজেদের জনগণ ও সৈন্যদের মনমস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করার জন্য এবং অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে ভীত ও নিশ্চুপ করানোর জন্য প্রতারণামূলক চকচকে বিভিন্ন আওয়াজ তুলে থাকে। কারও মুখে থাকে মাসিহের মর্যাদা রক্ষার দাবি, কারও মুখে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বুলি! কারও কণ্ঠে কূটনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার গান; আবার কারও কণ্ঠে মানবাধিকার রক্ষার শ্লোগান!

তারা যুদ্ধ করে বিভিন্ন মুখরোচক দাবি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অথচ বাস্তবতা হলো—তাদের যুদ্ধ ও লড়াই এবং রাজনীতি ও কূটনীতি সবকিছু শুধুই ব্যক্তিস্বার্থ নিশ্চিতকরণ এবং ব্যক্তিলালসা চরিতার্থ করার জন্য!

এখন এই মহাসমস্যার প্রতিকার বিধানে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ কী করবে?!

১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ের শুরুতে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে মিলিত হয়। সেখানে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ, এন্টিয়কের ভবিষ্যৎ ও বাইতুল মুকাদ্দাসের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে। আলোচনার মাধ্যমে সকলের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখন তাদের বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার মতো শক্তি নেই। বিশেষত সেখানে তাদের যুদ্ধ করতে হবে পূর্ণ শক্তিশালী ও তাজাদম এক বাহিনীর বিরুদ্ধে। আর আসন্ন সেই যুদ্ধে সফলতার জন্য তাদের অবশ্যই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সহায়তা প্রয়োজন হবে। সুতরাং তারা সুস্পষ্ট ভাষায়ই বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করবে। কিন্তু এন্টিয়কের কর্তৃত্ব লাভ করা ব্যতিরেকে বাইজান্টাইন সম্রাট কিছুতেই তাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হবেন না। এ কারণেই বোহেমন্ড ও রেমন্ডসহ সকল ক্রুসেডার নেতা একমত হয়—তারা এই শর্তে এন্টিয়কের অধিকার বাইজান্টাইন সম্রাটকে বুঝিয়ে দেবে যে, তিনি নিজে বিশাল একটি বাহিনী নিয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানে শরিক হবেন। বোহেমন্ডও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা হতে বিরত থাকেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, এই দুর্বল ও অবসন্ন অবস্থায় তাদের পক্ষে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

বাইজান্টাইন সম্রাট যদি ক্রুসেডারদের শর্ত মেনে নিয়ে আগমন করেন, তাহলে তাদের এই বিস্তৃত স্বপ্ন বাস্তবায়ন সহজ হবে। আর যদি তিনি না আসেন, তাহলে তারাও তাকে এন্টিয়কের কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দেবে না। তখন তারা নতুন করে বসবে এবং এন্টিয়ক প্রসঙ্গে নতুন করে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে যে, কে এন্টিয়কের শাসনক্ষমতা লাভের অধিক দাবিদার।[৩৮০]

---

৩৮০. Gesta Francorum, p. 161, Guillaman: de tyr, p. 277.

সকল ক্রুসেডার নেতা এ বিষয়ে একমত হয়ে বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে বার্তা প্রেরণ করে এবং তার কাছে দাবি জানায় যে, তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানে তাদেরকে সাহায্য করার শর্তে এন্টিয়কের ক্ষমতা বুঝে নিতে আগমন করেন।

ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ যেন ভুলেই গিয়েছিল যে, তারা কার সঙ্গে খেলার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে?!

নতুন প্রশ্ন—ক্রুসেডারদের বার্তার প্রত্যুত্তরে কী ছিল বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রতিক্রিয়া?!

বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস ছিলেন চরম পর্যায়ের ধূর্ত ও স্বার্থবাদী। তিনি চাচ্ছিলেন কোনো ত্যাগ স্বীকার না করেই সব ফল ভোগ করতে। কূটনীতির ময়দানের পাকা খেলোয়াড় অ্যালেক্সিয়াস খেলার প্রতিটি দিকের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চাচ্ছিলেন। কোনো শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করতে বা কোনো বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করতে সামান্য দ্বিধা বা বাধা তার নীতিতে ছিল না!

বাইজান্টাইন সম্রাট চাচ্ছিলেন ক্রুসেডার বাহিনীকে মুসলিম শক্তির প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতে; কিন্তু তাদেরকে বিনিময়ে কিছুই না দিতে। তিনি তাদেরকে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পরীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন যে, তারা বিজিত সকল নগরী তার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। তারা যদিও এখন এন্টিয়কের বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে; কিন্তু তারা বেশিদিন নিজেদের দেশ থেকে দূরে অটল-অবিচল থাকতে পারবে না। আর তাই বাইজান্টাইন সম্রাট এবার নতুন চাল চালেন। তিনি ক্রুসেডারদের পুরোপুরি উত্তেজিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার মনস্থ করেন। উত্তেজিত ক্রুসেডাররা মুসলমানদের হত্যা করবে, মুসলমানরাও তাদের হত্যা করবে। এভাবে যখন পুরো অঞ্চল শক্তিশালী সকল পক্ষ-শূন্য হয়ে যাবে, তখন তিনি দৃশ্যপটে আগমন করে অল্প কষ্টে বা বিনা কষ্টে নিজের পাওনা বুঝে নেবেন!

এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি পরিকল্পনা। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্র এ পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে থাকে। তারা দুটি পক্ষকে পরস্পর যুদ্ধে ঠেলে দেয়; প্রত্যেক পক্ষকে অপর পক্ষের দুর্বল জায়গাগুলো জানিয়ে দেয়। যখন মেরে-মরে উভয়

পক্ষ সাফ হয়ে যায়, তখন তারা সব ফল সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে উপস্থিত হয়।

এই নীতির কারণেই ক্রুসেডারদের পত্র পাওয়ার পর বাইজান্টাইন সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি ক্রুসেডারদের তার প্রতি বিরাগভাজন করবেন না; আবার দ্রুত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্তমান শাসক উবায়দিদেরও উত্তেজিত করবেন না। বাইজান্টাইন সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি উত্তর দিতে ভুলে যাওয়ার ভান করবেন। এর ফলে কিছু সময় চলে যাবে এবং সংকট আরও ঘনীভূত হবে![৩৮১]

এদিকে বাইজান্টাইন সম্রাটের উত্তর আগমনে দেরি হলেও ক্রুসেডাররা তাদের অভিযান শেষ না করে দীর্ঘ সময় এন্টিয়কে অবস্থান করতেও পারছিল না। তাই তারা উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নতুন করে বৈঠকে মিলিত হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রা শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত হয় ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে। ততদিনে গরমের প্রচণ্ডতাও অনেকটা কমে যাবে।[৩৮২]

বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস শুধু ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খেলেই নিশ্চিন্ত বসে ছিলেন না। তিনি এবার অপর পক্ষের সঙ্গেও খেলা শুরু করার মনস্থ করেন। সম্রাট মিশরের উবায়দি প্রশাসনের কাছে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এক ধরনের পারস্পরিক সহায়তা বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে উবায়দিদের কাছে প্রেরিত পত্রটি ক্রুসেডাররা করায়ত্ত করে ফেলে। এবার তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, বাইজান্টাইন সম্রাট তাদের নিয়ে খেলছেন।[৩৮৩]

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ক্রুসেড অভিযানের সেনাপতিগণ সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা নিজেরাই বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে। তবে রসদপত্র সংগ্রহ এবং এন্টিয়ক ও আশেপাশের অঞ্চলে মজবুত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরই তারা বের হবে। এ

৩৮১. Grousset: Alexis Comnene, pp. 204-205.
৩৮২. Runciman, op. cit., 1, p. 250.
৩৮৩. Chalandon: Alexis Comnene, p. 207.

উদ্দেশ্যেই তারা আগস্ট ও অক্টোবর দুই মাস এন্টিয়কের চারপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালায়।[৩৮৪] এ সময় বোহেমন্ড সর্বদা নিজেকে এন্টিয়কের একমাত্র শাসক হিসেবে জাহির করতে সচেষ্ট থাকেন।[৩৮৫]

নভেম্বরের ৫ তারিখে ক্রুসেডাররা আবারও বৈঠকে মিলিত হয় এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৮৬] ফলে নতুন করে আবারও এন্টিয়কের শাসক নির্ধারণের প্রশ্ন সামনে আসে। বোহেমন্ড ও রেমন্ড পুনরায় এ বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। বোহেমন্ড সরাসরি বাইজান্টাইন সম্রাটের অবাধ্যতার কথা ঘোষণা করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অর্থোডক্স চার্চ থেকে ৪র্থ জন-কে বরখাস্ত করার দাবি তোলেন। তিনি এর মাধ্যমে এন্টিয়কের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে এবং কনস্টান্টিনোপলের কর্তৃত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে চাচ্ছিলেন।[৩৮৭] কিন্তু রেমন্ডের চিন্তা ছিল—বোহেমন্ডকে পরাভূত করে এন্টিয়কের অধিকার লাভ করতে চাইলে তার বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন হবে। এভাবে স্বার্থের সংঘাত এবার মিত্রতার সংঘাতে রূপ নেয়! যে বোহেমন্ড ছিলেন বাইজান্টাইন সম্রাটের সবচেয়ে নিকটভাজন, তিনি এখন এন্টিয়কের কর্তৃত্ব লাভের জন্য তার অবাধ্যতা ঘোষণা করছেন। তিনি ভুলে গেছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি সম্রাটের আনুগত্যের শপথ করেছিলেন! আর যে রেমন্ড সম্রাটের আনুগত্যের শপথ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তিনিই এখন উচ্চৈঃস্বরে তার পাশে থাকার কথা ঘোষণা করছেন![৩৮৮]

স্বার্থের সংঘাতে বিবাদমান উভয় পক্ষের স্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত দুই ক্রুসেডার সেনাপতি এবার অস্ত্র উত্তোলন করে।

তাদের দুজনের আচরণে অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যরা চরম বিরক্ত হয়ে ওঠে। একে কেন্দ্র করে এন্টিয়কে ঘটে এক বিরল ও বিস্ময়কর বিদ্রোহ। অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যরা হুমকি দেয় যে, তারা দুজন যদি নিজেদের

---

৩৮৪. Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 295. And Michaud: op. Cit. 1, p. 333 & Gesta Francorum, pp. 162-165.

৩৮৫. Heyd : op. cit., Tome 1, p. 134.

৩৮৬. Michaud: op. cit. 1, pp. 346-347.

৩৮৭. Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 250.

৩৮৮. Brehier, op. cit., p. 314.

মধ্যকার বিরোধ নিরসন না করে, তাহলে সকলে মিলে এন্টিয়কের নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেলবে; এরপর নির্ধারিত সময়ে পুরো বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে আর তাদের দুজনের বাহিনীকে বাইজান্টাইন শক্তি ও মুসলিম শক্তির সামনে অরক্ষিত ও উন্মুক্ত ফেলে রেখে যাবে।[৩৮৯]

বোহেমন্ড ও রেমন্ড যখন উপলব্ধি করে যে, ক্রুসেডাররা বাস্তবেই তাদের হুমকি বাস্তবায়ন করবে, তখন তারা প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ে। এরপর সকলে শান্ত হয়ে সমস্যার সমাধানের জন্য বৈঠকে বসে। ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেয় যে, সমাধানে পৌঁছা পর্যন্ত সময়টুকু কাজে লাগাতে এবং সকলকে ব্যস্ত রাখতে আপাতত তারা সকলে মিলে মাআ'ররাতুন-নোমান (Ma`arrat al-Nu`man) নগরীতে অভিযান চালাবে। এন্টিয়ক হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত নগরীটি ছিল আলেপ্পো রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন।[৩৯০] ক্রুসেডাররা নগরীটি অবরোধ করলে সেখানকার অধিবাসীরা আলেপ্পোর আমির রিজওয়ানের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাদের আবেদনে উল্লেখযোগ্য কোনো গুরুত্ব প্রদান না করায়[৩৯১] নিরুপায় নগরবাসী ক্রুসেডারদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পূর্বে নগরবাসীকে নিরাপত্তাদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও[৩৯২] নগরীতে প্রবেশের পর ক্রুসেডাররা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে নগরজুড়ে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটপাট চালায় এবং পুরো নগরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।[৩৯৩]

১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর মাআ'ররাতুন-নোমান নগরীর পতন ঘটে।

মাআ'ররাতুন-নোমানের অভিযান শেষে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ নতুন করে আবারও বোহেমন্ড ও রেমন্ডের কর্তৃত্ব-বিরোধ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। রেমন্ড যখন দেখতে পান যে, অধিকাংশ সেনাপতি বোহেমন্ডের দাবিকেই সমর্থন করছে,[৩৯৪] তখন তিনি একেবারে বঞ্চিত না হয়ে কিছু

---

৩৮৯. Gesta Francorum, p. 171.

৩৯০. Stevensos : op. cit., p. 30.

৩৯১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৪১-৪৩।

৩৯২. Albert d' Aix, p. 268 & Gesta Francorum, p. 175.

৩৯৩. Chalandon: Premiere Croisade, p. 249.

৩৯৪. Gesta Francorum, p. 279.

পাওয়ার আশায় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মনস্থ করেন। তিনি প্রস্তাব দেন যে, তাকে যদি আসন্ন বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানে ক্রুসেডার বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, ভিন্নভাবে বললে সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়, তাহলে তিনি এন্টিয়কের দাবি ছেড়ে দেবেন। সমস্যার সমাধানের জন্য সবাই তার দাবি মেনে নেয়। এর ফলে বোহেমন্ড একদিকে এন্টিয়কের একক কর্তৃত্ব লাভ করেন, অপরদিকে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযান থেকে দূরে থাকার সুযোগও পেয়ে যান। নিজের পুরোনো স্বপ্ন এন্টিয়ক রাজ্যের ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনি ভুলে যান তীর্থযাত্রীদের 'নিপীড়িত' হওয়ার ইতিহাস![৩৯৫]

বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব লাভ করেই রেমন্ড প্রথমে তীর্থযাত্রীদের পোশাক পরিধান করেন। এরপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের ধর্মীয় অভিযানে বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে নগ্নপদে যাত্রা শুরু করেন।[৩৯৬] এন্টিয়ক পতনের সাত মাসেরও অধিক সময় পর ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি শুরু হয় বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে ক্রুসেডারদের যাত্রা। রেমন্ড সকলকে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি একমাত্র মাসিহের সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু অচিরেই তার এই মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। কেবল রেমন্ডের নয়; একে একে উন্মোচিত হবে অভিযানে শরিক সকল স্বার্থবাদী নেতা ও সেনাপতির অভিনয়ের মুখোশ!

* * *

৩৯৫. Michaud: op. cit. 1, pp. 345-347.

৩৯৬. Mayer, The Crusades, pp. 58-59.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এবার লক্ষ্যবস্তু আল-কুদস!

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি ক্রুসেডার বাহিনী তাদের অভিযানের মূল লক্ষ্য আল-কুদস অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। এন্টিয়ক ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওনা হওয়া ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নির্ধারণে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। সর্বনিম্ন ধারণা অনুসারে ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ছয় হাজার[৩৯৭]; অপরদিকে সর্বোচ্চ ধারণা অনুসারে আশি হাজার। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উভয় সংখ্যাই ইসলামি ভূখণ্ডে অবতরণের সময় তাদের যে সংখ্যার কথা আমরা জেনে এসেছি, তার তুলনায় নিতান্তই অল্প। কারণ, ইসলামি ভূখণ্ডে অবতরণের সময় ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন অনুমান অনুসারেও কমপক্ষে তিন লক্ষ।

ক্রুসেডারদের এই বিপুল সংখ্যাহ্রাসের কারণ ছিল বিগত দিনগুলোতে চলমান অব্যাহত লড়াই, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম, অবরোধ, ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। বল্ডউইনের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে এডেসায় চলে যাওয়া, বোহেমন্ডের বাহিনী এন্টিয়কে রয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ও সৈন্যহ্রাসে ভূমিকা রেখেছিল। তা ছাড়া নিকিয়া হতে শুরু করে মাআ'ররাতুন-নোমান পর্যন্ত যেসব নগরী ক্রুসেডাররা দখল করেছিল, প্রতিটি নগরীর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্যও কিছু সৈন্য মোতায়েন করে রেখে আসতে হয়েছিল। তবে এ সবকিছুর পরও আমরা এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি যে, বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানে অংশগ্রহণকারী ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আশি হাজার বা তার কাছাকাছি ছিল। কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে ক্রুসেডার বাহিনী সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের বেশ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিল। কোনো ধরনের

---

৩৯৭. Chalandon: Premiere Croisade, p. 253.

প্রতিরক্ষা ব্যতিরেকে মাত্র ছয় হাজার সৈন্য এই বিরাট দূরত্ব পাড়ি দেবে, এমনটি মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। তা ছাড়া তিন লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট ক্রুসেডার বাহিনীর মাত্র ছয় হাজার সৈন্য যদি অবশিষ্ট থাকত, কোনো প্রকার সংশয় ছাড়াই বলা যায় যে, তাহলে তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে অবশ্যই ইউরোপে ফিরে গিয়ে নিজেদের জান বাঁচানোর চিন্তা করত। এ তথ্যটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হওয়ার পূর্বে সংঘটিত অধিকাংশ যুদ্ধে ক্রুসেডাররা জয়লাভ করেছিল। আর সেসব যুদ্ধে বড় ধরনের হতাহতের কোনো বিবরণ আমরা পাইনি; না ক্রুসেডারদের ক্ষেত্রে, না পরাজিত মুসলিম বাহিনীর ক্ষেত্রে।

৪র্থ রেমন্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডার বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে অগ্রসর হতে থাকে। রেমন্ড যদিও তীর্থযাত্রীদের বেশ ধারণ করেছিলেন এবং মুখে 'প্রভু-সেবা'র কথা ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তখন পর্যন্ত বল্ডউইন বা বোহেমন্ডের ন্যায় একক কর্তৃত্বাধীন কোনো ভূখণ্ডের অধিকারী হতে না পারায় তিনি ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রকম ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত ছিলেন। সামনের ঘটনাপ্রবাহে সুস্পষ্ট হবে যে, এ বিষয়টি পরবর্তী সময়ে তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তেও প্রভাব ফেলে।

ক্রুসেডাররা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারা কখনো জনশূন্য উপকূলীয় পথ ধরে, আবার কখনো জনবহুল বিভিন্ন জনপদের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। পথে তারা মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন ইসলামি নগরীও অতিক্রম করে। কিন্তু এসব নগরীর প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক ও অবমাননাকর!

ক্রুসেডার বাহিনী পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এসব নগরীর প্রশাসক ও জনগণ মূল্যবান উপহারসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়ে দ্রুত ক্রুসেডার বাহিনীর কাছে ছুটে আসে। এমনকি অনেকে ক্রুসেডার বাহিনীর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাদের হিংস্রতা থেকে বাঁচার আশায় তাদের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করে।[৩৯৮] এন্টিয়ক ও মাআ'ররাতুন-নোমানের গণহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় সর্বত্র জনমনে প্রবল ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রতিরোধের সকল আশা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সকলের একমাত্র লক্ষ্য

---

৩৯৮. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১২৭।

ছিল যেকোনো মূল্যে যাপিত জীবনের দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ; হোক সে জীবন অসহায়ত্ব ও দুর্ভাগ্যের, লাঞ্ছনা ও অবমাননার। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৬৭ হিজরি সনে) ইহুদিরা যখন ফিলিস্তিন দখলের পরিকল্পনা সহজীকরণের জন্য দিরইয়াসিনে[৩৯৯] গণহত্যা চালিয়েছিল, তখনও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। হায়! ইতিহাস এভাবেই বারবার ফিরে ফিরে আসে!

এই বিরল ও বিস্ময়কর আচরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় শাইজার

---

৩৯৯. ১৯৪৮ সালে অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন আগ থেকেই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বসবাসকারী ইহুদি সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করতে এবং খালি জায়গায় বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা ইহুদিদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করতে বড় বড় কয়েকটি গণহত্যা চালায়। ওই সময়ের পত্রপত্রিকা ও সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে চল্লিশটির মতো গণহত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে দিরইয়াসিনের গণহত্যা ছিল নৃশংসতার দিক থেকে সর্বশীর্ষে। ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল দিরইয়াসিনের গণহত্যা চালানো হয়।

এ সময় আল-কুদস নগরী সন্ত্রাসবাদী ইহুদিদের লাগাতার হামলার শিকার হচ্ছিল। কিন্তু ফিলিস্তিনি নিরস্ত্র জনসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছিল। এর ফলে আরবদের মনোবল সুসংহত হচ্ছিল, বিপরীতে অনুপ্রবেশকারী ইহুদিদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল। আর তাই বিভিন্ন ইহুদি সশস্ত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকসংস্থা হাগান (যা পরে ইসরাইলি সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়) এমন একটা ভয়াবহ গণহত্যা ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে আরবদের মনোবল ভেঙে পড়ে এবং ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মনোবল চাঙা হয়।

দিরইয়াসিন ছিল তেলআবিব ও আল-কুদসের মধ্যবর্তী ছোট একটি বস্তি। দিরইয়াসিনে চারশ আরবপরিবার বসবাস করত। ৯ এপ্রিল ভোরে ইহুদি সন্ত্রাসী দল ইরগুন ও স্টার্নগ্যাঙ-এর চারশ সন্ত্রাসী বসতিটি ঘিরে ফেলে হামলা শুরু করে। কিন্তু নিরস্ত্র গ্রামবাসী প্রবল বিক্রমে তাদেরকে রুখে দেয়। সন্ধ্যা নাগাদ নিকটবর্তী ইহুদি সেনাছাউনি থেকে সামরিক সহায়তা চলে আসলে এরপর শুরু হয় নির্বিচারে মর্টারশেল বর্ষণ। এরপরও পূর্ণ দুদিন লেগে যায় বসতিটি দখল করতে।

দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই বসতিজুড়ে নেমে আসে কিয়ামত-বিভীষিকা। যুবকদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। বৃদ্ধদেরকে প্রথমে চুলদাড়ি কামিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয়; এরপর শত শত ইহুদির উল্লাসধ্বনির মধ্যে হত্যা করা হয়। রেহাই পায়নি নিষ্পাপ শিশুরাও। শিশুদেরকে আল-কুদসের নগরপ্রাচীরের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে হত্যা করা হয়।

গণহত্যার কয়েক মাস পরেই পূর্ব ইউরোপ থেকে আগত ইহুদিদের দিরইয়াসিনে বসতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আর দুই কুখ্যাত সন্ত্রাসী দল ইরগুন ও স্টার্নগ্যাঙের প্রধান মেনাখেম বেগিন (Menachem Begin) ও আইজ্যাক শ্যামির (Yitzhak Shamir)-কে পরবর্তী সময়ে পুরস্কৃত করা হয় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। তারা দুজন ছিলেন যথাক্রমে ইসরাইলের ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রধানমন্ত্রী। [অনুবাদক]

(Shaizar) নগরীর প্রশাসকের কথা। তিনি রেমন্ডের সঙ্গে অঙ্গীকার করেন—ক্রুসেডার বাহিনী শাইজার অঞ্চল অতিক্রম করার সময় তিনি তাদেরকে বাধাপ্রদান করার পরিবর্তে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করবেন এবং আছি অঞ্চল পাড়ি দেওয়ার সময় ক্রুসেডার বাহিনীকে পথপ্রদর্শনের জন্য দুজন পথপ্রদর্শক সরবরাহ করবেন।[৪০০]

হিমসের আমির জানাহুদ্দৌলা হুসাইন বিন মালাইব কয়েক মাস পূর্বেও কারবুগার বাহিনীতে শরিক হয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এবার তিনিও দখলদার ক্রুসেডারদের হৃদ্যতা প্রার্থনা করেন এবং ক্রুসেডাররা যেন তার রাজ্যে কোনো ধরনের অনিষ্টকর আচরণ না করে, এ উদ্দেশ্যে প্রচুর উপহার-উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন।[৪০১]

এসব রাজন্য এত ক্ষুদ্র ও ক্ষয়িষ্ণু একেকটি রাজ্য শাসন করতেন, যা কোনো বিচারেই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রকাঠামোর উপযুক্ত নয়। রাজ্যের পরিধি ছোট, জনশক্তি দুর্বল, সামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু ক্ষমতার গদির আকর্ষণ এতটাই অলঙ্ঘনীয় যে, যৎসামান্য ক্ষমতার মোহে তারা এই ক্ষুদ্র রাজ্য ও দুর্বল জনশক্তি নিয়েই তুষ্ট থাকতেন; হোক সে ক্ষমতার গদি নিতান্তই মেকি ও অচল, মূল্যহীন ও তুচ্ছ!

রেমন্ডের লালসা, বাইজান্টাইন সম্রাটের নতুন চাল

এরপর ক্রুসেডার বাহিনী লেবাননের ত্রিপোলি নগরী অতিক্রম করে। বনু আম্মার নামক জনৈক শিয়া-পরিবার তখন ত্রিপোলি শাসন করত।

---

৪০০. Guillaman: de tyr, p. 265 & Gesta Francorum, p. 181 & Raymond d` Agiles, pp. 272-273.
ইবনুল আছির অবশ্য বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে কেবল এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, 'শাইজার অঞ্চলের প্রশাসক মুনকিয ক্রুসেডারদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন এবং তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন।' দেখুন : আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৬।

৪০১. অজ্ঞাত ঐতিহাসিক, *আ'মালুল ফারানজা ওয়া হুজ্জাজি বাইতিল মাকদিস*, পৃষ্ঠা : ২৭৪। ইবনুল আছির এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ না করে কেবল লিখেছেন, 'ক্রুসেডাররা হিমস অভিমুখে অগ্রসর হয়ে হিমস অবরোধ করে। তখন হিমস অধিপতি জানাহুদ্দৌলা তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন।' দেখুন : আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৬।

ক্রুসেডারদের অভিযানের সময় সেখানকার শাসক ছিলেন ফখরুল মালিক আবু আলি। শিয়া মতাদর্শী হলেও তিনি মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ত্রিপোলিকেন্দ্রিক রাজ্যটির শাসক আবু আলি আশেপাশের বিভিন্ন নগর ও জনপদেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং লেবানন ও শামের বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে ব্যাপ্ত তুলনামূলক বিস্তৃত একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে ফখরুল মালিক আবু আলি বিন আম্মার তাদের সঙ্গে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ক্রুসেডারদের বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য প্রকাশের নিদর্শন হিসেবে নগরপ্রাচীরের ওপর ক্রুসেডারদের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তাদেরকে জিজিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ৪র্থ রেমন্ড তার সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য কয়েকজন দূত প্রেরণ করলে তারা ফিরে এসে রেমন্ডকে জানায় যে, অনিন্দ্যসুন্দর নগরীটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও সম্পদে টইটম্বুর।[৪০২] দূতদের মুখে ত্রিপোলি নগরীর বিবরণ শুনে রেমন্ডের লোভাতুর দৃষ্টি চকচক করে ওঠে। তিনি ভুলে যান আল-কুদসের কথা, ভুলে যান তীর্থযাত্রীদের বেশ ধারণের কথা। ফিলিস্তিনের আল-কুদসের কথা ভুলে গিয়ে লেবাননের ত্রিপোলির মাঝেই তিনি তার নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ দেখতে পান!

রেমন্ড ও তার সঙ্গী ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ ত্রিপোলি নগরী বা তৎসংলগ্ন কোনো এলাকার ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা করে। তাদের আশা ছিল, এর মাধ্যমে নিদেনপক্ষে প্রস্তাবিত জিজিয়ার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। আর যদি কোনো নগরীর পতন ঘটানো যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা![৪০৩]

রেমন্ড ত্রিপোলির পূর্ব দিকে অবস্থিত ইরকা নামক একটি নগরী অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হন। ত্রিপোলি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নগরীটি পর্যাপ্ত পানিব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। অপরদিকে গডফ্রে ও রবার্ট অগ্রসর হন লাতাকিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত সিরিয়ান উপকূলীয় নগরী জাবালা (Jableh) অবরোধ করার জন্য। জাবালাও ত্রিপোলি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

---

৪০২. Raymond: op. cit., p. 31.

৪০৩. Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 132-133.

ছিল। ২ হতে ১১ মার্চ—মাত্র নয় দিনের অবরোধের পরই জাবালাবাসী নতি স্বীকার করে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করে এবং জিজিয়া হিসেবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও অশ্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে।[৪০৪] কিন্তু ইরকা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি নগরী। প্রচণ্ড অবরোধের মুখেও নগরীটি অটল থাকে[৪০৫] এবং রেমন্ড শত চেষ্টা করেও নগরীটির পতন ঘটাতে ব্যর্থ হন।

বাধ্য হয়ে রেমন্ড এবার ইরকা নগরীর পতন ঘটাতে গডফ্রে ও রবার্টের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। তারা দুজন এসে রেমন্ডের সঙ্গে ইরকা অবরোধে শরিক হন।[৪০৬] রেমন্ডের এই সাহায্যপ্রার্থনার কারণে স্বাভাবিকভাবেই ক্রুসেডারদের মাঝে গডফ্রের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং রেমন্ডের মর্যাদা হ্রাস পায়। ক্রুসেডাররা এবার রেমন্ডের পরিবর্তে গডফ্রেকেই সর্বাধিনায়কের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

ইরকা অবরোধে দীর্ঘদিন কেটে যায়। ক্রুসেডাররা অনুভব করে যে, তারা আবারও এন্টিয়ক অবরোধের ন্যায় গুরুতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ১০ এপ্রিল বাইজান্টাইন সম্রাটের পক্ষ থেকে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের কাছে একটি বার্তা পৌঁছায়। বার্তায় সম্রাট তাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, তারা যেন জুনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে। এর মধ্যেই তিনি বিরাট এক বাহিনী নিয়ে তাদের সঙ্গে আল-কুদস অভিযানে যোগ দেবেন এবং অভিযানের সকল খরচ ও দায়-দায়িত্ব তিনিই বহন করবেন।[৪০৭]

বাস্তবতা হলো—বাইজান্টাইন সম্রাট একই সঙ্গে সবদিকে খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং চরম পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলেন। তিনি জানতেন—ক্রুসেডারদের এখন সহায়তা প্রয়োজন।

সম্রাটের প্রস্তাব পর্যালোচনা করার জন্য ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়। বাস্তবেই তখন ক্রুসেডার বাহিনীর পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। বিশেষত অভিযানে শরিক পোপের প্রতিনিধি অ্যাডমার এন্টিয়ক পতনের কদিন পরই এন্টিয়কে মারা যান। তার মৃত্যুতে ক্রুসেডার বাহিনী সকলকে

---

৪০৪. Gesta Francorum, p. 187 & Albert d' Aix, p. 453.

৪০৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৬।

৪০৬. Gesta Francorum, p. 187 & Albert d' Aix, p. 453.

৪০৭. Guillaume de Tyr, p. 307.

এক সুতায় গেঁথে রাখার মতো আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব-শূন্য হয়ে পড়েছিল। ক্রুসেডার বাহিনী পরিণত হয়েছিল মজবুত বন্ধনহীন এক মিত্রজোটে। এখন বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসই পারেন বাস্তব নেতৃত্বশূন্য ক্রুসেডারদের ঐক্যবদ্ধ করতে।[৪০৮] অধিকন্তু তিনি অর্থ ও জনবলসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাচ্ছেন।

এগুলো ছিল প্রস্তাবের সুস্পষ্ট ইতিবাচক দিক। কিন্তু বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্তাবে যে নেতিবাচক কোনো দিক ছিল না, তাও নয়। সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস ছিলেন চরম প্রতারক ও ধোঁকাবাজ। হতে পারে তার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণই প্রতারণামূলক প্রয়াস এবং ক্রুসেডার বাহিনীকে অচল করে রাখার প্রচেষ্টা। এর পূর্বে কারবুগার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও তিনি ক্রুসেডারদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তারপর মাঝপথে পিছুটান দিয়ে তাদেরকে পরিণতি বরণের জন্য ফেলে গিয়েছিলেন। অধিকন্তু তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী উবায়দিদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। এসব দিক তো আছেই, এ বিষয়টিও ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের বিবেচনায় ছিল যে, বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানে বাইজান্টাইন সম্রাটের যোগ দেওয়ার অর্থ হলো, বাইতুল মুকাদ্দাস তার একান্ত অধিকারে পরিণত হবে। অথচ ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ বাইজান্টাইন সম্রাটের জন্য নয়; নিজেদের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে চায়।

ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত

পরামর্শ বৈঠকে ৪র্থ রেমন্ড বাইজান্টাইন সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। স্বাভাবিকভাবেই তার এ মত ছিল ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা করে; ক্রুসেডার বাহিনীর স্বার্থ বিবেচনা করে নয়। কারণ, সম্রাটের জন্য দেরি করার সুযোগে রেমন্ড ত্রিপোলিতে তার নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়-সুযোগ লাভ করবেন। হতে পারে এক্ষেত্রে তিনি বাইজান্টাইন শক্তির সহায়তাও পাবেন। প্রতাপশালী বাইজান্টাইন সম্রাট যখন জানবেন যে, রেমন্ড তার সহায়তায় কাজ করছেন, তখন তিনি

---

৪০৮. Chalandon: Alexis Comnene, pp. 214-215.

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই রেমন্ডকে সহায়তা করবেন।[৪০৯]

অপরদিকে গডফ্রে এর বিপরীত মত প্রদান করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করার অর্থ সময় ও প্রচেষ্টা নষ্ট করা এবং কল্পনার বালু-প্রাসাদ তৈরি করা। বিলম্ব না করে এখনই সরাসরি বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হওয়া হবে ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য উপযোগী ও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত।[৪১০] বিশেষত এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখনো পর্যন্ত এ অঞ্চলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি বললেই চলে।

এভাবে উভয় ক্রুসেডার নেতা করণীয় নির্ণয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। দুজনের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড বিরোধ। আবারও প্রমাণিত হয়—নির্ভেজাল প্রভু-সেবা নয়; ক্রুসেড অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল নেতৃবৃন্দের আপন আপন স্বার্থ উদ্ধার। এদিকে রেমন্ডের স্বপ্ন ত্রিপোলিকেন্দ্রিক, ওদিকে গডফ্রের অভিলাষ বাইতুল মুকাদ্দাসকেন্দ্রিক। বাহিনী যদিও অভিন্ন; লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্বপ্ন ও অভিলাষ যে ভিন্ন ভিন্ন!

অন্যান্য সেনাপতি গডফ্রের মতকে সমর্থন করলে বাহিনীতে গডফ্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায় এবং গডফ্রেই ক্রুসেডার বাহিনীর অঘোষিত সর্বাধিনায়কে পরিণত হন।[৪১১] রেমন্ড এরপরও তার জেদ ধরে রেখে ইরকা অবরোধ অব্যাহত রাখেন। অথচ কোনো ফলাফল ছাড়াই ইরকা অবরোধে ইতিমধ্যে কেটে গেছে দুই মাস সময়।[৪১২]

দিনের পর দিন কাটতে থাকে, পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে!

সাড়ে তিন মাসের অবরোধের পরও ক্ষুদ্র ইরকা নগরীর পতন ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে মে মাসের ১৩ তারিখে রেমন্ড অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন।[৪১৩] ইরকার পরিবর্তে রাজধানী নগরী ত্রিপোলির পতন ঘটানোর

---

[৪০৯]. Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 138.
[৪১০]. Michaud: op. cit. 1, p. 361.
[৪১১]. Albert d` Alix, pp. 455 & Raymond d` Agiles, p. 289.
[৪১২]. অজ্ঞাত ঐতিহাসিক, *আ'মালুল ফারানজা ওয়া হুজ্জাজি বাইতিল মাকদিস*, পৃষ্ঠা : ২৭৬। ইবনুল আছির উল্লেখ করেছেন, ইরকা নগরীর অবরোধ চার মাস স্থায়ী হয়েছিল। দেখুন : আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৬।
[৪১৩]. Stevenson: op. cit., p. 32.

চেষ্টা করা হলে নিঃসন্দেহে তা আরও অনেক কঠিন বিবেচিত হতো। রেমন্ড শেষ পর্যন্ত গডফ্রে ও অন্যান্য নেতার মত মেনে নিয়ে ফখরুল মালিক ইবনে আম্মারের জিজিয়া-প্রস্তাব মেনে নেন।(৪১৪) অতি মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট করে ক্রুসেডার বাহিনী আবারও বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে। মূল্যবান সময়ই কেবল নষ্ট হয়নি; প্রচণ্ড গরমের মৌসুমও কাছে চলে এসেছে।

ক্রুসেডাররা যখন নতুন করে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখনই হঠাৎ তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ত্রিপোলি নগরপ্রাচীরের কাছে উপস্থিত হয় মিশর থেকে আগত উবায়দি প্রতিনিধিদল!

উবায়দি প্রতিনিধিদলের দাবি ও প্রস্তাব

উবায়দি প্রতিনিধিদল ক্রুসেডার বাহিনীর প্রত্যেক সেনাপতির জন্য প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থ ও বহুমূল্য উপহারসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তারা উবায়দি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে ক্রুসেডারদের প্রস্তাব দেয় যে, উবায়দি প্রশাসন সহজে ক্রুসেডারদেরসহ খ্রিষ্টানসমাজের সদস্যদের (তখনও পর্যন্ত উবায়দি সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন) বাইতুল মুকাদ্দাস পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে দেবে। তবে তীর্থযাত্রীদের সেখানে অস্ত্র ব্যতীত প্রবেশ করতে হবে।(৪১৫) শুধু এতটুকুই নয়; এশিয়া মাইনর অঞ্চল, সিরিয়া ও লেবাননের যেসব এলাকা ক্রুসেডাররা ইতিমধ্যে জয় করে নিয়েছে, উবায়দিরা সেসব স্থানে ক্রুসেডারদের দখলদারিত্বের বৈধতা ও স্বীকৃতি প্রদান করবে।

এভাবে?! এতটা উদারতা?!

কিন্তু উবায়দি প্রতিনিধিদলকে অপ্রস্তুত করে ক্রুসেডাররা কড়া ভাষায় উত্তর দেয় যে, তারা যেভাবে ইচ্ছা তীর্থযাত্রা ও বাইতুল মুকাদ্দাস পরিদর্শন সম্পন্ন করবে; কিন্তু কোনোভাবেই উবায়দি সাম্রাজ্যের সহায়তায় নয়!

এর মাধ্যমে মূলত সরাসরি যুদ্ধেরই ঘোষণা করা হয়েছিল।(৪১৬) কারণ, শাসকের অনুমতি ব্যতীত ক্রুসেডাররা কীভাবে আল-কুদসে প্রবেশ করবে?!

---

৪১৪. Raymond d' Agiles, p. 285 & Guilaume de Tyr, pp. 308-309 ও অজ্ঞাত ঐতিহাসিক, *আ'মালুল কারানজা ওয়া হুজ্জাজি বাইতিল মাকদিস*, পৃষ্ঠা : ২৭৭।

৪১৫. Michaud: op. cit. 1, pp. 362-363.

৪১৬. Guillaume de Tyr, 1, pp. 305-306.

নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল ও গভীর পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিস্থিতি। পরিস্থিতিটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে আমাদের সামান্য পেছনে ফিরে যেতে হবে এবং উবায়দি সাম্রাজ্য ও তৎকালীন বাইতুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা নিতে হবে।

অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ক্রুসেড অভিযান ইস্যুতে উবায়দি সাম্রাজ্যের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, আচরণ-উচ্চারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরিপক্ব কর্মনীতি এবং সর্ববিচারেই লাঞ্ছনাকর ও কলঙ্কজনক অবস্থান গ্রহণে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[৪১৭] কিন্তু ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠক ও গভীর পর্যবেক্ষকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ক্রুসেডারদের প্রতি উবায়দি সাম্রাজ্যের যে প্রতিক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে মোটেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উবায়দি সাম্রাজ্যের মূল লক্ষ্য ছিল সর্বত্র সুন্নি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। সেই ২৯৭ হিজরি সনে (৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে) নিজেদের আবির্ভাবকালেই তারা মাগরিবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং অসংখ্য আলিম-আবিদকে হত্যা করে। এরপর তারা আন্দালুসের সুন্নি রাষ্ট্রকে টার্গেট করে। আন্দালুসে তারা কেবল সুন্নি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করেনি; আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তর আন্দালুসের ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ও করেছিল। এরপর তারা উত্তর আফ্রিকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর দখল করে নেয়। মাগরিবের মতো মিশরেও তারা সুন্নি উলামায়ে কেরামকে নির্বিচারে হত্যা করে। একই বছর তারা শাম অঞ্চলেও নিজেদের রাজ্য বিস্তার করে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ও দামেশক দখল করে নেয়।[৪১৮]

পরবর্তী একশ বছরেরও অধিক সময় বাইতুল মুকাদ্দাস উবায়দিদের দখলে ছিল। অবশেষে ৪৬৩ হিজরি সনে (১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে) বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান আলপ আরসালান রহ. তার সেনাপতি

---

৪১৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৩-১৪।

৪১৮. প্রাগুক্ত, ৭/৩০৯ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/২৬৬-২৬৭।

আতসিজ-এর মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন।[৪১৯] আলপ আরসালানের মৃত্যুপরবর্তী সময়ে ৪৭১ হিজরি সনে (১০৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যায় তার পুত্র ও শামীয় সেলজুক রাষ্ট্রের অধিপতি তুতুশ বিন আলপ আরসালানের কর্তৃত্বে।[৪২০] তুতুশ তার তুর্কমেন সেনাপতি উরতুক বিন আকসাবকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করেন। উরতুকের মৃত্যুর পর ৪৮৫ হিজরি সনে (১০৯১ খ্রিষ্টাব্দে) বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসকের দায়িত্ব লাভ করেন তার পুত্র সুকমান বিন উরতুক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) তুতুশ তার ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুক বিন মালিকশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং তার শামীয় সেলজুক রাষ্ট্র আলেপ্পো ও দামেশক দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যায় দামেশকের অধিপতি দাক্কাক বিন তুতুশের নিয়ন্ত্রণে।[৪২১] দাক্কাক সুকমান বিন উরতুককে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসক পদে বহাল রাখেন।

সেলজুকদের কাছে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণ হারালেও উবায়দিরা কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়নি। এ কারণেই তারা এশিয়া মাইনর ও শাম অঞ্চলে ক্রুসেডারদের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছিল। উবায়দি প্রশাসনের পরিকল্পনা ছিল, ক্রুসেডাররা যখন এশিয়া মাইনর ও শাম অঞ্চলে সুন্নি তুর্কিদের ব্যস্ত রাখবে, তখন তারা সুযোগ বুঝে বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে।[৪২২] বাস্তবেও সেলজুকরা যখন ক্রুসেডারদের আগ্রাসন সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার ফাঁকে উবায়দিরা ৪৯০ হিজরি সনে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) বাহিনী প্রেরণ করে বাইতুল মুকাদ্দাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।[৪২৩] এমনকি তারা ফিলিস্তিনে নিজেদের অধিকারের স্বীকৃতি লাভের বিনিময়ে শাম অঞ্চলে ক্রুসেডারদের অধিকারের স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব দিয়ে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সমঝোতা প্রচেষ্টা চালাতেও দ্বিধা করেনি।

---

৪১৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩৯০।

৪২০. প্রাগুক্ত, ৮/৪১৮।

৪২১. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

৪২২. সাইদ আত্তর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৯১।

৪২৩. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

পেছনে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।[৪২৪]

প্রতারণা, দালালি ও সুন্নি মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাতের এ এক দীর্ঘ ইতিহাস।

এখন ক্রুসেডাররা বিশেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাসসহ ফিলিস্তিন অঞ্চলেও অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদের সামনে উবায়দিদের সঙ্গে সমঝোতার কোনো অবকাশই নেই। এ কারণেই প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠোর।



মানচিত্র নং-১৬

বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে ক্রুসেডারদের যাত্রাপথ

মূল ধারাবর্ণনায় ফিরে আসি। ক্রুসেডাররা ত্রিপোলি অবরোধ প্রত্যাহার করে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হয় এবং প্রথমে বৈরুতে পৌঁছায়; এরপর সেখান থেকে সিডন হয়ে সুর (Tyre) অঞ্চলে। প্রতিটি অঞ্চলের মুসলমানরা ক্রুসেডারদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেতে তাদেরকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করে। এরপর ক্রুসেডার বাহিনী লেবাননের সীমানা পেরিয়ে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে পা রাখে এবং কালব নদী (The Nahr al-Kalb) পাড়ি দেয়। কালব নদী ছিল তৎকালীন সেলজুক সাম্রাজ্য ও উবায়দি

---

৪২৪. Setton: op. cit. vol. 1, p. 316.

সাম্রাজ্যের পার্থক্যরেখা। এরপর ক্রুসেডাররা আক্কা (Acre/Akka) অতিক্রম করে। আক্কায় নিযুক্ত উবায়দি প্রশাসক ক্রুসেডার বাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য ও রসদপত্র সরবরাহ করেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের পর ক্রুসেডারদের আনুগত্য করার অঙ্গীকার করেন।[৪২৫]

এরপর ক্রুসেডাররা একে একে কায়সারিয়া ও আরসুফ[৪২৬] (Arsuf/ Apollonia) অতিক্রম করে।[৪২৭] এরপর তারা পথ পরিবর্তন করে উপকূলীয় পথ ছেড়ে জনপদের ভেতর দিয়ে পূর্ব দিকে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। পথে তারা রামলা দখল করে নেয়। রামলা যদিও ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র একটি নগরী; কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগামী পথের ওপর রামলার নিয়ন্ত্রণ ছিল। ইউরোপ থেকে ক্রুসেডারদের সহায়তায় আগত রসদবাহী জাহাজ ও নৌবহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রামলার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি ছিল।[৪২৮]

বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করার জন্য ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ রামলায় কিছুদিন অবস্থান করে। এটি ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের শুরুর দিকের ঘটনা।

মিশর দখলের চিন্তা!

এই বৈঠকে ক্রুসেডাররা অতি গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য ক্রুসেড অভিযানের পরিকল্পনা নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল এবং ভবিষ্যৎ ক্রুসেড অভিযানগুলোর গতিপথ কেমন হতে পারে, তার রূপরেখা সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।

---

৪২৫. টোডিবো, *তারীখুর-রিহলাতি ইলা বাইতিল মাকদিস*, পৃষ্ঠা : ২৯৪-২৯৯, উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ ফী-মা ওয়ারাআল বিহার*, ১/৩৫৮ ও অজ্ঞাত ঐতিহাসিক, *আ'মালুল ফারানজা ওয়া হুজ্জাজি বাইতিল মাকদিস*, পৃষ্ঠা : ২৭৭।

৪২৬. আরসুফ : কায়সারিয়া ও জাফার মধ্যবর্তী শাম সাগরের একটি উপকূলীয় নগরী। ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ১/১৫১।

৪২৭. Albert d' Alex, p. 460.

৪২৮. অজ্ঞাত ঐতিহাসিক, *আ'মালুল ফারানজা ওয়া হুজ্জাজি বাইতিল মাকদিস*, পৃষ্ঠা : ২৭৭, ফুশিয়া আশ-শারতিরি (Foucher de Chartres), *তারীখুল হামলাতি ইলাল কুদস*, পৃষ্ঠা : ৭০ ও উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ ফী-মা ওয়ারাআল বিহার*, ১/৪০০।

ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ এ সময় কায়রোতে আক্রমণ ও মিশর পতনের সম্ভাব্যতা নিয়ে মতবিনিময় করে।[৪২৯]

আজ থেকে নয় শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্বে ক্রুসেডারদের চিন্তাধারা কত অগ্রসর ছিল! সে সময়ই ক্রুসেডাররা উপলব্ধি করে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবিকাঠি কায়রোতেই আছে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তখন মিশরের শাসকগোষ্ঠী উবায়দিদের হাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণ ছিল। কারণ, ক্রুসেডাররা পুরোপুরি বুঝে ফেলেছিল যে, উবায়দিরা ক্রুসেডার বাহিনীর আগমনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ক্রুসেডারদের এই উপলব্ধি ও পর্যালোচনা ছিল বিশাল মিশর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিস্তৃতির কারণে। মিশর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে ফিলিস্তিনকে ঘিরে আছে। মিশরের আছে বিশাল জনশক্তি, অত্যুচ্চ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং ফিলিস্তিনের সঙ্গে বিশেষত মসজিদুল আকসার ধারক বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর সঙ্গে স্বভাবজাত নৈকট্য-অনুভূতি। এ কারণেই ক্রুসেডাররা তাদের এই বৈঠকে মিশরে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দুঃসাহসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের ছিল না। বিশেষ করে এ বিষয়টিও তাদের মাথায় ছিল যে, মিশর আক্রমণ করতে হলে তাদের সিনাই মরুভূমির সুকঠিন মরু অঞ্চল পাড়ি দিতে হবে। হতে পারে এই কঠিন বাধা পাড়ি দিতে গিয়ে ক্রুসেড শক্তি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব দিক বিবেচনা করে তারা আপাতত এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চিন্তা পরিহার করে এবং সরাসরি বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু এই বৈঠক ছিল অতি সুস্পষ্ট এক চিন্তা-পরিকল্পনা, যা ক্রুসেড অভিযানসমূহের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের মনমস্তিষ্কে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পঞ্চম ও সপ্তম ক্রুসেড অভিযানে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এ দুটি ক্রুসেড অভিযান সরাসরি মিশরকে টার্গেট করেই পরিচালিত হয়েছিল।[৪৩০]

---

৪২৯. Raymond d'Aix, p. 299; Chalandon: p. 267; Grousset: 1, pp. 150-151.

৪৩০. Albert d' Aix, p. 292.

সুন্নাতুল্লাহ ও শাশ্বত রীতি

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, ক্রুসেডার বাহিনী যখন এন্টিয়ক থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয়শ কিলোমিটারেরও অধিক পথ পাড়ি দিয়েছিল, এই সুবিশাল অঞ্চলের মুসলিম সৈন্যদল তখন কোথায় ছিল?!

সুবিস্তৃত এসব অঞ্চলে কি একজন বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ নেতাও ছিল না?!

বস্তুত ইতিহাসের ওই দুর্যোগপূর্ণ সন্ধিক্ষণে মুসলমানরা জাতিগঠনের মূল ও মৌলিক উপাদানগুলোই হারিয়ে ফেলেছিল। এ কারণেই সমকালীন মুসলিম শক্তিগুলো বাধাপ্রদান দূরে থাক, ক্রুসেডারদের সাদরে স্বাগত জানায় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা-ভূমি, প্রথম কিবলা, তৃতীয় হারাম শরিফ ও বরকতপূর্ণ ভূখণ্ড বাইতুল মুকাদ্দাসকে অপবিত্র করার ঘটনা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়। পবিত্র ভূমিতে অপবিত্র পদচারণায় তাদের হৃদয়জগৎ সামান্যও কম্পিত হয়নি; কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্রতা রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। এ কারণেই ক্রুসেডাররা নির্বিঘ্নে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে যায় আর মুসলমানরা হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ!

তৎকালীন মুসলিমসমাজ নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল।

তারা আক্রান্ত ছিল ধর্ম-বিচ্ছিন্নতার ব্যাধিতে, ইসলামি মমত্ববোধ-শূন্যতার রোগে। বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী আকিদার প্রতি সম্বন্ধিত আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলার ব্যাধিতেও আক্রান্ত ছিল সমকালীন মুসলিমসমাজ।

তারা আক্রান্ত ছিল বেদনাদায়ক বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার ব্যাধিতে। প্রতিটি নগরী একেকটি স্বতন্ত্র ইমারত ও বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। বরং প্রত্যেকেই নিজ মুসলিম প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত ছিল।

তৎকালীন মুসলিমসমাজ নির্ভেজাল ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের শূন্যতায় ভুগছিল। এমন কোনো নেতা ছিলেন না, যিনি বিভক্ত জাতিকে একক কাঠামোতে পরিণত করবেন, ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিলিপ্সার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জাতির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট থাকবেন।

সেকালের মুসলমানগণ প্রভাবিত ছিল যাপিত বাস্তবতার বাহ্যিক দর্শন দ্বারা, প্রভাবিত ছিল চারপাশের ঘটনা-দুর্ঘটনা ও আপদ-বিপদ দ্বারা। তারা আক্রান্ত ছিল রাজনৈতিক প্রজ্ঞাস্বল্পতা ও সামরিক দক্ষতাশূন্যতার রোগে।

নিঃসন্দেহে সমকালীন মুসলিম উম্মাহ জটিল ও যৌগিক সংকটের এক যুগ অতিক্রম করছিল!

আমরা যদি তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর এই নতজানু অবস্থান ও পরাভবতায় বিস্ময়বোধ করে থাকি, তাহলে আমাদের তো আরও বেশি বিস্ময়বোধ করা উচিত ক্রুসেডারদের অবস্থানে! কীভাবে তারা সামান্য ভয়-ডর-শঙ্কার শিকার না হয়ে ইসলামি বিশ্বের এতটা গভীরে এত দীর্ঘ দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার সাহস করল এবং শত্রুভূমির কেন্দ্রমূলে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারল? তারা ঘন জন-অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চল পাড়ি দিয়েছে, সমৃদ্ধ সামরিক শক্তির অধিকারী বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, নিজেদের মাতৃভূমি হতে শত শত মাইল দূরত্বে চলে এসেছে। যদি তারা পরাজিত হতো, তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাদের পালাবার বা আশ্রয় নেওয়ার কোনো জায়গা আশেপাশে ছিল না!

কীভাবে তারা মানবিক স্বভাবগত ভয়কে জয় করেছিল? কীভাবে প্রদর্শন করতে পেরেছিল এমন চরম দুঃসাহসিকতা?

উত্তর হলো—আমরা গ্রন্থের শুরুতেই উল্লেখ করে এসেছি যে, ক্রুসেডাররা তৎকালীন ইউরোপের অতি কঠিন ও দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে এসেছিল। ইউরোপে তাদের জীবন ছিল মৃত্যুসম। ইউরোপের যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচণ্ড স্পৃহা তাদেরকে অন্য যেকোনো প্রাপ্তির জন্য পাগল করে তুলেছিল। তাদের দৃষ্টিতে ইউরোপে বিরাজমান প্রচণ্ড দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে মৃত্যু বেশি কষ্টদায়ক ছিল না।

অবশ্য কেবল এই চিন্তাধারাই ক্রুসেডার বাহিনীর প্রচণ্ড আগ্রাসী আচরণ, ভয়-ডরহীন মনোভাব ও বেপরোয়া-নিরুদ্বেগ কর্মনীতির একমাত্র কারণ হতে পারে না। কারণ, যত কষ্ট ও ক্ষুধার যন্ত্রণা থাকুক না কেন, নিজের প্রাণ সকলের কাছে অতি প্রিয়। বিশেষত যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই, জান্নাতের প্রতি স্বচ্ছ-সঠিক ঈমান নেই এবং জান কোরবান ও প্রাণ বিসর্জনের শক্তিশালী কোনো উদ্দীপক ও অনুপ্রাণিকা নেই, তারা কীভাবে এমন ভয়হীন অভিযান পরিচালনা করতে পারে?!

তাহলে এই সুকঠিন সমীকরণের প্রকৃত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ কী?

কেন-কীসের জোরে ক্রুসেডারদের হৃদয়জগতে এভাবে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে বীরত্ব উদ্ভাসিত হলো?!

বিষয়টির সঠিক উপলব্ধি লাভের জন্য আমাদের হজরত ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত একটি হাদিস পাঠ করতে হবে। হাদিসটি আমাদের সামনে চলমান পরিস্থিতিকে এমন সুস্পষ্ট করে তুলবে যে, মনে হবে—আমরা যেন তা দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।

নবীজি একদিন ইরশাদ করলেন—

«يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»

> শীঘ্রই এমন এক কাল আসবে, যখন বিভিন্ন জাতিবর্গ তোমাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে একে অন্যকে ডেকে আনে দস্তরখানে।

নবীজি এ কথা বলার পর উপস্থিত জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, 'তখন কি সংখ্যাস্বল্পতার দরুন আমরা এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হব?'

নবীজি উত্তর দিলেন—

«بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»

> বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় থাকবে অনেক। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে আসা খড়কুটোর মতো। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রভাব-ভীতি তুলে নেবেন এবং আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ঢেলে দেবেন।

জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওয়াহন (দ্বারা) কী (উদ্দেশ্য)?'

নবীজি উত্তর দিলেন,

«حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»

দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুবিরাগ।[৪৩১]

---

[৪৩১]. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪২৯৭, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২২৪৫০, আবু দাউদ তায়ালিসি, *মুসনাদুত তায়ালিসি*,=

ক্রুসেড অভিযানের সময় ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড ও জার্মানিসহ পশ্চিমা যেসব অঞ্চলের জাতিবর্গ একে অপরকে আহ্বান করেছিল, তারা এ কারণেই তা করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর হতে মুসলমানদের প্রভাব-ভীতি উঠিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে তারা মুসলমানদের পরোয়া করেনি, পরোয়া করেনি মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য, সুরক্ষিত দুর্গ ও অস্ত্রশস্ত্র কিছুরই। এ কারণেই আমরা ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে লক্ষ করেছি—ক্রুসেডার বাহিনীর কাছ থেকে কখনোই দুর্বল আচরণ প্রকাশ পায়নি, মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা সামান্য দ্বিধা করেনি। তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ নির্ভীক চিত্তে বিভিন্ন অঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে।

বিপরীতে মুসলমানদের অন্তরে অক্ষমতা, দুর্বলতা ও অবসন্নতা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। আর তাই যদিও ক্রুসেডাররা তাদের তুলনায় জনবল-অস্ত্রবল ও অন্যান্য বৈষয়িক বিবেচনায় দুর্বল ছিল; কিন্তু মুসলমানরা ক্রুসেডারদের নাম শুনতেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল।

উল্লিখিত হাদিসটিতে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রথম লক্ষণীয় ও ভাবনার বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে আমাদের প্রভাব-ভীতি তুলে নেন এবং তিনিই আবার আমাদের অন্তরে ভীরুতা-কাপুরুষতা ঢেলে দেন! কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আমাদের মহান প্রতিপালক কেন এমন করেন? যত কিছুই হোক—শেষ পর্যন্ত তো আমরা ঈমানদার, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী আর আমাদের শত্রুপক্ষ কাফির ও অবিশ্বাসী?!

এর উত্তর হলো—আল্লাহ তাআলা কেবল তখনই মুসলমানদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন যখন তারা নিজেদের ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িয়ে রাখে এবং কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানকে অপরিহার্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে। দ্বীনি বিষয়ে শিথিলতা সত্ত্বেও আল্লাহ যদি মুসলমানদের সাহায্য করতেন, তাহলে বিরাট ফিতনা সৃষ্টি হতো। তখন মানুষ বলত, 'আমাদের ইসলামি অনুশাসন মানার কী প্রয়োজন! ইসলাম না মেনেও তো আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি।' আর তাই এ জাতীয় বিস্ময়কর পরিস্থিতি

=হাদিস নং ৯৯২, ইবনে আবি শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, ৭/৪৬৩, বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ১০৩৭২ ও আবু নুআইম আল-আসবাহানি, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৮২।

সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমানদের আপন দ্বীনের বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার এবং বিজয়ের প্রকৃত চাবিকাঠির ওপর হাত রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ ধরনের বেদনাদায়ক পারস্পরিক আহ্বান সংঘটিত হওয়ার কার্যকারণ। প্রতিটি ট্র্যাজেডি ও দুর্ঘটনার বিবরণে যদিও অনেক শব্দ খরচ হয়; কিন্তু হাদিসে তার কার্যকারণ অতি সংক্ষেপে মাত্র দুই শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে—দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুবিরাগ।

মুসলমানরা দুনিয়ার সঙ্গে অননুমোদিত সম্পর্ক গড়েছিল; এমনকি আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণকেও অপছন্দ করছিল। আর শাশ্বত রীতি হলো—যে জাতি মৃত্যুকে ভয় করে, তারা অবশ্যই বশীভূত ও পরাভূত হবে। যে জাতি পৃথিবী ও পার্থিব সম্পদের মোহে আক্রান্ত হয়, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। নবীজি তো ইরশাদ করেছেন, 'দুনিয়া হলো অভিশপ্ত আর দুনিয়া অবলম্বনকারীর পরিণতি ধ্বংস।' কেবল পার্থিব জীবনের পতন ও ধ্বংসই নয়; তার আখিরাতও বরবাদ হবে।

এই কার্যকারণই আমাদের সামনে সেই উৎকণ্ঠাজনক শিথিলতা ও পরাভবতার তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে, যা আমরা তৎকালীন মুসলমানদের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি। তারা অতি মূল্যবান উপহারসামগ্রী ও প্রচুর অর্থসম্পদ নিয়ে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করছিল—ক্রুসেডাররা যেন তাদেরকে বেঁচে থাকতে দেয়! একটাই চাওয়া—জীবন এবং জীবন! সে জীবন যেমনই হোক না কেন!

আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে এরই নাম লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা!

এভাবেই পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আর দূরে বসবাসকারী মুসলমানরা পরম নিশ্চিন্তে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারা যেন সেদিনের প্রতীক্ষায় বসে আছে যেদিন তাদের পালা আসবে এবং তারাও দুর্যোগের শিকার হবে!

আল-কুদসের পতন

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন ক্রুসেডাররা রামলা ত্যাগ করে এবং ৭ জুন বাইতুল মুকাদ্দাসের নগরপ্রাচীরের কাছে পৌঁছায়। ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর (৪৮৮ হিজরি সনের ২৭ জিলকদ) ক্লেরমন্ট সম্মেলনের মাধ্যমে পোপ ২য় আরবান যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, অবশেষে সাড়ে তিন বছরেরও অধিক সময় পর ক্রুসেডাররা তার চূড়ান্ত

লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

পবিত্র নগরীর সাক্ষাৎ লাভের পর ক্রুসেডার যোদ্ধারা কেমন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিল, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তার বেশ উচ্ছ্বসিত বিবরণ দিয়েছেন।[৪৩২] এর একমাত্র উদ্দেশ্য হিংস্র ও বর্বর ক্রুসেড অভিযানের নোংরা রূপটিকে যথাসম্ভব দর্শনযোগ্য করে তোলা। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, ক্রুসেডার বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছতেই যথেষ্ট দ্বিধান্বিত ছিল। কারণ, তারা তো পথে অন্যান্য রাজ্যে আগ্রাসন চালিয়েই তুষ্ট ছিল। এই ক্রুসেডার বাহিনীই অর্থকড়ি, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, ভূ-মালিকানা ও নেতৃত্বসহ পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করে এসেছে; অঙ্গীকার ও শপথ করে তা ভঙ্গ করেছে। অধিকন্তু এর অব্যবহিত পরেই এই ক্রুসেডাররা পবিত্র নগরীর অভ্যন্তরে যা ঘটাতে যাচ্ছে, তা স্মরণ করলে তো সমগ্র মানবতাই লজ্জিত হয়! কাজেই তাদের সম্পর্কে পবিত্র নগরীর দর্শনলাভে আবেগাপ্লুত হওয়ার কাহিনি রচনা কতটা ধোপে টিকবে, তা বলাই বাহুল্য।

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন আল-কুদস নগরীকে ঘিরে কঠিন অবরোধ শুরু হয়।

ক্রুসেডাররা সময় নষ্ট না করে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যথেষ্ট পরিমাণ অবরোধসামগ্রী কাজে লাগায় এবং নগরপ্রাচীর লক্ষ্য করে একটানা গোলাবর্ষণ করতে থাকে।[৪৩৩] আল-কুদসের অভ্যন্তরে অবস্থানরত মুসলমানদের তখন নিস্ফল প্রতিরোধ এবং পতনকে যথাসম্ভব বিলম্বিত করানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

অবরোধ শুরু হওয়ার সপ্তাহখানেক পর ১৫ জুন অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র ও কিছু সৈন্য নিয়ে ইতালির জেনোভা থেকে কয়েকটি জাহাজ জাফা (Jaffa) নৌবন্দরে এসে পৌঁছায়। অল্প কয়েকটি জাহাজবিশিষ্ট ক্ষুদ্র নৌবহরটিই অতি সহজে জাফা বন্দরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কারণ, ক্রুসেডার বাহিনী আরসুফের কাছাকাছি আসার পরই জাফাবাসী শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল! আগত সামরিক সহায়তা ক্রুসেডারদের

---

৪৩২. Guillaume de Tyr, p. 318.

৪৩৩. Gesta Francorum, p. 195.

মনোবল ও শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।[৪৩৪] এ কারণেই অবরোধ আরও তীব্র ও শক্তিশালী করা হয়।

একে একে কঠিন ও দুঃসহ দিনগুলো অতিবাহিত হতে থাকে। অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্ব নীরবে এই বর্বরতা প্রত্যক্ষ করতে থাকে। এক দিন-দুই দিন করে একে একে কেটে যায় পূর্ণ এক মাস। দিনে দিনে উভয় পক্ষের জন্যই পরিস্থিতি কঠিন হয়ে ওঠে। জুলাই মাসের প্রচণ্ড গরমে উন্মুক্ত স্থানে ক্রুসেডারদের অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, ইতিমধ্যে উবায়দি বাহিনী অবরুদ্ধ আল-কুদস নগরী উদ্ধারের জন্য মিশর থেকে রওনা হয়েছে। আর তাই এন্টিয়ক অবরোধ চলাকালে ক্রুসেডাররা যেরূপ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, এবারও তেমন কিছু ঘটার পূর্বেই পবিত্র আল-কুদস নগরীর পতন ঘটানোর জন্য ক্রুসেডাররা দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে।[৪৩৫] তারা নগরপ্রাচীরের ওপর নজরদারি করতে কাঠের দুটি টাওয়ার তৈরি করে। বেথেলহাম (Bethlehem) এলাকার ঘরবাড়ি ভেঙে সেগুলোর ছাদের কাঠ দিয়ে টাওয়ারদুটি তৈরি করা হয়। এরপর ক্রুসেডাররা টাওয়ার ব্যবহার করে নগরীর অভ্যন্তরে হামলা শুরু করে। অবরুদ্ধ মুসলমানরা অগ্নিশর নিক্ষেপ করে প্রথম টাওয়ারটি জ্বালিয়ে দেয়।[৪৩৬] তবে অপর টাওয়ারটি ব্যবহার করে ক্রুসেডাররা চাপ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। এরপর কিছু সৈন্য নগরপ্রাচীরের ওপর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে[৪৩৭] এবং ভেতর থেকে ফটক খুলে দিতে সক্ষম হয়। ক্রুসেডাররা এবার তীব্র গতিতে পবিত্র নগরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! সেদিন ছিল ৪৯২ হিজরি সনের ২২ শাবান মোতাবেক ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুলাই। বেদনাদায়ক সেই দিনটি উম্মাহর ইতিহাসে চিরদিন অবিস্মৃত হয়ে থাকবে।[৪৩৮]

নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেই 'আবেগাপ্লুত' ক্রুসেডারদের হিংস্র ও বর্বর

---

৪৩৪. অজ্ঞাত ঐতিহাসিক, *আ'মালুল ফারানজা ওয়া হুজ্জাজি বাইতিল মাকদিস*, পৃষ্ঠা : ২৭৮-২৭৯ ও উইলিয়াম সূরি, *তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ ফী-মা ওয়ারাআল বিহার*, ১/৪২১-৪২৪।
Heyd: Hist. du Commerce, 1, pp. 134-135 & Cam. Med. Hist. Vol. 5. p.258.

৪৩৫. Runciman, op. cit., 1, pp. 283-284.

৪৩৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯।

৪৩৭. আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৫/১৪৮-১৪৯।

৪৩৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯।

রূপ প্রকাশ পেতে শুরু করে। আর তাই অবরুদ্ধ মুসলমানদের সামনে ক্রুসেডার সৈন্যদের সামনে থেকে পালানো ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ খোলা ছিল না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাইতুল মুকাদ্দাস এ সময় উবায়দি সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। প্রশ্ন হলো—নগরীটির অবরোধ ও পতনের সময় সেখানে নিযুক্ত উবায়দি গভর্নর ইফতিখারুদ্দৌলা কোথায় ছিলেন? কোথায় ছিল নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনরত উবায়দি সামরিক রেজিমেন্ট?

উত্তর বড় নির্মম! 'তিনি' এবং 'তারা' জনগণকে অরক্ষিত ফেলে রেখে দাউদের মিহরাবে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তিন দিন সেখানেই লুকিয়ে ছিল। এরপরের ঘটনা বেশ রহস্যাবৃত। ক্রুসেডারদের সহায়তায় পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হয়; তারপর কোনো প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন ব্যতিরেকে সেখান থেকে আসকালান হয়ে মিশরে ফেরত পাঠানো হয়। এর মাধ্যমে বাহ্যত এ ধারণাই দৃঢ়তা লাভ করে যে, তারা নিজেদের নিরাপত্তা লাভের বিনিময়ে গোপনে ক্রুসেডারদের হাতে নগরী তুলে দেওয়ার চুক্তি করেছিল![৪৩৯]

এ কারণেই ক্রুসেডাররা যখন প্রবেশ করে, বাইতুল মুকাদ্দাস তখন সম্পূর্ণ সৈন্যশূন্য!

বর্বর ক্রুসেডাররা জবরদখলকৃত নগরীটিতে নির্মমতা চালানোর জন্য অগ্রসর হতে থাকে। ভীত-সন্ত্রস্ত নাগরিকদের সামনে তখন মসজিদুল আকসায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ ছিল না। তারা আশা করছিল—হয়তো ক্রুসেডাররা স্থানটির পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে কিংবা নিদেনপক্ষে উপাসনালয়ের মর্যাদা রক্ষা করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ক্রুসেডারদের মনমস্তিষ্কে নিকট-দূরবর্তী কোনো সময়েই এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ছিল না![৪৪০]

মসজিদুল আকসায় আশ্রয় গ্রহণকারী নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সত্তর হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। উবায়দি সামরিক রেজিমেন্ট ছাড়া

---

৪৩৯. প্রাগুক্ত, ৯/১৯।

৪৪০. Gesta Francorum, pp. 203-205.

বাকি সবাই নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় এবং এক দিনেই পুরো নগরী জনশূন্য হয়ে যায়।[৪৪১]

এই হলো সেই ধর্মীয় অভিযানের চূড়ান্ত রূপ, যার লক্ষ্য 'ঈশ্বর'-এর সন্তুষ্টি এবং 'যিশুখ্রিষ্ট'-এর সেবা!

নিঃসন্দেহে এ ঘটনা ছিল ইউরোপের ললাটের এক কলঙ্ক-দাগ, যা কালের পরিক্রমায় কখনো নিশ্চিহ্ন হবে না!

ক্রুসেড যুদ্ধসংক্রান্ত ঐতিহাসিক উইলিয়াম সুরি (William of Tyre) লিখেছেন—

> ক্রুসেডারদের প্রবেশকালে বাইতুল মুকাদ্দাস এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে। মুসলমানদের রক্তে নগরীটি রক্তপ্রান্তরে পরিণত হয়। নগরীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ভীতি ও আতঙ্ক।[৪৪২]

বরং ক্রুসেড যুদ্ধের সমসাময়িক জনৈক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে ক্রুসেডাররা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরের দিন সকালে তিনি যখন দর্শনার্থী হিসেবে সেখানে প্রবেশ করেন, তখন অনেক কষ্টে মুসলমানদের লাশের মধ্য দিয়ে রাস্তা পাড়ি দিতে সক্ষম হন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, নিহতদের রক্ত তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল![৪৪৩]

এ তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য যে, সেদিন কেবল মুসলমানদেরকেই হত্যা করা হয়নি; বরং বাইতুল মুকাদ্দাসে বসবাসকারী ইহুদিরাও এই হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। ক্রুসেডাররা ইহুদিদেরকে তাদের উপাসনালয়ে সমবেত করে

---

[৪৪১]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯।
কেবল ইবনুল আছির-ই নন, প্রাচ্যের বিভিন্ন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকও এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবনুল ইবরি (Bar-Hebraeus) বলেছেন, ফিরিঙ্গিরা নগরীটিতে এক সপ্তাহ অবস্থান করে মুসলমানদের হত্যা করতে থাকে। মসজিদুল আকসার অভ্যন্তরেই নিহত হয় সত্তর হাজারের অধিক মানুষ। দেখুন : ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৯৭। আর্মেনীয় ঐতিহাসিক ম্যাথিউ ডি এডেসা (Matthieu d' Edesse) উল্লেখ করেছেন, ক্রুসেডাররা যেসব মুসলমানকে হত্যা করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি হাজারের উর্ধ্বে। দেখুন : Doc. Arm, 1, p. 45.

[৪৪২]. Guillaume de Tyr, 1, p. 354.

[৪৪৩]. Raymond d' Aigles, p. 300.

সেখানে আগুন লাগিয়ে দেয়।[৪৪৪]

আক্ষরিক অর্থেই এটি ছিল জাতিগত নিধনের লক্ষ্যে পরিচালিত এক পরিকল্পিত গণহত্যা।

এই সংবাদ পৌঁছতেই ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি ভূখণ্ডে দুঃখ ও বিষণ্নতার এক বেদনাদায়ক ঢেউ বয়ে যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই দুঃখ শোক থেকে শক্তি সঞ্চয়ের কার্যকারণ বিবেচিত হয়নি; বরং নেতিবাচক এই দুঃখ-অনুভূতি মুসলিমসমাজকে অক্ষম ও নিশ্চল করে দেয়। আর তাই ইতিহাসের পাতায় আমরা এমন কোনো বিবরণ পাই না যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের পতনের পর কোনো মুসলিম বাহিনী মসজিদুল আকসা, আল-কুদস ও ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয়েছে কিংবা কোনো অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ এ বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণের জন্য শাসকশ্রেণির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে গণ-আন্দোলন করেছে।[৪৪৫]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল চরম ধর্মীয় ও চারিত্রিক বিপর্যয়; শাসক-জনগণ নির্বিশেষে সকলে এর শিকার ছিল।

বিপরীতে ক্রুসেডার বাহিনীর বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের সংবাদে খ্রিষ্টান বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। কারণ, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে ষষ্ঠদশ হিজরি সনে (৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) এ অঞ্চলে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (এবং নরম্যানরা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর) থেকে চারশ সত্তর বছরেরও অধিক সময় বাইতুল মুকাদ্দাস কখনোই খ্রিষ্টানদের দ্বারা শাসিত হয়নি। অধিকন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল ক্রুসেড অভিযানের ঘোষিত মূল লক্ষ্য। সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাস দখল মূলত ক্রুসেড অভিযান সফল হওয়ারই নিদর্শন। তদ্রূপ তা অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়নকারী পোপ ২য় আরবানেরও ব্যক্তিগত সাফল্য। অবশ্য এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, পোপ আরবানের আল-কুদস পতনের সংবাদ শুনে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি যদিও আল-কুদস পতনের দুই সপ্তাহ পর ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুলাই ইহধাম ত্যাগ করেন; কিন্তু আল-কুদস থেকে বহু দূরে রোমে অনেক দেরিতে এই বিজয়-সংবাদ পৌঁছায়। ফলে নিজ পরিকল্পনার চূড়ান্ত

---

[৪৪৪]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৭।

[৪৪৫]. আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৫/১৫০।

ফলাফল না জেনেই তাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়।[৪৪৬]

আমরা এ কথা মনে করি না যে, তার প্রেরিত ক্রুসেড সন্তানরা 'যিশুখ্রিষ্টের' নাম নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে যে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে, তা জানতে পারলে তিনি ব্যথিত হতেন। কারণ, তিনি ইতিপূর্বে এন্টিয়ক ও মাআ'ররাতুন-নোমানের গণহত্যার সংবাদ জেনেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বরং এরও পূর্বে ক্রুসেডাররা হাঙ্গেরির সেমলিন নগরীতে খ্রিষ্টান নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করলেও তিনি এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। আরবানের মৃত্যুর পর যিনি নতুন পোপ নির্বাচিত হন, সেই পোপ ২য় পাসকাল (Pope Paschal II)-ও আল-কুদসের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে কোনো ধরনের মন্তব্য করেননি। বরং কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় আজ পর্যন্ত কোনো পোপই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য বা ন্যূনতম দুঃখপ্রকাশও করেননি। অথচ সমস্ত ঐতিহাসিক স্বীকার করে যে, এই চরম বর্বর ও অমানবিক ঘটনা হাজার হাজার নিরপরাধ নাগরিকের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। অথচ কোনো কোনো পোপ হিটলারের ইহুদি নিধনের কারণে ইহুদিদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বরং খ্রিষ্টানরা যদিও বিশ্বাস করে যে, 'যিশুখ্রিষ্ট' ইহুদিদের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তথাপি তারা ইহুদি জাতির ওপর থেকে মাসিহ-হত্যার পাপের দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অবশ্য আমাদের নিষ্কম্প বিশ্বাসমতে আল্লাহর নবী হজরত ঈসা মাসিহ আ. নিহতই হননি; বরং মহান আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপদে তুলে নিয়েছেন।

﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

> সত্য কথা হচ্ছে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী, অতি প্রজ্ঞাবান। [সুরা নিসা : ১৫৭-১৫৮]

এই চরম বর্বর ও জঘন্য অপরাধের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে নীরবতাই যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বয়ে নিয়ে চলা এক আদর্শ! এই নীরবতার যদি কোনো অর্থ থেকে থাকে, তাহলে তা এটাই যে, ক্রুসেডাররা যে হিংস্র ক্রুসেডীয় চেতনার দাবিতে এ জাতীয়

---

৪৪৬. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৩১।

বর্বরতার প্রতি পরিচালিত হয়েছিল, সেই একই চেতনা আজও অনেক রাজনৈতিক, সামরিক ও আদর্শিক নেতৃবৃন্দের দেহ-মনে প্রবাহিত হচ্ছে।

আবারও বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসছি!

বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রাণের স্পন্দন পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পর এবং নগরীটি থেকে মুসলমানরা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর আল-কুদস পতনের দিন সন্ধ্যায় ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ বিজয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে কিয়ামা গির্জায় (The Church of the Holy Sepulchre) সমবেত হয়।[৪৪৭] কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা প্রত্যেকে এ সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি এই পবিত্র নগরীর শাসনক্ষমতা লাভের প্রার্থনাও করেছিল! এর প্রমাণ হলো, দুদিন পরই জুলাইয়ের ১৭ তারিখে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনের জন্য বিরোধরত নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়![৪৪৮]

'গডফ্রে' বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রহরী!

কে লাভ করবে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা?

বিষয়টি যেমন অত্যন্ত জটিল ছিল, তেমনই বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা নিয়ে বিবাদমান পক্ষও ছিল অনেক। বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ কেবল সম্পদ ও ভূখণ্ডের মোহেই ছিল না; এটি ছিল সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। কারণ, যিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হবেন, তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল খ্রিষ্টানের কাছে অনন্য মর্যাদার পাত্রে পরিণত হবেন। রোমান গির্জা, ইস্টার্ন গির্জা ও আর্মেনীয় গির্জাসহ নির্বিশেষে বৈশ্বিক গির্জায় তার বিশেষ অবস্থান-মর্যাদা সৃষ্টি হবে। তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। কারণ, আল-কুদস সকল ধর্মের কাছেই মর্যাদার স্থান। মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি সকল জাতির কাছেই আল-কুদসের রয়েছে অত্যুচ্চ মর্যাদা।

আল-কুদস ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক নগরী। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো নগরী এক্ষেত্রে আল-কুদসের সঙ্গে তুল্য নয়।

বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতা নিয়ে বিবাদমান পক্ষগুলো কারা?

---

৪৪৭. Guillaume de Tyr, 1, p. 357.

৪৪৮. Michaud: op. cit. 1, p. 428-429.

প্রথমেই আসবে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেসব সেনাপতির নাম, যারা তখন পর্যন্ত কোনো ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করেনি। অর্থাৎ এডেসা রাজ্যের শাসক বল্ডউইন এবং এন্টিয়ক রাজ্যের অধিপতি বোহেমন্ড বাদে সকল সেনাপতি।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাবিদার হলেন উত্তর ফ্রান্স, লোরেন ও জার্মানি থেকে আগত বাহিনীর প্রধান গডফ্রে। অভিযানের শুরু থেকেই গডফ্রে এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যা তাকে অন্যান্য সেনাপতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিল। তার বাহিনীতে এমন অনেক সামন্ত ও যুবরাজ শরিক ছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তির অধিকারী। এমনকি এডেসায় আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী বল্ডউইনও তার অধীনে ছিলেন। গডফ্রে জার্মানির প্রতাপশালী সম্রাট ৪র্থ হেনরির সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতেন। এতেও তার শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৃতীয়ত তিনি অন্যান্য ক্রুসেডার সেনাপতির কাছে জনপ্রিয় ও আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি উদার চিত্তে তাদের মতামত গ্রহণ করতেন। অধিকন্তু অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন যুদ্ধে গডফ্রের প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত ও ভূমিকাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৪৪৯] এ সবকিছু মিলিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে গডফ্রের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

ক্ষমতার আরেক দাবিদার ছিলেন ৪র্থ রেমন্ড। অভিযানের শুরু থেকেই তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যধারী ও পুরো ক্রুসেডার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে জাহির করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন পোপ ২য় আরবানের বন্ধু। তিনি কথায় কথায় যিশুখ্রিষ্ট ও ক্রুশের উদ্ধৃতি দিতেন। এ সবকিছু মিলিয়ে তিনি নিজেকে এই পবিত্র ভূমির নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করছিলেন। তবে রেমন্ড নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে বাস্তবতার চেয়ে উন্নতরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করতেন এবং তার এ প্রচেষ্টা অনেক সময় দাম্ভিকতার রূপে প্রকাশ পেত। ফলে অন্যান্য সেনাপতির কাছে তার অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছিল।[৪৫০] এজন্যই অনেক সময় উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়াই কেবল নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এবং তার আনুগত্যের প্রতি

---

[৪৪৯]. সাইদ আত্তর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২০৪।

[৪৫০]. প্রাগুক্ত, ১/২০৩।

নিজেদের অনাগ্রহ প্রকাশ করতে তারা তার বিরোধিতা করত।

অন্যান্য সেনাপতিও আল-কুদসের ক্ষমতার অভিলাষী ছিল। যদিও তাদের সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল উল্লিখিত দুজনের চেয়ে কম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বোহেমন্ডের ভাগ্নে নরম্যান সেনাপতি টেনক্রেডের কথা। এন্টিয়ক পতনের পর তিনি তার মামার সঙ্গে এন্টিয়কে থাকতে এজন্যই অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, তিনি কারও অধীনে না থেকে নিজের জন্য আলাদা কিছু করার এবং একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের শাসক হওয়ার স্বপ্ন লালন করতেন। এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ক্রুসেড অভিযান শুরুর একদম গোড়ার দিকে তারসুস ও আশেপাশের অঞ্চলের ক্ষমতা নিয়ে যখন তিনি বল্ডউইনের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তখনই তার এই লালসা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল।

অপরদিকে পশ্চিম ফ্রান্সের নরমান্দে অঞ্চলের ডিউক রবার্ট কার্থুজ অন্যদের তুলনায় নিজের সামর্থ্য স্বল্পতার বিষয়টি অনুভব করতেন। এ কারণেই তিনি স্বতন্ত্র কিছু লাভ করার পরিবর্তে অন্যের অধীনে একজন সেনাপতি হিসেবে থাকাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করছিলেন।

মোটামুটি এরাই হলো ক্রুসেড অভিযানের সেনাপতি এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের গুরুত্বপূর্ণ সিংহাসন লাভের সম্ভাব্য প্রার্থী॥

কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের সিংহাসন লাভের অভিলাষ কি কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল?!

এ বিষয়ে সামান্যও সন্দেহ নেই যে, ক্যাথলিক গির্জারও বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কারণ, ক্রুসেড অভিযান মূলত পোপ ২য় আরবানের নির্দেশনায়ই শুরু হয়েছিল আর আমরা পূর্বেও উল্লেখ করে এসেছি যে, তৎকালে গির্জা কেবল ধর্মীয় সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠানই ছিল না; গির্জা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী এক শক্তি, যার নিজস্ব জায়গির, সেনাবাহিনী, ধনসম্পদ সবই ছিল। স্বয়ং পোপেরও সাধারণ শাসক-প্রশাসকদের ন্যায় বরং তাদের চেয়েও বেশি ক্ষমতার অভিলাষ ছিল। আর এ তো বাইতুল মুকাদ্দাস। এই পবিত্র ভূমির ওপর তো গির্জার অধিকার সম্পূর্ণই যৌক্তিক।

তবে শেষ কয়েকদিনে ক্যাথলিক গির্জা বড় দুটি আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমটি হলো ক্রুসেড অভিযানে শরিক পোপের প্রতিনিধি

অ্যাডমারের মৃত্যু। তিনি বছরখানেক পূর্বে এন্টিয়কে মারা গেছেন।[৪৫১] তিনি ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে থাকলে তার বাইতুল মুকাদ্দাসের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণই যৌক্তিক বিষয় হতো।[৪৫২] দ্বিতীয় আঘাতটি ছিল ক্রুসেড অভিযানের প্রধান পরিকল্পক, সমন্বয়ক ও উদ্দীপক স্বয়ং পোপ আরবানের মৃত্যু। স্বভাবতই এ বিষয়ে তার আগ্রহ ও উদ্দীপনা নতুন পোপ ২য় পাসকালের চেয়ে বেশি ছিল।[৪৫৩] এ কারণেই পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের স্বাধীন কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

ইউরোপে নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজন্যবর্গের সঙ্গে ধর্ম ও গির্জার প্রতিনিধিত্বকারী পোপ, বিশপ ও পাদরিদের বিবাদের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। আমাদের বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতা লাভের সুযোগ ও সম্ভাবনা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বেশি ছিল।[৪৫৪]

অবশ্য আরও একটি শক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতা লাভে অভিলাষী ছিল। আর তা হলো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের সাম্রাজ্যবাদী লালসা এশিয়া মাইনরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটিও সুনিশ্চিত যে, বাইজান্টাইনরা তাদের এই অতীত ভুলে যায়নি যে, তারা একসময় বাইতুল মুকাদ্দাসসহ পুরো ফিলিস্তিন অঞ্চল শাসন করত। এখন তো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এ অঞ্চলে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামি শক্তিকে বিধ্বস্তপ্রায় দেখতে পাচ্ছে। সুতরাং এখনই সুযোগ নিজেদের পুরোনো মালিকানাধীন ভূখণ্ডগুলোকে পুনরুদ্ধার করার। অধিকন্তু ক্রুসেড অভিযানের শুরুতে একমাত্র রেমন্ড বাদে সকল সেনাপতি বাইজান্টাইন সম্রাটের আনুগত্যের শপথ করেছিল। এমনকি স্বয়ং রেমন্ডও সম্রাটের মর্যাদারক্ষার শপথ করেছিলেন। অধিকন্তু রেমন্ড পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ত্রিপোলি অবরোধের সময়সহ ক্রুসেড অভিযানের শেষ দিনগুলোতে সম্রাটের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।[৪৫৫]

---

৪৫১. Runciman, op. cit., 1, p. 289.

৪৫২. Setton: op. cit. 1, p. 338.

৪৫৩. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৩১।

৪৫৪. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুস সালাজিকা ফি বিলাদিশ শাম*, পৃষ্ঠা : ২৪৬।

৪৫৫. Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 138.

এ সবকিছুর অর্থ হচ্ছে, বাইতুল মুকাদ্দাসে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বাইজান্টাইন সম্রাটের নিশ্চুপ না থাকাই প্রত্যাশিত। এ কারণেই ক্রুসেডারদের জন্য জরুরি ছিল দ্রুত একজন নেতা নির্বাচন করা, যিনি পরিস্থিতি পুনঃবিন্যাস করবেন, সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করবেন এবং আগামী দিনগুলোর জন্য কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। বিশেষত এ বিষয়টিও তাদের ভাবনায় ছিল যে, উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আগ্রহ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ায় উবায়দিরাও নিশ্চয়ই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাবে। তা ছাড়া আগামী দিনগুলোতে প্রাচ্যের মুসলমান ও আব্বাসি খিলাফতের ভূমিকা কেমন হবে এবং তা মোকাবিলার পদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণও জরুরি ছিল।

পূর্ববর্তী বিশ্লেষণে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত গডফ্রে ও রেমন্ড এই দুই সামরিক নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর তাই এই দুই নেতার মাঝে যেন কোনো ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের ঘটনা না ঘটে, এ উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ ১৭ জুলাই বাইতুল মুকাদ্দাসের নেতৃত্ব নির্ধারণী সভায় মিলিত হয়।[৪৫৬]

যদিও ধনসম্পদের বিচারে রেমন্ড অধিক উপযুক্ত ছিলেন এবং ক্ষমতার প্রতি তার লালসা ও আগ্রহও ছিল অধিক;[৪৫৭] কিন্তু সেনাপতিগণ গডফ্রেকেই বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক হিসেবে নির্বাচনের বিষয়ে একমত হয়। কারণ, সেনাপতিগণ বিবেচনা করে দেখে যে, গডফ্রের উপস্থিতিতে তাদের মতপ্রকাশ ও অভিপ্রায় বাস্তবায়নের সুযোগ থাকবে। বিপরীতে রেমন্ড ছিলেন নিজ সিদ্ধান্তে প্রচণ্ড রকম অনমনীয় ও একগুঁয়ে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারও মতের তোয়াক্কা করতেন না।[৪৫৮]

এভাবেই গডফ্রে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ও নেতায় পরিণত হন!

বাইতুল মুকাদ্দাসের দায়িত্ব গ্রহণের সময় গডফ্রে এমন কিছু বিনম্র আচরণ প্রকাশের চেষ্টা করেন, যা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, ক্রুসেড অভিযান মূলত বাইতুল মুকাদ্দাসে খ্রিষ্টানদের

---

[৪৫৬]. উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ ফী-মা ওয়ারাআল বিহার*, ১/৪৪৪-৪৪৬ ও Chalandon: pp. 278-279; Grousset: 1, p. 165-168.
[৪৫৭]. Runciman: op. cit., 1, p. 291.
[৪৫৮]. সাঈদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২০৪।

ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই পরিচালিত হয়েছিল। প্রথমেই তিনি দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন যে, তিনি এই মহান দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নন। এর মাধ্যমে তিনি এই মিথ্যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি কোনো প্রকার ক্ষমতা বা নেতৃত্বের লোভে এ অঞ্চলে আসেননি! এরপর অন্যান্য সেনাপতির পীড়াপীড়ির পর স্বভাবতই তিনি দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তবে তিনি রাজা বা শাসক উপাধি ধারণে অস্বীকৃতি জানান এবং এমন একটি ধর্মীয় উপাধি ধারণ করেন, যা দ্বারা তার বিনয় প্রকাশ পায়। তিনি নিজেকে পরিচিত করেন 'বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রহরী' (Defender of the Holy Sepulchre) উপাধিতে।[৪৫৯] পাশাপাশি 'যিশুখ্রিষ্ট' যে অঞ্চলে কণ্টক-মুকুট (crown of thorns) পরিধান করেছেন, তিনি সেখানে স্বর্ণ ও মনি-মুক্তাখচিত মুকুট পরিধানে অস্বীকৃতি জানান![৪৬০]

এই কুশলী অভিনয়ের মাধ্যমে মূলত বিশ্ববাসীকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয় যে, ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাসে কেবল ধর্মের সহায়তায়ই আগমন করেছে এবং অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাপতিগণ ছিল সৎ, নিষ্ঠাবান ও বিনয়ী!

যখন এমন কিছু মুসলিম লেখকের লেখা পাঠ করি, যারা বিভিন্ন পশ্চিমা-খ্রিষ্ট উৎসের ওপর নির্ভর করে ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন, তখন বড় বিস্ময় জাগে। তাদের লেখায়ও পাওয়া যায় যে, গডফ্রেকে সচ্চরিত্র, বিনয়-নির্মোহতা ও ধার্মিকতার কারণেই বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক নির্বাচিত করা হয়েছিল!

এসব ঐতিহাসিকের যেন মনেই থাকে না যে, গডফ্রে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক নির্বাচিত হয়েছিলেন জুলাইয়ের ১৭ তারিখে অর্থাৎ সত্তর হাজার নারী-পুরুষ-শিশু মুসলিম নাগরিককে হত্যা করার মাত্র দুদিন পর।[৪৬১] আর এর পূর্বে একই রকম গণহত্যা চালানো হয়েছিল এন্টিয়ক ও মাআররাতুন-নোমান নগরীতেও।

---

৪৫৯. Runciman: op. cit., 1, p. 292-293.

৪৬০. Michaud: op. cit. 1, p. 436.

৪৬১. ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৯৯ ও আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯।

এরই নাম বিবেক-বুদ্ধিকে কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির সুযোগ না দিয়ে পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ হতে অক্ষরে অক্ষরে ইতিহাস বর্ণনার সংকট!

গডফ্রে ডি বোলোনের এসব আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো, এর মাধ্যমে তিনি অন্যান্য সেনাপতির হৃদ্যতা ও সহানুভূতি অর্জনের এবং ক্রুসেড বাহিনীর অভ্যন্তরে বিবাদমান দলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। আর বাইতুল মুকাদ্দাসের রক্ষক বা প্রহরী উপাধি ধারণ করা ছিল এক ধরনের তোষণনীতি! এর মাধ্যমে তিনি গির্জার নৈকট্য অর্জন এবং গির্জা কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক পদে স্বীকৃতি লাভ করতে চেয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাপকভাবে ইউরোপজুড়ে পদ-পদবি, জায়গির ও ক্ষমতা নিয়ে সম্রাট, শাসক ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে গির্জার সংঘাত বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এর সঙ্গে এ বিষয়টিও যোগ করুন যে, চলমান সংঘাতের বিষয় হলো পবিত্র আল-কুদস নগরী আর ক্রুসেড অভিযানের মূল আহ্বায়ক ও পুরো অভিযানের যাবতীয় বিষয়ের সমন্বয়ক হলেন ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পোপ ২য় আরবান। এসব বিষয়কে একসঙ্গে মনে রাখলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, সকলেই বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জার নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছিল। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, হঠাৎ করেই নিজেকে অতি ধার্মিক পরিচয়ে পরিচিত করার চেষ্টা করে গডফ্রে মূলত বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক-পদ ও বিশপ-পদ উভয়টি একসঙ্গে বাগাতে চেয়েছিলেন!

পরবর্তী সময়ে আল-কুদস নগরীর নতুন বিশপ বা গির্জাধ্যক্ষ নির্বাচনের সময় স্বয়ং গডফ্রেসহ ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ যে আচরণ করেছিল, তা দ্বারা উপরের দাবি আরও দৃঢ়তা ও সমর্থন লাভ করে। তারা সকলে মিলে এমন একজন দুর্বল ও তুলনামূলক অখ্যাত ব্যক্তিকে বিশপ নির্বাচিত করে, যার কোনো গৌরবময় অতীত তো নেই-ই; বরং ব্যাপকভাবে তার চরিত্র নিয়ে এবং বিশেষ করে ক্রুসেড অভিযান চলাকালে তার আচরণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। তিনি হলেন আরনাল্ফ মালকোরন (Arnulf Malcorone)। এমন দুর্বল চরিত্রের একজন ব্যক্তিকে এজন্যই গির্জাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়েছিল, যেন সে বাইতুল মুকাদ্দাসের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লালসা করতে না পারে। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আমরা দেখব যে, যখনই কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি গির্জার নেতৃত্ব লাভ করেছে, সে-ই এই

পবিত্র নগরীর ক্ষমতা লাভের জন্য সুস্পষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছে।[৪৬২]

ক্রুসেড অভিযাত্রীদের নেতা গডফ্রের বিনয় সম্পর্কে এতটুকু বিশ্লেষণই সম্ভব!

বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ তথ্যটিও প্রণিধানযোগ্য যে, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরই ক্রুসেডাররা নগর-পরিস্থিতি পুরো বদলে দেয়। তারা আল-কিয়ামা গির্জা হতে অর্থোডক্স পাদরিদের তাড়িয়ে দেয়। এতে স্থানীয় খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও বাধাদানের কোনো শক্তি তাদের ছিল না।[৪৬৩] নতুন শাসক গডফ্রে অর্থোডক্স পাদরিদেরকে 'সত্য ক্রুশ' ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। তারা ক্রুশটি লুকিয়ে রেখেছিল। খ্রিষ্টানদের মিথ্যা ধারণামতে যে কাষ্ঠখণ্ডে হজরত ঈসা মাসিহ আ.-কে চড়ানো হয়েছিল, তার নাম 'সত্য ক্রুশ'।[৪৬৪]

অর্থোডক্স বিশপ নির্ধারণের আশা হারিয়ে ফেলার পর বাইতুল মুকাদ্দাসে বসবাসকারী অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের সামনে এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ইতিপূর্বে ইসলামি শাসনের ছায়ায় প্রাচ্যের খ্রিষ্টানরা যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত, ক্রুসেডাররা এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তারা তার অনেকটাই হারিয়ে ফেলে।[৪৬৫]

ব্যর্থ পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা

এখন বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের পর কি ক্রুসেডারদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য পূরণ হয়েছে? এবার কি তারা সাম্রাজ্যবাদ, রাজ্যবিস্তৃতি ও দখলদারিত্বের প্রচেষ্টা হতে নিবৃত্ত হবে?

মানবপ্রবৃত্তি সর্বদাই কামনা করে আরও বেশি মালিকানা, আরও সম্পদ-আধিক্য।

---

৪৬২. Raymond d' Aigles: p. 302.

৪৬৩. Runciman : op. cit., 1, p. 294.

৪৬৪. Raymond d' Aigles : p. 302.
প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে কাষ্ঠখণ্ডে হজরত ঈসা আ.-কে শূলে চড়ানো হয়, তার ভগ্নাবশেষকে 'সত্য ক্রুশ' (The True Cross) বলা হয়। খ্রিষ্টানদের মহাসভার সিদ্ধান্ত ও খ্রিষ্টান চার্চের ঐতিহাসিক সক্রেটিস (Socrates Scholasticus)-এর দাবি অনুযায়ী ৩২৬-৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইনের মা হেলেনা সত্য ক্রুশ আবিষ্কার করেন। [অনুবাদক]

৪৬৫. Michaud : op. cit. 1, p. 438.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾

(পার্থিব ভোগসামগ্রীতে) একে অন্যের ওপর আধিক্যলাভের বাসনা তোমাদের উদাসীন করে রাখে। [সুরা তাকাছুর : ০১]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ»

আদমসন্তানের যদি দুই উপত্যকা ভরা সম্পদ থাকে, তাহলে সে তৃতীয় উপত্যকা কামনা করবে। একমাত্র মাটিই আদমসন্তানের উদর পূর্ণ করতে পারবে![৪৬৬]

ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তিচাহিদা এমনই হয়ে থাকে। তাহলে পশ্চিম ইউরোপ থেকে আগমনকারী এসব বর্বর, কঠোর হৃদয় ও কঠিন প্রকৃতির মানুষের চাহিদা ও লালসা কেমন হতে পারে?!

আর তাই বাইতুল মুকাদ্দাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরই ক্রুসেডাররা নিজেদের রাজ্য আরও বিস্তৃত করতে আশেপাশের নগর ও জনপদগুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করে। যুক্তি ছিল পবিত্র নগরী ও পবিত্র নগরীর পথের নিরাপত্তাবিধান!

যে বেদনাদায়ক বাস্তবতার মাঝে সমকালীন মুসলিম উম্মাহ বসবাস করছিল, তার কারণে ক্রুসেডারদের এই সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন মুসলমানদের জন্য আরও করুণতর পরিণতি টেনে নিয়ে আসে। কারণ, আশেপাশের এলাকাগুলোর মুসলমানরা তখন এমন একজন নিষ্ঠাপূর্ণ নেতার অভাবে ভুগছিল, যিনি তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর পথে সমবেত করবেন; মুসলমানরা এমন একতার অভাবে ভুগছিল, যা তাদের বিচ্ছিন্নতাকে দূর

---

৪৬৬. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬০৭২, ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১০৪৮, ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২৩৩৭, ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২২৫০ ও ইমাম দারিমি, *মুসনাদুদ-দারিমি*, হাদিস নং ২৭৭৮।

করে এক সুতোয় গাঁথতে সক্ষম হবে। তারা ভুগছিল জিহাদি চেতনা ও আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের মৃত্যুর চেতনাসংকটে। ফলে আল-কুদসের গণহত্যা তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেয়। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা যেকোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এ চিন্তা থেকেই ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের অবাধে কর্তৃত্ব ফলানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়।

আল-কুদসের পর ফিলিস্তিনে প্রথম পতন ঘটে নাবলুস (Nablus) নগরীর। নাবলুস আল-কুদস থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। নাবলুসের পতনঘটনা ছিল বড় লাঞ্ছনাকর। নগরীটির মুসলিম অধিবাসীরা নিজেরাই এসে ক্রুসেডারদের হাতে নগরভার তুলে দেয়! ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ের শেষ দিকে টেনক্রেড নাবলুসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৪৬৭]

আগস্টের চার তারিখে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের বিশ দিন পর উবায়দি বাহিনী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসকালান (Ashkelon) বন্দরে পৌঁছায়।[৪৬৮] উবায়দি বাহিনী বন্দর ত্যাগ করার পূর্বেই ক্রুসেডাররা তাদের আগমন সম্পর্কে অবগত হয় এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিটি স্থান থেকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য সমবেত হয়। উভয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল নিজ নিজ সর্বোচ্চ নেতা। ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন 'বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রহরী' গডফ্রে আর উবায়দি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান উজির ও যাবতীয় বিষয়ের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী আফজাল শাহানশাহ বিন বদর আল-জামালি।[৪৬৯] স্বয়ং উবায়দি খলিফার চেয়েও উজির আফজালের ক্ষমতা-প্রভাব ও সম্মান-মর্যাদা অধিক ছিল।

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ আগস্ট আসকালানে উভয় বাহিনীর মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অল্প সময় না যেতেই উবায়দি বাহিনী বিভক্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয়। আফজাল আল-জামালি কয়েকজন আস্থাভাজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে একটি জাহাজে করে মিশরে পালিয়ে যান। এই একটি অভিযানের মাধ্যমেই ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হতে হৃত অংশ পুনরুদ্ধারের জন্য উবায়দি

---

৪৬৭. Gesta Francorum, pp. 209 & Guibert de Nogent, p 304.

৪৬৮. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৭।

৪৬৯. Gesta Francorum, pp. 209.

সাম্রাজ্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সূচনা ও সমাপ্তি ঘটে।[৪৭০]

আসকালান ও সংকটময় পরিস্থিতি

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বিবরণে যাওয়ার পূর্বে আমরা এখানে একটু থেমে ক্রুসেডাররা ইসলামি নগরী আসকালানের প্রতি কী আচরণ করেছিল, তা সামান্য আলোচনা করতে চাচ্ছি। এর ফলে আমরা ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং তাদের যুদ্ধ ও বিজয়ের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারব; জানতে পারব তৎকালীন মুসলমানদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কেও।

সৈন্যদের সুউচ্চ মনোবলকে কাজে লাগিয়ে ক্রুসেডাররা তৎক্ষণাৎ আসকালান নগরী অবরোধ করে। নিরাশা ও হতাশায় আচ্ছন্ন কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলমানদের পক্ষে তখন গডফ্রে ও তার বাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি ছিল না। তাই তারা প্রতিরোধের পরিবর্তে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আসকালান নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ক্রুসেডার সেনাপতি রেমন্ড ইতিপূর্বে যেমন বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রহরারত উবায়দি রেজিমেন্টকে নিরাপত্তা প্রদান করে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে দিয়েছেন, তিনিই এখন আসকালানবাসীকেও নিরাপত্তা-অঙ্গীকার প্রদান করেছেন।[৪৭১] সম্ভবত তাদের কাছে এ সংবাদও পৌঁছেছিল যে, গডফ্রে ও রেমন্ডের মধ্যে ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ চলছে। ইতিপূর্বে রেমন্ড গডফ্রের প্রতি প্রতিশোধবশত এবং ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে নিজের উপস্থিতির প্রমাণ দিতে উবায়দি প্রহরীদের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। এ কারণে আসকালানবাসী বিবেচনা করে যে, তারা যদি গডফ্রের পরিবর্তে রেমন্ডের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, তাহলে তুলনামূলক ভালো হবে।[৪৭২] কারণ, তখন রেমন্ড গডফ্রের বিরোধিতা করার এবং আসকালানবাসীর কাছে জনপ্রিয়তা অর্জনের উৎসাহ দেখাবেন। কারণ, রেমন্ড তো নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য খুঁজে ফিরছেন। যদি তিনি তাদেরকে জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন,

---

৪৭০. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৭।
৪৭১. Setton: op. cit. 1, p. 837.
৪৭২. Runciman: op. cit., 1, p. 297.

তাহলে আসকালান কেন তার সেই স্বপ্নের রাজ্য হতে পারে না?!

বড় বিস্ময়কর ছিল আসকালানবাসীর চিন্তা!

বাস্তবেও তাদের অনুমান সত্য হয়েছিল!

আসকালানবাসীর সাড়া পেয়ে রেমন্ড উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎ আসকালান থেকে অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য গডফ্রের সঙ্গে বিতর্ক শুরু করেন। কিন্তু গডফ্রে নিশ্চিত ছিলেন যে, রেমন্ড আসকালানবাসীর প্রতি দয়াবশত কিংবা সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশের জন্য অবরোধ তুলতে চাচ্ছেন না; তিনি আসকালানকে নিজের রাজ্য বানাতে চাচ্ছেন। এটি ছিল স্বয়ং গডফ্রের লক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, তিনি তো চাচ্ছেন আসকালান বন্দরকে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ভূমধ্যসাগরের দিকে একটি বৃহৎ বহিঃগমন পথ তৈরি করতে এবং তুলনামূলক অভ্যন্তরীণ নগরী আল-কুদসের জন্য বহিঃবিশ্ব হতে আগত জনশক্তি, সামরিক সহায়তা ও রসদ সরবরাহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। পাশাপাশি তিনি এমন কিছু বাণিজ্যিক বন্দরের নিয়ন্ত্রণও লাভ করতে চাচ্ছিলেন, যা বাইতুল মুকাদ্দাসের অর্থনীতিকে চাঙা ও প্রাণবন্ত করে রাখবে।

এ কারণেই গডফ্রে সুস্পষ্ট ভাষায় রেমন্ডের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং রেমন্ডকে আসকালানের কর্তৃত্ব প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান। এতে রেমন্ড এত বেশি ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে অবরোধ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রকারান্তরে গডফ্রেকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে, পারলে তিনি যেন রেমন্ডকে ছাড়াই আসকালান অধিকার করেন![৪৭৩]

আর বাস্তবেও গডফ্রে আসকালান অধিকার করতে ব্যর্থ হন!

ফিলিস্তিনি নগরীসমূহের পতন

রেমন্ড সরে আসার পর আসকালান অবরোধকারীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। রেমন্ড নিজে তৎক্ষণাৎ একই লক্ষ্য ও স্বপ্ন নিয়ে আরসুফ অভিমুখে ছুটে যান। তার স্বপ্ন—আরসুফ হবে তার সেই স্বপ্নের রাজ্য। গডফ্রেও আসকালান ছেড়ে তার পেছনে ছোটেন! এবার আরসুফ নিয়ে রেমন্ড ও গডফ্রের মাঝে একই বিতর্কের পুনরাবৃত্তি! ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দাবিকৃত 'সৎ-ধার্মিক' নেতা গডফ্রে আরসুফকেও

---

৪৭৩. Raoul de cam (Hist. Occid 111), p. 703.

নিজের রাজ্যভুক্ত করতে চান।[৪৭৪]

রেমন্ড যদিও প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। অন্যান্য সেনাপতিও উপলব্ধি করে যে, গডফ্রে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, তাতে ভবিষ্যতে তারাও যদি কোনো ধরনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয় কিংবা কোনো ভূখণ্ডের অধিকার লাভের চেষ্টা করে, গডফ্রে অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেবেন। বিশেষত তারা তো রেমন্ডের চেয়েও দুর্বল। তাই তারা সকলে গডফ্রের জন্য ময়দান খালি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়!

রেমন্ড নিজে এন্টিয়কের আশেপাশে কোথাও নিজের জন্য রাজত্বের খোঁজে উত্তরে লেবানন ও শামের দিকে অগ্রসর হন। আর নরম্যান সেনাপতি রবার্ট কার্থুজ ও রবার্ট ডি ফ্ল্যান্ডার (Robert I de Flanders)-এর নেতৃত্বে অন্য সেনাপতিরা ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৭৫] এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা গডফ্রে ও তার সৈন্যদের জন্য ময়দান ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ সঙ্গে নিয়েই প্রত্যাবর্তন করে। গডফ্রের সঙ্গে ক্রুসেডার সেনাপতিদের মধ্য হতে একমাত্র টেনক্রেড থেকে যান। টেনক্রেড তার মামা বোহেমন্ডের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে গডফ্রের সঙ্গে থাকাকেই প্রাধান্য দেন। তার আশা ছিল গডফ্রের অধীনে হলেও ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে কোথাও নিজের জন্য একটি রাজ্য গড়ে তোলা। বিপরীতে এন্টিয়কের আশেপাশে এমন কোনো রাজ্য গড়ে তুলতে পারলেও সর্বময় ক্ষমতা তার মামার হাতেই থাকবে! মূলত এ জাতীয় ব্যক্তিস্বার্থ-চিন্তাই ক্রুসেড অভিযানের প্রত্যেক সেনাপতির কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছিল!

গডফ্রেও টেনক্রেডকে নিরাশ করেননি। তিনি তাকে জালিল (Galilee) অঞ্চল দখল করার নির্দেশ দেন এবং বলে দেন যে, দখল করতে সক্ষম হলে টেনক্রেডই উক্ত অঞ্চলের প্রশাসক হবেন। দায়িত্ব পেয়ে টেনক্রেড অত্যন্ত উদ্যমী হয়ে ওঠেন।[৪৭৬] তার জন্য অবশ্য এটি কঠিন কোনো বিষয়ও ছিল না। কারণ, যদিও তার সৈন্যসংখ্যা কম ছিল এবং অধিকাংশ

---

৪৭৪. Albert d` Aix, p. 498.

৪৭৫. Stevenson: op. cit., p. 36.

৪৭৬. Raoul de Caen p. 703 &Guillaman: de tyr, 1, p.p. 384.

সেনাপতি ও সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর তার সামর্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়েছিল; কিন্তু অঞ্চলটির অধিবাসীগণ ছিল আরও বেশি দুর্বল। ফলে তিনি অল্প সময়েই জালিল অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হন।[৪৭৭] এরপর তিনি অতি সহজে তাবারিয়া (Tiberias) নগরীও দখল করে নেন। তাবারিয়ার নাগরিকরা অবশ্য টেনক্রেড-বাহিনীর আগমনের পূর্বেই পালিয়ে যায়।[৪৭৮] এরপর তিনি জালিল অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বায়সান নগরীটিও একইভাবে দখল করে নেন। এভাবে পুরো জালিল অঞ্চল টেনক্রেডের তথা ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। অবশ্য শর্তানুযায়ী অঞ্চলটি স্বতন্ত্র রাজ্যের পরিবর্তে বাইতুল মুকাদ্দাসের করদরাজ্যে পরিণত হয়।[৪৭৯]

একে একে ফিলিস্তিনের অনেকগুলো নগরী ক্রুসেডারদের কর্তৃত্বে চলে যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নগরী হলো—বাইতুল মুকাদ্দাস, জাফা, রামলা, নাবলুস, বায়সান ও তাবারিয়া।[৪৮০] একই সময়ে অভিযানের এই পর্যায়ে ক্রুসেডাররা আক্কা, আসকালান বা আরসুফ দখল করতে ব্যর্থ হয়; ব্যর্থ হয় লেবাননে প্রবেশেও। ফলে ত্রিপোলি, বৈরুত ও সিডন অঞ্চল মুসলমানদের হাতে থেকে যায়।[৪৮১]

এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, বাইতুল মুকাদ্দাসসহ অধিকৃত প্রতিটি ফিলিস্তিনি নগরীতে ক্রুসেডার শক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কারণ, তাদের সৈন্যগণ অনেকগুলো নগরীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া সৈন্যদের বড় একটি অংশ ফিলিস্তিন ছেড়ে ফ্রান্সে চলে গিয়েছিল। ওদিকে রেমন্ড তার বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিন ও গডফ্রের কর্তৃত্ব হতে দূরে উত্তরে চলে গিয়েছিলেন।[৪৮২] কিন্তু ক্রুসেডাররা দুর্বল হলে কী হবে, এসব নগরীতে ইসলামি প্রতিরোধ শক্তি ছিল আরও দুর্বল। মূলত তৎকালীন মুসলমানরা সামরিক অঙ্গনে পরাজিত হওয়ার পূর্বেই মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা অনুভব করছিল—ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এককথায় অসম্ভব। মুসলমানদের এই পরাভবতার

---

৪৭৭. Runciman: op. cit., 1, p. 304.

৪৭৮. Albert d' Aix, pp. 217-218.

৪৭৯. Guillaman: de tyr, 1, p. 384.

৪৮০. কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরুবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৩০।

৪৮১. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 181 & Albert d' Aix, pp. 507-511.

৪৮২. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়া*, ১/২১২।

কারণেই সংখ্যায় অতি অল্প হওয়া সত্ত্বেও ক্রুসেডাররা এ অঞ্চলে স্থিতিশীল হতে সক্ষম হয়েছিল।

বিস্ময়বোধ করার পূর্বে আপনার-আমার চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের যাপিত কালে ইহুদিরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে বিশাল সংখ্যক মুসলিম জনগণবিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যখানে নিশ্চিন্তে বসবাস করছে?! তাহলেই আমরা সকলে উপলব্ধি করতে পারব যে, বিষয়টি সংখ্যা-সরঞ্জামের প্রতুলতা-অপ্রতুলতার সঙ্গে জড়িত নয়; সম্পূর্ণই ধর্ম ও বিশ্বাস, চিন্তা ও চেতনা এবং আদর্শের সঙ্গে জড়িত।

গডফ্রের প্রতারণাপূর্ণ কূটনীতি

আবারও একটু বিরতি! সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা ও অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তৃতি সত্ত্বেও ফিলিস্তিন-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গডফ্রে যে নীতি অবলম্বন করেন, এখানে আমরা তা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গ্রহণ করব। গডফ্রে অধিকৃত অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমাদের কর্তব্য—সেগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণে সচেষ্ট হওয়া। কারণ, ইতিহাস বারবার ফিরে ফিরে আসে!

১. গডফ্রে জাফা বন্দরকে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হন।[৪৮৩] তখনও পর্যন্ত জাফা বন্দরই ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের একমাত্র সামুদ্রিক বাতায়ন। বলা ভালো, জাফা বন্দর ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের জীবন-ধমনী (lifeline), যা সর্বদা উন্মুক্ত ও শক্তিশালী রাখা জরুরি ছিল। গডফ্রের তত্ত্বাবধানে জাফার বাণিজ্যিক ও সামরিক অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী করা হয়। ফলে তা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া ও দিমইয়াত বন্দরসহ আশেপাশের প্রতিটি নৌবন্দরে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।[৪৮৪]

২. গডফ্রে ফিলিস্তিনি উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তার জন্য ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্রসমূহের সঙ্গে চুক্তি করেন এবং তাদের কাছ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের জন্য বাণিজ্যিক ও সামরিক নৌবহর প্রেরণের অঙ্গীকার লাভ করেন। বিশেষ করে পিসা, জেনোভা ও ভেনিসসহ

---

[৪৮৩]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৪৩।

[৪৮৪]. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২১৫।

তৎকালীন ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্রগুলো ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহরের অধিকারী ছিল।[৪৮৫] এই চুক্তির ফলে ইতালিয়ানরা চলমান পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়। অনেকগুলো ইসলামি নৌবন্দরের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায়।[৪৮৬] বরং এরপর থেকে ইতালিয়ানরা মিশর থেকে আগত জাহাজগুলোতে আক্রমণ করে বাণিজ্যপণ্য নিয়ে যেত এবং বণিকদের হত্যা করত।[৪৮৭] এভাবে কালের পরিক্রমায় একসময় আক্কা, আরসুফ ও অন্যান্য নৌবন্দরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ক্রুসেডারদের পক্ষে সেগুলো দখল করাও সহজ হয়ে যায়।

৩. গডফ্রে সন্ত্রাস, আক্রমণ ও নির্দয় গণহত্যার নীতি অবলম্বন করে ব্যাপক ভীতিমূলক প্রভাব সৃষ্টি করেন। উদাহরণ হিসেবে আরসুফ নগরীর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু কৃষক একবার নিজেদের কৃষিজমি পরিচর্যার উদ্দেশ্যে আরসুফের দুর্গ থেকে বের হলে ক্রুসেডাররা তাদেরকে ধরে ফেলে; এরপর তাদেরকে হত্যা করেই ক্ষান্ত না হয়ে নাক, হাত-পা কেটে লাশ বিকৃত করে মুসলমানদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করে।[৪৮৮]

৪. ক্রুসেডাররা এমন একটি প্রতারণাপূর্ণ দুষ্ট পন্থা অবলম্বন করে, যা দ্বারা একদিকে ফিলিস্তিন অঞ্চলে তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, অপরদিকে প্রশাসন, নাগরিক জীবন, অর্থনীতিসহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনাও তাদের কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগিয়ে চলবে। এটি তো অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, শুধু ভীতি সঞ্চার নীতি কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনে না। ক্রুসেডাররা যদিও ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আপাতত নিরাপদ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু তারা অনুভব করছিল যে, এভাবে চলতে থাকলে শীঘ্রই তারা বাণিজ্যিক ও নাগরিক দিক থেকে নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হবে। কারণ, জনবলের বিবেচনায় ক্রুসেডাররা ছিল নিতান্তই দুর্বল। অধিকৃত

---

৪৮৫. Heyd : op. cit., 1, pp. 134-136.

৪৮৬. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 183 & Heyd : op. cit., 1, p. 136.

৪৮৭. Albert d' Aix, p. 516.

৪৮৮. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 182.

অঞ্চলের বিস্তৃত কৃষিভূমিতে চাষাবাদ করার জন্য তাদের যেমন মুসলিম কৃষক প্রয়োজন, বিভিন্ন নির্মাণকাজ ও কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য তেমনই প্রয়োজন মুসলিম শ্রমিক। এমনকি দুর্গ, নিরাপত্তাপ্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণের জন্যও প্রচুর মুসলিম কর্মী প্রয়োজন। পাশাপাশি ইতালিয়ান ও পশ্চিমাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বজায় রাখার জন্যও সেখানে মুসলিম নাগরিকদের উপস্থিতি প্রয়োজন। ক্রেতা না থাকলে তো একসময় বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং ইতালিয়ান জাহাজগুলো এ অঞ্চলে থাকতে না চেয়ে প্রস্থান করবে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বাইতুল মুকাদ্দাসের অর্থনীতিই নয়; সামরিক শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়বে।

এ সবকিছু বিবেচনা করে গডফ্রে ক্রুসেডারদের বৃহত্তর স্বার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন এক নীতি অবলম্বন করেন। আর তা হলো বর্তমানের পরিভাষায় 'শান্তি-আলোচনার নীতি'!

গডফ্রে তার এই প্রতারণাপূর্ণ নীতিটি নিয়ে ভাবতে থাকেন। নীতিটি বাস্তবায়ন করতে পারলে বিরাট স্বার্থোদ্ধার তো হবেই, বিনিময়ে কিছুই হারাতে হবে না। আর তাই তখনও পর্যন্ত যেসব ইসলামি নগরীর পতন ঘটেনি, তিনি সেসব নগরীকে তার সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেন। তার প্রস্তাব মেনে নিলে নগরীগুলোর শাসনক্ষমতা মুসলিম প্রশাসকদের হাতেই থাকবে এবং সেখানে ক্রুসেডার বাহিনীর কোনো অংশ অনুপ্রবেশ করবে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার ফলে মুসলিম প্রশাসকগণ নিজেদের চাহিদামতো প্রভাবক শক্তি ও সামাজিক অবস্থান লাভ করবে, জনগণও কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করবে। কিন্তু এ সবকিছুর বিনিময়ে গডফ্রে কী লাভ করবেন?!

এতে সামান্যও সন্দেহ নেই যে, গডফ্রের সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন কখনোই স্তিমিত হবে না। তাহলে কেন তিনি এ ধরনের শান্তি-আলোচনার পথ গ্রহণ করবেন?! তিনি তো সেই ব্যক্তি, যিনি তার অভিধান থেকে বহু পূর্বেই 'শান্তি' শব্দটি মুছে ফেলেছেন!

নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তের আড়ালে বিশাল ও সুনিশ্চিত স্বার্থ নিহিত ছিল। ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে যিনিই সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করবেন, তার

সামনেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। তবে দৃষ্টি যাদের অন্ধ কিংবা যারা জাতি, আত্মমর্যাদাবোধ ও দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বেচ্ছায় দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রেখেছে, তাদের কথা ভিন্ন।

যেসব স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য গডফ্রে এই ধূর্ত নীতি অবলম্বন করেন, সংক্ষেপে তার কয়েকটি হলো—

১. এটি সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ। আর তা হলো বাইতুল মুকাদ্দাসকেন্দ্রিক ক্রুসেড রাজ্যের স্বীকৃতি। মুসলিম শাসকগণ যখন গডফ্রের সঙ্গে শান্তি-আলোচনায় সম্মত হবে, তখন স্বভাবতই তা ক্রুসেড রাজ্যের প্রতি তাদের প্রত্যয়ন ও অনুমোদন হিসেবে বিবেচিত হবে। এর ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের এবং বাইজান্টাইনদেরও আইনগত বৈধতা অর্জিত হবে। প্রকারান্তরে যেন এই স্বীকৃতি প্রদান করা হবে যে, বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেডারদের; মুসলমানদের কোনো দিনই তা দাবি করার অধিকার নেই।

   যদিও এই বৈধতা প্রাথমিক অবস্থায় আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে থাকবে; কিন্তু ভবিষ্যতে এর প্রভাব অত্যন্ত জটিল হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে এমন অধিকার দাবি করা কঠিন হয়ে পড়বে, যা তাদের পূর্বপুরুষগণ প্রত্যাহার করেছিল।

২. ক্রুসেডাররা সংখ্যাস্বল্পতার সমস্যায় জর্জরিত ছিল। যদিও তারা ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের জন্য ইউরোপ থেকে খ্রিষ্টান নাগরিকদের নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছিল; তবে তাদের প্রয়োজন ছিল কর্মক্ষম প্রচুর হাত। দক্ষ জনশক্তির স্বল্পতার কারণে ভবিষ্যতে চাষযোগ্য জমিজমা পতিত ও অনুর্বর হয়ে যাওয়ার এবং খাদ্যদ্রব্যের জোগান কমে গিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ভয় ছিল। আশঙ্কা ছিল, দক্ষ জনবলের অভাবে ঘরবাড়ি ও দুর্গ নির্মাণের সামর্থ্য হবে না। বিপরীতে, যদি শান্তিপরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে, তাহলে সরল মুসলমানরা অবশ্যই ক্রুসেডারদের মালিকানাধীন ভূমিতে কাজ করার জন্য বের হবে। পরবর্তীকালে যখন ইউরোপ থেকে আগত ক্রুসেডারদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, তখন মুসলমানদের কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে, এমনকি প্রয়োজনে দেশ থেকেই বিতাড়িত করা হবে।

৩. ইতালিয়ান ব্যবসায়ীরা এর ফলে তাদের পণ্যসম্ভারের ক্রেতা এবং পুরো প্রাচ্যের দেশগুলোতে উন্মুক্ত বাজার পেয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে গডফ্রের এই সিদ্ধান্ত ছিল ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্রগুলোর জন্য বড় ধরনের একটি প্ররোচনা, যা তাদেরকে এ অঞ্চলে টিকে থাকার নিশ্চয়তা দিচ্ছিল। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতালিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা ক্রুসেডারদের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।

৪. এই আলোচনার ফলে ফিলিস্তিনবাসীর সঙ্গে অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্বের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, কদিন পরই যখন সকলে দেখবে যে, শত্রুপক্ষ ও অধিকৃত জনগণের মাঝে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান আছে, তখন তারা মন্তব্য করবে—ফিলিস্তিনবাসীই তো নিজেদের ক্ষয় ও বিনাশে সন্তুষ্ট আছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার কী প্রয়োজন! সঠিক ইসলামি উপলব্ধিবোধ-শূন্য পরিবেশে বসবাসকারী ইসলামি বিশ্বের মুসলমানগণ কিছুতেই অনুধাবন করতে পারবে না যে, এটি ফিলিস্তিনের আঞ্চলিক ইস্যু নয়; বরং ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বজনীন ইস্যু। ফিলিস্তিনবাসী যদি স্বেচ্ছায়ও নিজেদের ভূখণ্ড ইসলামের শত্রুদের হাতে বিক্রি করতে চায়, তাদের কোনোভাবেই সে অধিকার নেই।

৫. শীঘ্রই ফিলিস্তিনি সমাজে মারাত্মক বিভক্তি সংঘটিত হবে। বরং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে পুরো ইসলামি সমাজে। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি শ্রেণি পাওয়া যাবে, যারা বেঁচে থাকার মোহে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সমঝোতায় রাজি হবে এবং জবরদখলকারী শত্রুর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে খুশি থাকবে। তারা তিক্ত হলেও বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নেবে। বিপরীতে আরেকটি শ্রেণি এমন পাওয়া যাবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করবে, জুলুম-অবিচার প্রত্যাখ্যান করবে এবং নিজেদের দ্বীন ও ভূখণ্ডকে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাবে। আর এটা মোটেও অসম্ভব ও সুদূরপরাহত নয় যে, একসময় উভয় পক্ষ বিবাদ ও হানাহানিতে জড়িয়ে পড়বে; বরং বিষয়টি হয়তো সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে।

আর এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, এ জাতীয় সংঘাতের ঘটনা ঘটলে পরিণতিতে মুসলমানদের মাঝে হতাশা ও ব্যর্থতা সৃষ্টি হবে এবং

ইসলামি ভূখণ্ড জবরদখলকারীদের প্রতিপত্তি আরও দৃঢ়তা লাভ করবে।

এটি মোটেও কল্পনানির্ভর অনুমান নয়। বাস্তবে পুরোপুরি এমনটিই ঘটেছিল। কারণ, যারা ক্ষমতার গদি, বাণিজ্য-চুক্তি কিংবা নিরাপত্তাপ্রাপ্তির আশায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শিথিলতা করে গেছে, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের ওপর কোনো না কোনো সময় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিল।

৬. সম্ভবত এই শান্তি-আলোচনার অন্যতম ভয়াবহ পরিণতি এটিও যে, এর ফলে কালের পরিক্রমায় একসময় দখলদার ক্রুসেডারদের প্রতি মুসলমানদের প্রতিশোধমূলক চেতনাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কয়েক বছর বা কয়েক প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়ার পর কিছুতেই উভয় পক্ষের মাঝে জালিম-মজলুম বা ডাকাত-গৃহস্থের সম্পর্ক বিরাজমান থাকবে না এবং ক্রুসেডারদের কেউ অত্যাচারী শত্রু বিবেচনা করবে না। বরং অচিরেই উভয় পক্ষের সম্পর্ক হৃদ্যতা ও নৈকট্য, প্রীতি ও সম্প্রীতির সম্পর্কে রূপ নেবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়জগৎ হতে জিহাদ ও সংগ্রামের চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মুসলমানরা ক্রুসেডার রক্তপিপাসুদের শান্তিপ্রিয় উদার-সহনশীল ব্যক্তি হিসেবে দেখবে। শান্তি-আলোচনায় আগ্রহী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শান্তিপ্রিয়, অন্তরঙ্গ-সুহৃদ অভিধায় ভূষিত করা হবে আর যারা এই ক্ষতিকর ও দ্বীনি চেতনা-পরিপন্থী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, তাদেরকে পরিচিত করা হবে সন্ত্রাসী-বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে। বলা হবে, এসব লোক এ অঞ্চলের স্থিতিশীল-শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে; এদের দৃষ্টি ও চিন্তা-চেতনা বড় সংকীর্ণ; এরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত না করে তাকিয়ে থাকে পায়ের দিকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

৭. শান্তি-আলোচনা চলাকালে মুসলমানরা সব ধরনের সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকবে, তাদের পদচারণা শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে কিছুতেই কোনো বাহিনী গঠনের অনুমতি দেওয়া হবে না। মুসলমানরা হয়তো সর্বোচ্চ নিজেদের নাগরিক ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল রাখতে স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন করে নিজেদের নিরাপত্তা

রক্ষা করবে; ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি তাদের থাকবে না। ফলে ক্রুসেডাররা প্রতিটি কেন্দ্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। ক্রুসেডারদের অনুমতি ছাড়া কোনো মুসলিম নাগরিক নিজ অঞ্চল থেকে বের হতে পারবে না; অন্য কোনো ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশও করতে পারবে না। এভাবে বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে থাকবে, এ অঞ্চলের মুসলমানরা লড়াই ও সশস্ত্র প্রতিরোধের সকল পদ্ধতি ভুলে যাবে এবং ক্রুসেডার ও মুসলমানদের মধ্যবর্তী ফাঁকটি দিনে দিনে বিস্তৃত হবে।

৮. শান্তি-আলোচনা সফল হওয়ার পর এ অঞ্চলের মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ক্রুসেডারদের বার্ষিক জিজিয়া প্রদান করবে। এর ফলে একদিকে ইসলামি শক্তি নিঃশেষ ও অপরদিকে ক্রুসেড শক্তি চাঙা তো হবেই, এর পাশাপাশি ইসলামি ভূখণ্ডের অধিবাসীরা মানসিকভাবেও দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাবে। তারা সর্বদাই নিজেদের ক্রুসেড শক্তির বশীভূত বিবেচনা করে পরাধীনতার চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনা সফল হলে ক্রুসেডাররা যেসব স্বার্থ বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করছিল, তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো অনেক বড় ও সুবিস্তৃত প্রভাবক স্বার্থ। আর তাই যে রক্তপিপাসু গডফ্রে কয়েক দিন বা কয়েক মাস পূর্বে সত্তর হাজার মুসলমানকে হত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এখন যদি তিনি গণহত্যার শিকার না হওয়া অবশিষ্ট মুসলমানদের প্রতি শান্তির হাত বাড়িয়ে দেন, তা মোটেও বিরল বা সুদূরপরাহত নয়!

হায়! যুগে যুগে এভাবেই রক্তপিপাসু খুনীরা শান্তির হাত বাড়িয়ে দেয় আর আমরা তাদের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে ...!

আলোচ্য চিত্রটির পূর্ণরূপ সামনে আসার জন্য এ বিষয়টিও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, শান্তি-আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে ক্রুসেডাররা যা কিছু করছিল, তা সবই ছিল সাময়িক ও একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যেদিনই ক্রুসেডাররা নিজেদেরকে এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ইসলামি ভূখণ্ড দখল করার মতো শক্তিশালী মনে করবে, সেদিনই তারা দ্বিধাহীন চিত্তে সবকিছু ছুড়ে ফেলবে। তখন এই সমঝোতা চুক্তির মূল্য

কাগজের পাতায় মূল্যহীন কালির চেয়ে বেশি কিছু হবে না। তরবারি সেদিন যায়তুন ডালের স্থান দখল করবে। গোপনে নয়; পুরো বিশ্বকে দেখিয়ে-জানিয়ে সেদিন মুসলমানদেরকে খড়্গধারী জল্লাদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে আর মুসলমানরা নিজেদের চোখে বেঁধে রাখা পট্টির মূল্য পরিশোধ করবে!

অবশেষে আসকালান, আরসুফ, আক্কা ও কায়সারিয়াসহ বিভিন্ন ফিলিস্তিনি নগরীর সঙ্গে ক্রুসেডারদের সেই প্রতারণামূলক আলোচনাপর্ব সমাপ্ত হয়; আদর করে যার নামকরণ করা হয় 'শান্তি-আলোচনা'![৪৮৯] এসব নগরীর অধিবাসীরা পরবর্তী সুযোগে নতুন কোনো ক্রুসেড আগ্রাসন দেখার প্রত্যাশায় আরও কিছুদিনের জন্য বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা লাভ করে!

* * *

৪৮৯. Albert d' Aix, p. 507-515.

নবম পরিচ্ছেদ

বাইতুল মুকাদ্দাস পতনপরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ

ক্রুসেডারদের হাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন এবং ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের অবতরণের দুই বছরেরও অধিক সময়ের বিবরণ শেষ হওয়ার পর আমরা এখানে একটু বিরতি নেব এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বিবরণে যাওয়ার পূর্বে চলমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে সচেষ্ট হব।

কারণ, পরিস্থিতি ইতিমধ্যে বেশ জটাল ও জটিল পড়েছে। শাম অঞ্চল, ফিলিস্তিন ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলের শাসনক্ষমতা নিয়ে বিবাদমান পক্ষ যেহেতু অনেক, তাই ক্রুসেড ইতিহাসের পরবর্তী অংশের বিবরণ ও বিবর্তন যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য ময়দানে বিদ্যমান প্রতিটি শক্তির অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গ্রহণ করা দরকার। এ কারণেই আমরা সামনে দশটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আলোচনা করব এবং ঘটনাপ্রবাহে ভূমিকা রাখতে সক্ষম প্রতিটি শক্তি ও পক্ষ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করব।

[এক] ইসলামি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা ক্রুসেড রাজ্যসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন বাস্তবায়নে সুদূর পথ অতিক্রমকারী ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ

ইসলামি ভূখণ্ডে গড়ে ওঠা প্রথম খ্রিষ্টরাজ্য ছিল এডেসা। এডেসার শাসনক্ষমতা ছিল গডফ্রের ভাই বল্ডউইনের হাতে। এডেসা রাজ্যের মূল ঘাঁটি ছিল ফুরাতের পশ্চিমে অবস্থিত এডেসা নগরী। বল্ডউইন সুমাইসাত ও সারুজ নগরীকেও তার রাজ্যপরিসরে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে রাজ্যটির অবস্থান দাঁড়ায় ফুরাতের পশ্চিমে দজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী অংশে তথা জাযিরা অঞ্চলের উত্তরে। তৎকালীন এডেসা রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কে অবস্থিত। এডেসা রাজ্যের অধিকাংশ নাগরিক ছিল আর্মেনীয় খ্রিষ্টান। তখন পর্যন্ত এডেসা রাজ্য অন্যান্য ক্রুসেডার শক্তি বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

কারোই অধীনতা স্বীকার করেনি; বরং রাজ্যটি ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটি রাজ্য। এর মাধ্যমে বল্ডউইনের একক রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছিল।[৪৯০]

দ্বিতীয় খ্রিষ্টরাজ্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল এন্টিয়ক রাজ্য। মূলত এন্টিয়ক নগরীকে কেন্দ্র করেই রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এন্টিয়কের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব পাশের ছোট ছোট কিছু জনপদও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এন্টিয়ক রাজ্যের ক্ষমতার লাগাম ছিল নরম্যান সেনাপতি বোহেমন্ডের হাতে। এন্টিয়কে নিয়োজিত অধিকাংশ সৈন্যও ছিল নরম্যান। বোহেমন্ড তুলুজের কাউন্ট ৪র্থ রেমন্ডের সঙ্গে সংঘাতের পর এন্টিয়কে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এন্টিয়কের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ছিল বোহেমন্ডের বাহিনীর ক্যাথলিক খ্রিষ্টান, অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ও দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বসবাসকারী আর্মেনীয় খ্রিষ্টান। নগরীটির মুসলিম নাগরিকদের অধিকাংশকে হত্যা করা হয়েছিল। হাতেগোনা যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে বিতাড়িত হয়েছিল।

এন্টিয়ক রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বল্ডউইনের পর আরেক ক্রুসেডার সেনাপতি বোহেমন্ডের স্বপ্নও পূরণ হয়েছিল। তিনি বৃহত্তর ক্রুসেডার বাহিনীর প্রভাবমুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই সঙ্গে বোহেমন্ড বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের সঙ্গে স্থাপিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কও অস্বীকার করেছিলেন। ফলে এন্টিয়ক রাজ্য মুসলমানদের পাশাপাশি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যেরও শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।[৪৯১]

যদিও উল্লিখিত রাজ্যদুটি বাইতুল মুকাদ্দাসগামী মূল ক্রুসেডার শক্তি হতে সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন ছিল; কিন্তু রাজ্যদুটির অস্তিত্ব দখলদার ক্রুসেডার শক্তির জন্য যথেষ্ট সহায়ক বিবেচিত হচ্ছিল। এডেসা ও এন্টিয়ক রাজ্য ক্রুসেডার বাহিনী থেকে সেলজুক বাহিনীগুলোকে বিচ্ছিন্ন রাখার দায়িত্ব পালন করছিল। রাজ্যদুটির অস্তিত্বের কারণেই বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযান চলাকালে ক্রুসেডার বাহিনীর পৃষ্ঠদেশ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই দুটি রাষ্ট্র বিশেষত এডেসা রাজ্য পরবর্তী বছরগুলোতেও ইসলামি বিশ্বের পূর্ব অংশ

---

[৪৯০]. দেখুন : কাসিম আবদুহু কাসিম, *মাহিয়াতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১২২-১২৩।

[৪৯১]. দেখুন : সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/১৬০-১৬১।

হতে আগত আক্রমণসমূহের প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করে।

ইসলামি ভূখণ্ডে গঠিত তৃতীয় রাজ্যটি ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য। সামনের আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাজ্যটি পরবর্তীকালে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি পরিপূর্ণ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের তুলনামূলক বিস্তৃত পরিসরের ওপর বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য গড়ে উঠেছিল। মূল আল-কুদস নগরী ছাড়াও জাফা, রামলা ও লুদ (Lod) নগরী এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা ছাড়া আক্কা, কায়সারিয়া, আরসুফ ও আসকালানের সঙ্গে রাজ্যটি শান্তিচুক্তি করেছিল। এই নতুন রাজ্যটির ক্ষমতা ছিল আরেক ক্রুসেডার সেনাপতি গডফ্রের হাতে। প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলোর মধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, খ্রিষ্টানবিশ্বের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরী আল-কুদস ছিল এই রাজ্যটির অধীনে। এ কারণেই রাজ্যটির শাসক গডফ্রে নিজেকে একই সঙ্গে সমকালীন খ্রিষ্টান শাসক-প্রশাসকদের বৈশিষ্ট্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং পাদরি ও সন্ন্যাসীদের বৈশিষ্ট্য ধর্মবাদ—বিপরীতমুখী উভয় গুণে নিজেকে উপস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। আর এ কারণেই তিনি গভর্নর বা রাজা ইত্যাদির পরিবর্তে ধারণ করেছিলেন 'বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রহরী' উপাধি।

এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, ইতালিয়ান জাহাজগুলোর মাধ্যমে সাগর পথে সহায়ক বাহিনীর আগমন সত্ত্বেও ক্রুসেডারদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। আর তাই অধিকৃত প্রতিটি নগরীর নিরাপত্তায় অতি সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়োজিত ছিল। অবশ্য ব্যাপকভাবে ক্রুসেডারদের প্রতি মুসলিম সমাজে সৃষ্ট ভীতি ও আতঙ্কের কারণে ক্রুসেডারদের খুব কমই মুসলমানদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে হচ্ছিল।

অপরদিকে ফরাসি সেনাপতি ৪র্থ রেমন্ড তখনও পর্যন্ত নিজের জন্য কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। প্রথমে এন্টিয়কে, এরপর পর্যায়ক্রমে লেবাননের ইরকায়, ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং সবশেষে আসকালানে তার নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ কারণেই প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ রেমন্ড পুরো ফিলিস্তিন অঞ্চল ত্যাগ করে ত্রিপোলি নগরীর আশেপাশে কোথাও রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে তার সৈন্যদের নিয়ে লেবাননের দিকে অগ্রসর হন।

মোটামুটি এই ছিল চলমান পরিস্থিতিতে ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থা। যদিও তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত ও নিঃশেষ হয়েছিল; কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি ভূখণ্ডে অবতরণের মাত্র দুই বছরের মধ্যে ইসলামি বিশ্বের অভ্যন্তরে তিন-তিনটি খ্রিষ্টরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা দৃশ্যমান সাফল্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এরপরও অব্যাহত ছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী লালসা ও রাজ্যপরিধি বৃদ্ধির চাহিদা।



মানচিত্র নং-১৭

৪৯২ হিজরি সনে/১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেড রাজ্যসমূহ

[দুই] রোমের ক্যাথলিক গির্জা

রোমের গির্জাই বাইতুল মুকাদ্দাসকে নিজ কর্তৃত্বভুক্ত করার মানসে ক্রুসেড যুদ্ধের আহ্বান করেছিল। বাইতুল মুকাদ্দাসেই ছিল বিখ্যাত আল-কিয়ামা গির্জা। রোমের গির্জা বোহেমন্ড, বল্ডউইন, গডফ্রে বা ৪র্থ রেমন্ডের ভূসম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এত আয়োজন করে ক্রুসেডার বাহিনী প্রেরণ করেনি। এ কারণেই গির্জা পুরো বাহিনীর নেতৃত্বদানের জন্য পোপের প্রতিনিধি হিসেবে অ্যাডমারকে বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করেছিল। অ্যাডমারও তার ভূমিকা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পালন করেছিলেন। ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ করেই ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে এন্টিয়কে মারা যান। ফলে অত্যন্ত

প্রয়োজনীয় ও জটিল সময়ে গির্জা হারায় গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিকে। এ সংবাদ বেশ দেরি করে রোমে পোপ ২য় আরবানের কাছে পৌঁছায়। সংবাদ পাওয়ার পর তিনি ইতালির পিসা অঞ্চলের প্রধান বিশপ ডেমবার্টকে তার নতুন প্রতিনিধি হিসেবে ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন।[৪৯২] ডেমবার্টকে কেবল তার অত্যুচ্চ কূটনৈতিক দক্ষতার কারণেই প্রেরণ করা হয়নি; বরং তাকে নির্বাচনের পেছনে এ বিষয়টিও ভূমিকা রেখেছিল যে, তিনি শক্তিশালী পিসা নগরীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। পোপের আশা ছিল, এর ফলে সুদীর্ঘ ক্রুসেড পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিসার শক্তিশালী নৌবহর পোপের পাশে থাকবে। তা ছাড়া ডেমবার্টের এ জাতীয় সামরিক পরিস্থিতিতে বিশেষত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল। আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান স্প্যানিশ রাজ্য ক্যাস্টোলার শাসক যখন ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, তখন এই ডেমবার্টই পোপের প্রতিনিধি হিসেবে তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব দিক বিবেচনা করেই চারিত্রিক স্খলন ও বিপথগামিতার 'খ্যাতি' থাকা সত্ত্বেও ডেমবার্টকেই এ দায়িত্ব পালনের জন্য বাছাই করা হয়।[৪৯৩] অবশ্য কলুষিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান ইউরোপীয় গির্জাগুলোর একটি ব্যাপক ও সাধারণ রীতি!

একশ বিশটি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত পিসা নগরীর একটি সুবিশাল নৌবহরের নেতৃত্ব দিয়ে ডেমবার্ট ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে শাম অঞ্চলের লাতাকিয়া বন্দরে পৌঁছেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের পূর্বেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্রুসেডার সেনাপতিগণ একমত হওয়ার পূর্বে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলামি ভূখণ্ডে পৌঁছতে সক্ষম হন ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখল এবং গডফ্রের দায়িত্ব গ্রহণের পর।[৪৯৪] এ কারণেই তিনি লাতাকিয়ার নিকটবর্তী এন্টিয়কের প্রশাসক বোহেমন্ডের কাছে চলে যান। উদ্দেশ্য শাম অঞ্চলের পরিবর্তিত নতুন প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সমঝোতার চেষ্টা করা।[৪৯৫] এ

৪৯২. Michaud: op. cit. 11, p. 9.
৪৯৩. Runciman: op. cit., 1, p. 299.
৪৯৪. Grousset: op. cit. 1, p. 191.
৪৯৫. Albert d' Aix, p. 500-501.

তথ্যটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের দুই সপ্তাহ পরই পোপ ২য় আরবান মারা গিয়েছিলেন এবং ২য় পাসকাল নতুন পোপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন; যেমনটি আমরা পূর্বেও উল্লেখ করে এসেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পোপের নেতৃত্বাধীন রোমের গির্জা বাইতুল মুকাদ্দাসের কর্তৃত্বভার গডফ্রের হাতেই ছেড়ে রাখবে, নাকি সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে? এ প্রশ্নের উত্তর আগামী দিনগুলোর জন্যই তোলা থাক!

[তিন] বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

পশ্চিমা ক্যাথলিকদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার পেছনে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের লক্ষ্য ছিল, ইউরোপিয়ান বাহিনীগুলো ভাড়াটে বাহিনীর ন্যায় মুসলিম সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হৃত নগরীগুলো অধিকার করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেবে এবং ভাড়াটে বাহিনীর রীতি অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে। সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস মোটেও আশা করেননি যে, ইউরোপ থেকে এত বিশাল বাহিনী নিজেদের সামাজ্য বিস্তৃতি ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে আসবে। এ কারণেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাইজান্টাইনরা হতচকিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের স্বার্থের বিপরীত পরিস্থিতির মোকাবিলা শুরু করে। কারণ, এটি অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এসব বাহিনী যুদ্ধ শেষে ফিরে যাওয়ার জন্য আসেনি; ভূখণ্ড জয় করে সেখানেই থেকে যাওয়ার জন্য এসেছে। প্রথমে এডেসা ও এন্টিয়ক দখলের সময় এবং এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের সময় বিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই বাইজান্টাইনরা তাদের নীতি বদলে ফেলে সহায়তা করার পরিবর্তে একের পর এক বিভিন্ন ক্রুসেডার সেনাপতির ক্ষতি করা শুরু করে। বিপরীত দিকে ৪র্থ রেমন্ড বাদে অন্য কোনো ক্রুসেডার সেনাপতি নিজেদের অঙ্গীকার ও হৃদ্যতার ওপর অটল ছিল না। একমাত্র রেমন্ডই অনুভব করছিলেন যে, ইসলামি প্রাচ্যে তার রাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে শুরু করেছে এবং এখন তার একমাত্র আশা-ভরসা হলো বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে হৃদ্যতা। সম্রাটই হয়তো তাকে নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবেন।

অবশ্য এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও ক্রুসেড অভিযান থেকে

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্জন একেবারে শূন্য ছিল না। তখনও পর্যন্ত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মর্মর সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলো নগরী দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। তা ছাড়া সেলজুক নেতা কিলিজ আরসালানের রাজধানী ও সুরক্ষিত নগরী নিকিয়াও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিকারে এসেছিল। এরপর কোনিয়া ও হিরাক্লিয়াসহ কাছাকাছি অবস্থিত আরও কিছু নগরী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। তবে এ সবকিছুর পরও বৃহত্তর এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কারণ, তারা এশিয়া মাইনরের মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সেলজুকদের কারণে নিশ্চিন্ত ছিল না।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাইজান্টাইনরা এন্টিয়ক, তারসুস ও লাতাকিয়ার ন্যায় সুপ্রাচীন নগরীগুলো এত সহজে হারাতে রাজি হয়নি। তদ্রূপ এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, ক্রুসেডাররা দখল করার পরও তারা বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকারের স্বপ্ন লালন করে যাচ্ছিল। সেই বাইতুল মুকাদ্দাস, যা চারশ সত্তর বছরেরও অধিক সময় পূর্বে হজরত উমর রাযি.-এর যুগে তারা মুসলমানদের কাছে হারিয়েছিল।

[চার] আব্বাসি খলিফা

তৎকালীন আব্বাসি খলিফা ছিলেন নামেই খলিফা। যদিও তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন বা মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা নামক সুমহান উপাধি ধারণ করতেন; কিন্তু বাস্তবে তার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। আব্বাসি খলিফা তখন পুরোপুরি সেলজুকদের অধীনস্থ ছিলেন। তার রাজকীয় বাহিনীও ছিল সম্মানসূচক বাহিনী; আক্রমণ প্রতিরোধ, পতাকা উত্তোলন কিংবা কোনো ভূমি পুনরুদ্ধার করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। এ কারণেই দুর্বল খলিফার কাছে যখন ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের সংবাদ পৌঁছায়, তখন তিনি তা ভাবলেশহীন ও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন। তিনি এই বর্বর আগ্রাসনের মোকাবিলা করার জন্য সেলজুক সুলতানকে পরামর্শ প্রদানও নিজ দায়িত্ব মনে করেননি।[৪৯৬] সম্ভবত তিনি ক্রুসেড আগ্রাসনের শিকার শামের উপকূলীয়

---

৪৯৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯-২০ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১৫৬।

অঞ্চল থেকে দূরে বাগদাদের নিরাপদ পরিবেশে নিজের অবস্থানে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এ সময় মুসলমানদের খলিফা ছিলেন মুসতাযহির বিল্লাহ। অবশ্য এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয়। কারণ, তৎকালে খলিফাদের নামের কোনো মূল্য ছিল না! মুসতাযহির বিল্লাহ ৪৮৭ হিজরি হতে ৫১২ হিজরি সন (১০৯৪-১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ষোলো বছর।[৪৯৭]

[পাঁচ] বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান বারকিয়ারুক বিন মালিকশাহ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বৃহত্তর সেলজুক দ্বারা সেসব সেলজুক উদ্দেশ্য, যারা পারস্য ও তার আশেপাশের অঞ্চল শাসন করত। তারাই আব্বাসি খিলাফত ও ইরাকে নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিল। বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতানরা ছিল পুরো সেলজুক বংশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ। সম্ভবত তারাই ছিল সমকালীন সবচেয়ে ক্ষমতাধর ইসলামি শক্তি।

কিন্তু অত্যুচ্চ সামরিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা শাম অঞ্চলে চলমান উত্তপ্ত ঘটনাপ্রবাহকে প্রতিরোধ করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অবশ্য সেলজুকদের প্রধান সুলতান বারকিয়ারুকের নির্দেশনায় মসুলের আমির কারবুগার নেতৃত্বে একটি দুর্বল ও গুরুত্বহীন বাহিনী ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় প্রেরিত হয়েছিল, যার পরিণতি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো—বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ এই ভয়াবহ সংকটেও কেন স্পন্দিত হলেন না? অথচ ইতিপূর্বে বিশেষ করে তাদের মহান পিতামহ আলপ আরসালানের শাসনামলসহ বিভিন্ন সময়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গনে তাদের উজ্জ্বল ও গৌরবময় অবদানের অনন্য ইতিহাস রয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের কয়েক বছর পেছনে ফিরে গিয়ে ক্রুসেডারদের ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশকালে পারস্য ও ইরাকের সেলজুক সুলতান বারকিয়ারুক ও রোমান সেলজুকদের মধ্যকার

---

৪৯৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৭৩।

সম্পর্কের ব্যাপারে জানতে হবে।

আলপ আরসালান মৃত্যুর সময় কয়েকজন সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। তার বড় পুত্র মালিকশাহ বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্য শাসন করতেন। মালিকশাহর শাসনামলেই বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্য গৌরব ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রসীমা পূর্বে চীন সীমান্ত হতে পশ্চিমে শাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[৪৯৮] অপরদিকে আলপ আরসালানের আরেক পুত্র তুতুশ শামের অধিকাংশ এলাকা শাসন করতেন।[৪৯৯] তুতুশ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তারে যথেষ্ট আগ্রহী হলেও তার শক্তিশালী ভাই মালিকশাহকে ভয় ও সমীহ করতেন। ৪৮৪ হিজরি সনে (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে) মালিকশাহ ইন্তেকাল করলে তার পুত্র বারকিয়ারুক তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। বারকিয়ারুক ছিলেন একেবারেই নবীন, বয়স তখনও পনেরো হয়নি। এ সময় তুতুশ তার ভাই মালিকশাহর মৃত্যুপরবর্তী অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বারকিয়ারুকের সাম্রাজ্যের প্রতি লালায়িত হয়ে ওঠেন এবং তার বাহিনী নিয়ে আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুকের কাছ থেকে অন্যান্য নগরীও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আলেপ্পো তখন হাজিব আক সুনকুরের শাসনাধীন ছিল। আক সুনকুর ছিলেন বারকিয়ারুকের অনুগত মিত্র। কিন্তু নিজ বাহিনীর শিথিলতা ও বারকিয়ারুকের দুর্বলতার কারণে আক সুনকুর তুতুশের সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং বাহ্যিকভাবে তার সঙ্গে মিলিত হন। এরপর তিনি, এন্টিয়কের মুসলিম শাসক ইয়াগিসিয়ান ও এডেসার মুসলিম শাসক বুজান সকলে তুতুশের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে রওনা হন।[৫০০] অথচ এই সবগুলো নগরী মৃত্যুর পূর্বে মালিকশাহর কর্তৃত্বাধীন ছিল। সম্মিলিত বাহিনী বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পারস্যের দক্ষিণাঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হয়। এটি ৪৮৫ হিজরি সনের (১০৯৩ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা। তুতুশের আশা প্রায় বাস্তবায়িত হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আক সুনকুর ও ইয়াগিসিয়ান তুতুশকে ছেড়ে তাদের সাবেক সুলতান

---

৪৯৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩৯৪-৩৯৫ ও ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৮৬।

৪৯৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪১৮।

৫০০. প্রাগুক্ত, ৮/৪৮৭।

বারকিয়ারুকের পক্ষে যোগ দেন। ফলে তুতুশের পরিকল্পনা মাঠে মারা যায় এবং তিনি দ্রুত দামেশকে ফিরে আসেন। আক সুনকুরও নিজ এলাকা আলেপ্পোতে এবং বুজান এডেসায় ফিরে আসেন। ৪৮৬ হিজরি সনে (১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) তুতুশ পুনরায় আলেপ্পোতে আক্রমণ করেন।[৫০১] আক সুনকুর বুজানের সঙ্গে জোট বেঁধে তার মোকাবিলা করলেও এবার তুতুশ জয়লাভ করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আক সুনকুর ও বুজানকে হত্যা করেন। ফলে আলেপ্পো, দামেশক ও শামের বৃহত্তর অংশে তুতুশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫০২]

৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) অর্থাৎ ক্রুসেড অভিযান শুরু হওয়ার মাত্র দুই বছর পূর্বে তুতুশ তার বাহিনী নিয়ে নতুন করে ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পারস্যের রায় অঞ্চলের নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু এবার তুতুশ পরাজিত ও নিহত হন।[৫০৩]

তুতুশ নিহত হলেও বারকিয়ারুক নিজের পারস্য ও ইরাককেন্দ্রিক রাজ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি শাম অঞ্চলকে আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেননি। ফলে তুতুশের রাজত্ব তার দুই পুত্রের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। রিজওয়ান বিন তুতুশ লাভ করেন আলেপ্পোর দায়িত্ব আর দাক্কাক বিন তুতুশ লাভ করেন দামেশকের দায়িত্ব।[৫০৪]

এ আলোচনা দ্বারা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বারকিয়ারুক ছিলেন আলেপ্পো ও দামেশকের আমিরদ্বয়ের চাচাতো ভাই। তিনি শুধু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণই ছিলেন না; বরং তাদের পিতা তুতুশের হত্যাকারীও ছিলেন। বারকিয়ারুক মনে করতেন, যেমনটি আমরাও মনে করি যে, তুতুশের লালসা সীমাতিক্রম করেছিল এবং তুতুশ তার ভাই মালিকশাহর পরিবারের ও মহান পিতা আলপ আরসালানের মর্যাদার কোনো পরোয়াই করেননি; পরোয়া করেননি

---

৫০১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৮৯ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১০৯-১১০।

৫০২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৯৪-৪৯৫।

৫০৩. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১১১ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩০।

৫০৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১২০।

মুসলিম জনগণের মর্যাদার এবং পবিত্র ধর্ম ইসলামের মর্যাদার। তার সাম্রাজ্যবাদী লালসার বলি হয়ে হাজারো মুসলমানের প্রাণ ধ্বংস হয়েছে। আর ইসলাম তো এ ধরনের ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করেছে, যা ইসলামি ভূখণ্ডে কেবল ফিতনাই সৃষ্টি করে।

এর মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, সুলতান বারকিয়ারুক কেন ক্রুসেড আগ্রাসনের সময় শাম অঞ্চলের সহায়তায় উদ্দীপ্ত হননি।

এটি হলো একটি দিক।

আরেকটি দিক হলো, পারস্য ও ইরাক অঞ্চলে আরও কিছু বিদ্রোহ ও বড় বড় সমস্যা সংঘটিত হয়েছিল। বারকিয়ারুকের ভাই মুহাম্মাদ বিন মালিকশাহ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং রাজ্যের একটি অংশের ক্ষমতা দাবি করেছিলেন।[৫০৫] একে কেন্দ্র করে কয়েক বছর ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ সংঘাত চলতে থাকে। নিঃসন্দেহে বারকিয়ারুক ও মুহাম্মাদের মধ্যকার এই দীর্ঘ সংঘাত ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি উভয়ের সামনে শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের মুসলমানদের সমস্যার প্রতি উদ্যোগী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা ছিল কুরআনে বর্ণিত সেই নারীর ন্যায়, যে বহু পরিশ্রম করে মজবুত সুতা তৈরি করার পর পাক খুলে তা টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আলপ আরসালানের শাসনামলে শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, মালিকশাহর আমলে প্রভাবপূর্ণ বিস্তৃতির পর আমরা এরূপ দুর্বল অবস্থায় উপনীত হয়েছি। অন্য কেউ নয়, এ পরিস্থিতি আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর টেনে এনেছি!

[ছয়] কায়রোর উবায়দি (ফাতিমি) খলিফা

সমকালীন উবায়দি সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন মুসতালি বিল্লাহ। অপরাপর উবায়দি খলিফাদের ন্যায় তিনিও শিয়া ইসমাইলি মতাদর্শী, প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক ও সুন্নিবিদ্বেষী ছিলেন। সুন্নিদের তিনি তার মূল শত্রু মনে করতেন। সুন্নিদের প্রতি শত্রুতা করতে গিয়ে তিনি ক্রুসেডার বা মুসলিম উম্মাহর অন্য কোনো শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতেও সামান্য দ্বিধা করতেন না। আমরা দেখেছি—তিনি দুবার ক্রুসেডারদের কাছে প্রতিনিধিদল

---

৫০৫. ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৯৭।

প্রেরণ করেছেন এবং সুন্নি শাম অঞ্চল বণ্টনের জন্য ক্রুসেডারদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছেন। অবশ্য তার এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ, ক্রুসেডাররা বিভক্ত শাম নয়, পুরো শাম বিশেষত বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের জন্য এসেছিল। অথচ বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতার প্রতি উবায়দি সাম্রাজ্যেরও লোলুপ দৃষ্টি ছিল। আমরা এও দেখেছি যে, কীভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ক্রুসেডাররা উবায়দিদের বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দিয়েছে।[৫০৬]

এতৎসত্ত্বেও উবায়দিরা তখনও আসকালান, আক্কা, বৈরুত ও সিডনসহ শাম ও ফিলিস্তিনের উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নগরীর কর্তৃত্ব ধরে রেখেছিল। আক্কা ও আসকালানসহ এসব নগরীর কয়েকটি ক্রুসেডারদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিল, অন্যরা তখনও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল।

প্রশ্ন হলো—ফিলিস্তিনের মতো বিরাট একটি ভূখণ্ড হারিয়েও কি উবায়দি সাম্রাজ্য নিশ্চুপ বসে থাকবে এবং নিজেদের সর্বশেষ দুর্গ মিশরের পূর্ব সীমান্তে ক্রুসেডারদের ন্যায় একটি শক্তিশালী শত্রুকে এভাবে ছেড়ে রাখবে? আগামী মাস ও বছরগুলোতে এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে।

সম্ভবত এ তথ্যটি জানাও জরুরি যে, তৎকালে উবায়দি মিশর রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতার লাগাম স্বয়ং উবায়দি খলিফার হাতে ছিল না; পুরোপুরি ক্ষমতার লাগাম ছিল শক্তিশালী উজির আফজাল বিন বদর আল-জামালির হাতে। এটিও জেনে রাখা দরকার যে, তৎকালীন মূল উবায়দি সেনাবাহিনী ছিল মাগরিবি সৈন্য-নির্ভর, যারা ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর দখলের সময় প্রথম উবায়দি বাহিনীর সঙ্গে মিশরে এসেছিল। এ ছাড়াও উবায়দি বাহিনীতে সুদান ও দূরবর্তী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সৈন্যদেরও প্রতিনিধিত্ব ছিল। এর বিপরীতে উবায়দি বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিশরীয় সৈন্যের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। কারণ, দীর্ঘকাল ধরে মিশরে শিয়াশাসন চললেও এমনকি তা ক্রুসেড অভিযানের সময়কালকে অতিক্রম করলেও মিশরবাসী ব্যাপকভাবে শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ না করে নিজেদের সুন্নিপরিচয় ধরে রেখেছিল। অবশ্য এজন্য তাদের উবায়দিদের পক্ষ থেকে প্রচুর নির্যাতন-নিপীড়নের

---

৫০৬. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

সম্মুখীনও হতে হয়েছিল।

এভাবেই মিশরের ন্যায় শক্তিশালী একটি ইসলামি দুর্গ চলমান ঘটনাপ্রবাহে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয় এবং প্রভাবক শক্তিসমূহের সমীকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মিশরে তখন যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ছিল এমন এক প্রশাসনের হাতে, যারা কেবল নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদা প্রত্যাশা করে; যারা উম্মাহর স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে নিজেদের বিবেচনায় রাখে না এবং নখ পরিমাণ গুরুত্বও দেয় না!

[সাত] শাম অঞ্চলের মুসলিম আমির ও রাজন্যবর্গ

কোনো প্রকার অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে, তৎকালে শাম অঞ্চল গোটা দশেক ইমারত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ইমারতের একজন করে নেতা ছিল, যে মনে করত যে, সে-ই পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যক্তি! তার অনুসারীরা তাকে এমনভাবে উপস্থাপন করত যে, সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান নেতা, ইতিহাসের অদ্বিতীয় ব্যক্তি! এ দেশ তার মতো ব্যক্তি না অতীতে জন্ম দিয়েছে, না ভবিষ্যতে কখনো জন্ম দিতে পারবে! এসব নেতা কল্পনার ফানুস উড়িয়ে নিজেদের প্রবঞ্চিত করছিল, প্রতারিত করছিল জনগণকে। এরপর ক্রুসেডার বাহিনী এসে এসব অথর্ব-অযোগ্য নেতাদের মুখোশ সকলের সামনে উন্মোচিত করে দেয়।

এসব আমির ও রাজন্যের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেদের ক্ষমতার গদি ও ভূ-মালিকানা টিকিয়ে রাখা। এ কারণেই ক্রুসেডাররা যদি পুরো শাম অঞ্চলও দখল করে নেয় আর তাদের কোনো ক্ষতি না করে, তাহলে ক্রুসেড আগ্রাসনের বিষয়ে তাদের সামান্যও মাথাব্যথা ছিল না। একই কারণে তারা কেবল তখনই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে উদ্যোগী হয়েছে, যখন নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ হুমকির সম্মুখীন মনে করেছে। আরও পরিতাপের বিষয়—যখনই তারা অগ্রসর হয়েছে, হয়তো লাঞ্ছনাকর চুক্তির পথ অবলম্বন করেছে কিংবা ব্যর্থ যুদ্ধের পর কলঙ্কজনক পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে!

তৎকালীন শাম অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী আমির ছিলেন দুজন—দামেশকের অধিপতি দাক্কাক বিন তুতুশ ও আলেপ্পোর অধিপতি রিজওয়ান বিন তুতুশ। দুজনই ছিলেন ইসলামি চেতনা ও মূল্যবোধ-শূন্য স্বার্থবাদী ও সুবিধাবাদী নেতা। শুধু এতটুকুই নয়; তারা দুজন পরস্পর

সহোদর হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ ও অব্যাহত শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, তারা তাদের পিতা তুতুশ বিন আরসালানের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও অবিচক্ষণতার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন! এ কারণেই ক্রুসেড আগ্রাসনের মোকাবিলায় দামেশক ও আলেপ্পোর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কোনো পথ খোলা ছিল না।

এই দুই শাসক ও অন্য শাসকগণ যে লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতির মাঝে জীবন কাটাচ্ছিল, তার পাশাপাশি আলেপ্পো-অধিপতি রিজওয়ান বিন তুতুশ আরও নিকৃষ্টতর এক পথ অবলম্বন করেছিলেন। রিজওয়ান মনে করতেন যে, তার আশেপাশের শক্তিগুলো দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে আর তিনি দুর্বলই থেকে যাচ্ছেন। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নেন। সময়ের পরিক্রমায় কেবল সহযোগিতা বিনিময়ে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি একসময় শিয়া ইসমাইলি মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং ইসমাইলি মতাদর্শের প্রচারককে পরিণত হন। রিজওয়ান আলেপ্পোতে বিভিন্ন বড় পদে ইসমাইলি প্রচারকদের নিযুক্ত করেন। তার এই নীতির কারণে আলেপ্পোতে ইসমাইলি প্রচারকগণ ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করে। আলেপ্পোর বাতিনি ইসমাইলি সম্প্রদায়ের নেতা হাকিম মুনাজজিম রিজওয়ানের অতি আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন।

এসব কারণে অন্যান্য অঞ্চলের সেলজুক নেতৃবৃন্দ রিজওয়ানের প্রতি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কারণ, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই সেলজুকরা ছিল বিশুদ্ধ সুন্নি চিন্তাধারার অনুসারী। শুধু তা-ই নয়; সেলজুকরা জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে সুন্নি মতাদর্শের সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করত। সেলজুকরাই ইতিপূর্বে ৪৪৭ হিজরি সনে (১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) আব্বাসি খিলাফতকে শিয়া বুওয়াইহিদের কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে উদ্ধার করেছিল।[৫০৭] এ কারণেই রিজওয়ানের গৃহীত এই আচরণ ও অবস্থান পুরো সেলজুক পরিবারের নিকট এক বিরল ও আশ্চর্য কাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এর দ্বারা তার সুবিধাভোগী ব্যক্তিত্বই অবশ্যম্ভাবীরূপে ফুটে উঠেছিল। অন্য সব দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে তার

---

৫০৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩২৩।

একমাত্র দৃষ্টি ছিল ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যক্তিলালসার প্রতি।

মোটামুটি এমনই ছিল ক্রুসেড শক্তির আগ্রাসন চলাকালে শাম অঞ্চলের রাজন্যবর্গের প্রকৃতি।

[আট] কিলিজ আরসালান ও রোমান সেলজুক শক্তি

ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশ করেই এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ক্রুসেডার বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই, কিলিজ আরসালানের নেতৃত্বে সেলজুকদের প্রতিরোধ এবং রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের রাজধানী নিকিয়াসহ বিভিন্ন নগরীর পতন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি। তবে এ তথ্যটি প্রণিধানযোগ্য যে, ক্রুসেডাররা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিযান চালায়নি; বরং তাদের লক্ষ্য ছিল শাম অভিমুখে গমনের পথে বিদ্যমান ইসলামি শক্তিগুলোকে ধ্বংস করে পথ পরিষ্কার করা। মূলত এটি ছিল বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের একটি দুষ্ট পরিকল্পনা। সম্রাট চেয়েছিলেন, ক্রুসেডাররা এ পথেই অগ্রসর হয়ে তৎকালীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যগত শত্রু সেলজুকদের ধ্বংস করবে এবং এর মাধ্যমে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তার পুরোনো নগরীগুলো পুনরুদ্ধারও করতে পারবে। অথচ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য চাইলে তার বিশাল ও সমৃদ্ধ নৌবহর ব্যবহার করে ক্রুসেডারদের জাফা, আসকালান বা হাইফার মতো বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী শামের উপকূলীয় কোনো অঞ্চলে পৌঁছিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি পক্ষই নিজ স্বার্থ অনুসন্ধান করে ফিরছিল।

এ কারণেই নিকিয়া যুদ্ধ ও দোরিলায়ুমের যুদ্ধের মতো প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী বিভিন্ন যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ক্রুসেডার শক্তি এশিয়া মাইনর ভূখণ্ডে অবস্থান করতে চায়নি। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এশিয়া মাইনর অঞ্চল ছিল কঠিন ভৌগোলিক প্রকৃতিবিশিষ্ট। এ কারণে এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা খুব কঠিন কাজ ছিল। তা ছাড়া অঞ্চলটি ছিল চরম সাম্রাজ্যবাদী চেতনার ধারক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের একেবারে নিকটে। অধিকন্তু এসব যুদ্ধে ও এন্টিয়ক যাওয়ার পথে ক্রুসেডার বাহিনীর প্রচুর জনবল ক্ষয় হয়েছিল। আর তাই এ অঞ্চলে ক্রুসেডার বাহিনীর বেশিদিন অবস্থান ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

এ সবকিছু বিবেচনা করে ক্রুসেডার বাহিনী এশিয়া মাইনর অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তে নিজ সামরিক শক্তি এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য এশিয়া মাইনর অঞ্চলের নিকটবর্তী এন্টিয়ক ও এডেসা রাজ্যের নগরীগুলোতে কিছু ক্রুসেডার সৈন্য রয়ে গিয়েছিল। একই কারণে ক্রুসেড অভিযানের অল্প কিছুদিন পরই এশিয়া মাইনর অঞ্চল সম্পূর্ণ ক্রুসেডারশূন্য হয়ে পড়ে এবং এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব বণ্টিত হয়ে পড়ে দুই শক্তির মাঝে—পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে বাইজান্টাইন শক্তি এবং পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে রোমান সেলজুক শক্তি।

এই একই কারণে রোমান সেলজুকরা একাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুসেডারদের কাছে তিক্ত পরাজয়ের শিকার হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব ও সংখ্যা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেলজুকদের সর্বোচ্চ এতটুকু ক্ষতি হয়েছিল যে, এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের কিছু দুর্গের কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল। ক্রুসেড আগ্রাসনের পরও সেলজুক সেনাবাহিনী ও জনগণ এশিয়া মাইনর অঞ্চলের বিস্তৃত ও দুর্গম পাহাড়ি প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান ছিল।

এ অঞ্চলে সেলজুকদের নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান কিলিজ আরসালান। তিনি ক্রুসেডারদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শীঘ্রই তিনি হৃত ভূখণ্ড ও বিনষ্ট সম্পদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাঠে নামবেন।

কিলিজ আরসালান ও সেলজুকরাই এশিয়া মাইনর অঞ্চলের একমাত্র ইসলামি শক্তি ছিল না। পূর্বে আমরা যেমন বলে এসেছি, এ অঞ্চলে তুর্কি দানিশমান্দ পরিবারও বসবাস করত। বনু দানিশমান্দ এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। দানিশমান্দ পরিবার সর্বদাই সেলজুকদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে থাকত। একমাত্র ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সাময়িক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। ক্রুসেডাররা এ অঞ্চল ছেড়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার পর প্রত্যাশিতভাবেই আবারও উভয় পক্ষের উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক ফিরে আসে।

পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে কিলিজ আরসালান ও দানিশমান্দ পরিবারের প্রতিক্রিয়া কী হবে? এশিয়া মাইনর অঞ্চলের পরিস্থিতিই-বা কী হবে? এসব প্রশ্নের উত্তরও আমাদের জানা প্রয়োজন।

[নয়] শাম ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলের খ্রিষ্টান জনগণ

শাম অঞ্চল ও ফিলিস্তিনে প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান নাগরিকের বসবাস ছিল। এশিয়া মাইনর অঞ্চলেও ছিল প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টানের উপস্থিতি। নিঃসন্দেহে এসব অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান জনসাধারণের উপস্থিতি ইসলামের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার এক সুস্পষ্ট দলিল। এ অঞ্চলে ইসলামি শাসনের দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরও ইসলাম-বিরোধী এসব মানুষ কোনো ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন, হত্যা বা বিতাড়নের সম্মুখীন না হয়ে বসবাস করছিল। অথচ একই সময়ে আন্দালুসের অধিকৃত অঞ্চলে ক্রুসেডাররা মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা ও বিতাড়িত করেছিল। অধিকন্তু কালের পরিক্রমায় যুগে যুগে নিরপেক্ষ বিভিন্ন ব্যক্তি মুসলমানদের এই ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্যও প্রদান করেছেন।

শাম অঞ্চলের অধিকাংশ খ্রিষ্টান ছিল অর্থোডক্স মতাদর্শী। তারা অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের আনুগত্য করত। এ কারণেই রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই তাদের প্রথম ও প্রধান মিত্রতা ছিল বাইজান্টাইনদের সঙ্গে। অবশ্য মতাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও এসব খ্রিষ্টান নাগরিক এ অঞ্চলে ক্যাথলিক ক্রুসেডারদের অভিযানে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় তাদের পথ সুগম করেছিল। কারণ, মতাদর্শের ভিন্নতা থাকলেও মূল ধর্মবিচারে উভয় পক্ষ ছিল খ্রিষ্টান। তা ছাড়া ক্রুসেডাররা তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব খ্রিষ্টান নাগরিকের ওপরই নির্ভর করত। মুসলমানদের তো কোনো ক্রুসেড রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকারই সুযোগ দেওয়া হয়নি। সবকিছু মিলিয়ে চলমান পরিস্থিতি এ অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের আপন অবস্থায় থাকতেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। ক্রুসেডাররাও নিজেদের মেধাবলে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আদর্শগত বিরোধ থাকলেও এ অঞ্চলে টিকে থাকার জন্য অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের সঙ্গে বিরোধে না জড়ানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এ কারণেই তারা সর্বোচ্চ বড় বড় গির্জাগুলোকে ক্যাথলিক গির্জায় রূপান্তরিত করেছিল; কিন্তু ব্যাপকভাবে সকল খ্রিষ্টান নাগরিককে আপন আপন মতাদর্শ পালনের সুযোগ দিয়ে রেখেছিল।

অপরদিকে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের অধিকাংশ খ্রিষ্টান নাগরিক ছিল আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর। শামের অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা যদিও সচ্ছল জীবন ও

অবাধ কর্মক্ষেত্র প্রাপ্তিতেই তুষ্ট ছিল; এশিয়া মাইনর অঞ্চলের আর্মেনীয় খ্রিষ্টানদের স্বপ্ন ছিল আরও বিস্তৃত। তারা নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতার স্বপ্ন দেখত। দীর্ঘদিন তারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাস করেছিল, এরপর বসবাস করেছিল সেলজুকদের অধীনে। আর্মেনীয় খ্রিষ্টানগণ স্বতন্ত্র গির্জার অনুসারী হলেও আদর্শগত দিক থেকে ক্যাথলিক গির্জার তুলনামূলক নিকটতর ছিল। আর্মেনীয়রা সংখ্যায় ছিল অনেক, এ অঞ্চলে তাদের ছিল দীর্ঘ ইতিহাস ও নিজস্ব ভাষাপরিচয়-বৈশিষ্ট্য। এসব কারণে তাদের আশা ও স্বপ্ন কারও অধীনতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। একই কারণে আর্মেনীয় খ্রিষ্টানদের বড় একটি অংশ এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বিশেষ করে কিলিকিয়া অঞ্চলে সমবেত হয়েছিল, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

শামের খ্রিষ্টানদের মতোই আর্মেনীয়রাও ক্রুসেডারদের আগমনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। তাদের দৃষ্টিতে এ অভিযান ছিল প্রথমত মুসলিম সেলজুকদের শাসন থেকে নিষ্কৃতির সুযোগ, দ্বিতীয়ত বিরোধী মতাদর্শী বাইজান্টাইন অর্থোডক্সদের হাত থেকেও নিষ্কৃতির পথ। এ কারণেই তারা ক্রুসেডারদের সাদরে স্বাগত জানিয়েছিল এবং তাদেরকে নিজেদের মুক্তিদাতা বিবেচনা করেছিল। অবশ্য তখনও পর্যন্ত তারা দাসত্বকেন্দ্রিক জায়গিরব্যবস্থা-নির্ভর ইউরোপীয় শাসনপদ্ধতি আস্বাদন করে দেখেনি। আর তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে, পরবর্তী সময়ে যখন তাদের সামনে ইউরোপীয় 'মুক্তিদাতা'দের শাসনপদ্ধতি সুস্পষ্ট হবে, তখন তাদের আচরণ কেমন হবে? ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ের কাছেই এ প্রশ্নের উত্তর তোলা থাক!

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বিরাজমান রাজনৈতিক মন্দা এবং সেলজুক, বাইজান্টাইন ও ক্রুসেডারদের পারস্পরিক যুদ্ধব্যস্ততার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আর্মেনীয়রা বিশেষ করে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন নগরীতে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সম্পূর্ণ আর্মেনীয় জনগণ-নির্ভর এসব অঞ্চলকে কাঠামোগত দিক থেকে রাজ্য না বলে উপরাজ্য বলাই সমীচীন। এমনই একজন আর্মেনীয় নেতা ছিলেন কোগ বাসিল। তিনি সম্পূর্ণ আর্মেনীয় নাগরিক অধ্যুষিত একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যটির মূলকেন্দ্র ছিল কায়সুম ও রাবান নগরী। তার প্রভাব এত বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে

যে, ক্রুসেডাররাও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এডেসা রাজ্যের অধিকাংশ নাগরিক ছিল আর্মেনীয় খ্রিষ্টান। নিঃসন্দেহে আগামী দিনগুলোতে চলমান ঘটনাপ্রবাহে এ বিষয়টিও অন্যতম প্রভাবক বিবেচিত হবে।

[দশ ও সর্বশেষ] মুসলিম জনসাধারণ!

ঐতিহাসিকদের অনেকেই সর্বক্ষেত্রে শাসক ও রাজনীতিবিদদের পূর্ণ সমালোচনা করেন এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনোভাবেই তাদের অধীনস্থ জনসাধারণের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন না। হ্যাঁ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিভিন্ন বিষয়ে শাসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবক। কিন্তু এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের আলোচ্য কালে এ অঞ্চলে যে বেদনাদায়ক ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হয়েছে, তার দায়ভার কিছুটা হলেও জনগণের ওপর বর্তায়।

শাসকগণ তো জনগণেরই আমলনামা! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ»

> তোমরা যেমন প্রকৃতির হবে, তোমাদের দায়িত্ব তেমন প্রকৃতির মানুষকেই প্রদান করা হবে।[৫০৮]

সুতরাং জনগণ সৎ হলে আল্লাহ তাআলা কোনো সৎ ব্যক্তিকেই তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। জনগণ জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য কোনো মুজাহিদ নেতাকেই সুলভ করে দেন। আর জনগণ যদি হয় নতজানু, দুর্বল এবং কোনোমতে দু-মুঠো খাবারের নিশ্চয়তা বা ভালো কোনো চাকুরি পেতে আগ্রহী, আল্লাহ তাদেরকে এমন কোনো জালিম শাসকের শাসনজালে আটকে দেন, যে তাদের দ্বীন-দুনিয়া সবই নষ্ট করে। একজন শাসক তো প্রকৃতপক্ষে তার

---

৫০৮. আবু আবদুল্লাহ আল-কুযায়ি, *মুসনাদুশ শিহাব*, হাদিস নং ৫৭৭। ইমাম বায়হাকি রহ. একই অর্থবোধক একটি হাদিস ভিন্ন শব্দে রেওয়ায়েত করেছেন। দেখুন : বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৭৩৯১।

জনগণ থেকেই শক্তি আহরণ করে। নয়তো বলুন, কোন শাসক জনগণ ছাড়া শাসনকার্য চালাতে পারে? সেনাবাহিনী, মন্ত্রিপরিষদ, রাষ্ট্রদূত, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, চাকুরিজীবী-ব্যবসায়ী—এককথায় বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সহায়তা ছাড়া কে দেশ চালাতে পারে? এরা সকলে যদি শাসকের পক্ষ ত্যাগ করে, তাহলে একজন শাসক কীভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে?

তা ছাড়া যে শাসক ধর্ম ও মাতৃভূমি শত্রুদের কাছে বিকিয়ে দেয়, আল্লাহর দ্বীনের সমালোচনা করে তাতে বিকৃত সাধনের চেষ্টা করে, জনগণকে তার পেছনে পরিচালিত হতে কে বাধ্য করেছে?! কেবলই তরবারি ও চাবুকের ভয়?! এ সকল জনগণ কি জানে না যে, এই পৃথিবীর কোনো মানুষের 'আজাল' ও চূড়ান্তক্ষণের আগমনে আগ-পিছ হয় না এবং আসমান-জমিনের রব প্রত্যেকের জন্য যে রিজিক নির্দিষ্ট রেখেছেন, তাতে সামান্যও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না?!

এগুলো তো একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়; প্রতিটি মুসলমানের আবশ্যিক আকিদা। কোনো সচেতন-সতর্ক ও বোধসম্পন্ন নাগরিকের চিন্তা-চেতনা থেকে তো এসব বিষয় অদৃশ্য হতে পারে না। ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিন্নতা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডের জনসাধারণ এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করছে। তাহলে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কুরআন ও সুন্নাহর নিয়ামত দান করেছেন, সেই মুসলিম জাতি কেন তা অনুধাবন করতে পারবে না?!

আর তাই রিজওয়ান বিন তুতুশ বা তার মতো স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন নেতারা যখন দেশ উজাড় করে দিয়েছে, জনগণের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে এবং আমাদের শক্তি ও নিয়তির ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য উম্মাহর চরম শত্রুদের সামনে পথ উন্মুক্ত ও সহজ করে দিয়েছে, তাদের শাসনে যেসব জনগণ তুষ্ট ও সন্তুষ্ট ছিল, তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। সেসব জনগণকে ক্ষমা করাও আমাদের দায়িত্ব নয়, যারা সর্বোচ্চ কয়েকদিনের জীবনধারণের অনুমতি লাভের বিনিময়ে ক্রুসেডারদের শাসনকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে। ক্ষমা করতে পারব না সেসব জনগণকেও, যারা এমন শত্রুর সঙ্গে লেনদেন করে

গেছে, যারা তাদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং ধনসম্পদ লুট করে নিয়েছে। ঠিক তেমনই সেসব জনগণকেও কক্ষনো ক্ষমা করা উচিত নয়, যারা তাদের অভিধান থেকে 'জিহাদ' শব্দটি মুছে দিয়েছে; এমনকি এমন কঠিন ও সঙ্গিন মুহূর্তেও, যখন তাদের ভূখণ্ড জবরদখল হয়ে গিয়েছিল এবং জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজে আইন ও আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। আসমানি হোক বা মানবরচিত—পৃথিবীর প্রতিটি জীবনবিধানই এমন নিপীড়িত জাতিকে প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও লড়াইয়ের অনুমতি দেয়, যাদের ভূখণ্ড অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছে। তাহলে যে মুসলিম জনগণের জন্য আল্লাহ তাআলা জিহাদকে তার দ্বীনের শীর্ষ চূড়া গণ্য করেছেন, তারা কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারে সংগ্রামী জীবন?!

এটি মোটেও কঠোর কোনো কথা নয়; বরং পুরোপুরি বাস্তব কথা। অচিরেই আমরা এমন একদিনের দেখা পাব, যেদিন জনগণ নিজেদের দায়িত্ব ও ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তারা তাদের শাসকদের কাছে এই দাবি জানাতে অগ্রসর হবে যে, হয় অন্যায়-অবিচার বিদূরিত করার জন্য লড়াই শুরু করুন, নয়তো পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য অন্য কারও হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিন। যখন আমরা সেই দিনের দেখা পাব, তখন পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে যাবে, সমাজ থেকে জুলুম-অত্যাচার দূরীভূত হবে, লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং জনসাধারণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

ক্রুসেডারদের ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশের দুই বছর পর মোটামুটি এই ছিল পরিস্থিতি। এই পুরো পর্যালোচনাকে আমরা সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করতে পারি—

১. এডেসা, এন্টিয়ক ও বাইতুল মুকাদ্দাসকেন্দ্রিক তিনটি ক্রুসেডার রাজ্য ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। আর ৪র্থ রেমন্ড এখনো নিজের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

২. রোমের ক্যাথলিক গির্জা বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর গির্জার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালানোর জন্য পিসার প্রধান বিশপ ডেমবার্টকে ইসলামি ভূখণ্ডে প্রেরণ করেছে।

৩. বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর অঞ্চলের পশ্চিম অংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারা এডেসা, এন্টিয়ক ও বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, চলমান পরিস্থিতিতে তারা মোটেও তুষ্ট নয়।

৪. আব্বাসি খলিফার হাল অত্যন্ত করুণ। এই সংকটময় পরিস্থিতির পরিবর্তনে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এমন আশা করার সুযোগই নেই।

৫. পারস্যের সেলজুক সুলতান বারকিয়ারুক নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যস্ত। তা ছাড়া শাম অঞ্চলের প্রশাসকগণের সঙ্গে তার গভীর বিরোধ রয়েছে।

৬. কায়রোর উবায়দি খলিফার বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন নিয়ে নিজস্ব স্বপ্ন ও লালসা আছে; যদিও ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করার পূর্ণ শক্তি-সাহস তার নেই।

৭. শাম অঞ্চলের ইসলামি রাজ্যগুলোর রাজন্যবর্গ ঈমানি চেতনা ও নির্বাহী দায়িত্ব উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত দুর্বল। আর তাই তৎকালে মুসলিম উম্মাহ যে সংকটের শিকার হয়েছিল, তার ভয়াবহতা অনুমান করার শক্তি তাদের ছিল না।

৮. কিলিজ আরসালানের নেতৃত্বে রোমান সেলজুকরা তখনও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে টিকে ছিল। তারা যদিও শাম-সমস্যা হতে পুরোপুরি মুক্ত ছিল; কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছিল।

৯. অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা ক্রুসেডারদের সাদরে বরণ করে নিয়েছে। আর্মেনীয়রাও তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে; তবে তারা বিশেষ করে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নিজেদের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লালন করছে।

১০. অধিকৃত অঞ্চলসমূহ ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম জনগণ চলমান পরিস্থিতি মেনে নিয়েছে। কারণ, তারা যেকোনো মূল্যে যেকোনোভাবে বেঁচে থাকতে চায়। তাদের প্রত্যাশা ও কামনা তখনও জিহাদ, সংগ্রাম ও ত্যাগের চেতনার স্তরে উন্নীত হয়নি।

বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের পর খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে (হিজরি পঞ্চম শতকের শেষ দিকে) নির্দিষ্ট করে বললে ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ের শেষে (৪৯২ হিজরির রমজানে) এই হলো এশিয়া মাইনর, শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের পরিস্থিতি।

* * *

দশম পরিচ্ছেদ

সহায়ক ক্রুসেডার বাহিনী

এবার আল-কুদস ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন নগরীর পতন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের আলোচনা শুরু করা যাক।

পোপের প্রতিনিধি ও পিসা নগরীর প্রধান বিশপ ডেমবার্ট বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের পর ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে শামে পৌঁছেন এবং ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের বিষয়ে অবগত হন। এরপর তিনি ক্রুসেডার বাহিনীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য এন্টিয়কের শাসক বোহেমন্ডের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বোহেমন্ড অনুভব করেন যে, ডেমবার্ট এ অঞ্চলে রোমের গির্জার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের মালিকানা অর্জনের পরিকল্পনা করছেন। বোহেমন্ড ডেমবার্টের চাহিদাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তাকে লাতাকিয়া নৌবন্দর দখলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।(৫০৯)

কেন বিশেষ করে লাতাকিয়া বন্দর?

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ৪র্থ রেমন্ডের সহায়তায় লাতাকিয়া বন্দরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।(৫১০) যেহেতু বন্দরটির অবস্থান ছিল এন্টিয়ক রাজ্যের দক্ষিণে অনেকটা কাছে, তাই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সুস্পষ্ট শত্রুতে পরিণত হওয়া বোহেমন্ডের জন্য তা ছিল বিরাট শঙ্কার বিষয়। এ কারণেই বোহেমন্ড ডেমবার্টকে পিসার শক্তিশালী নৌবহর ব্যবহার করে লাতাকিয়া অবরোধ ও পতন ঘটানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। বিশপ ডেমবার্টও আগ-পিছ না ভেবে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন।(৫১১) তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, কালের পরিক্রমায় সামনে হয়তো দখল করার

---

৫০৯. Grousset: op. cit. 1, p. 191.

৫১০. Heyd : op. cit., 1, pp. 135.

৫১১. Albert d` Aix, pp. 500-501.

মতো উপযুক্ত কোনো নগরীই এ অঞ্চলে বাকি থাকবে না। ডেমবার্টের নির্দেশনা অনুযায়ী পিসার নৌবহর লাতাকিয়া অবরোধ করে। প্রচণ্ড অবরোধে নগরীটি যখন পতনপ্রায়; ঠিক তখনই ঘটে এমন এক ঘটনা, যা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দেয়!

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিলিস্তিনে নিজের জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে রেমন্ড শাম অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং হন্যে হয়ে কাঙ্ক্ষিত ভূখণ্ড খুঁজে ফিরছিলেন। এ অঞ্চলে পৌঁছে হঠাৎ করেই তিনি জানতে পারেন যে, বোহেমন্ড ও ডেমবার্ট মিলে লাতাকিয়া বন্দর অবরোধ করেছে। তিনি দ্রুত এতে হস্তক্ষেপ করেন এবং বোহেমন্ডকে শাসাতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি ডেমবার্টকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, এখন এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা মোটেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না, যার কারণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ক্রুসেডারদের শত্রুতা সৃষ্টি হবে।[৫১২] তা ছাড়া এর ফলে রোমের পোপের নেতৃত্বে ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স উভয় গির্জাকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্নও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।[৫১৩] ডেমবার্টের জন্য ফিলিস্তিনে আরও বড় সুযোগ রয়েছে। কারণ, সেখানেই আছে পবিত্র ভূখণ্ড আল-কুদস নগরী!

রেমন্ডের দাবি যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক মনে হওয়ায় বোহেমন্ডের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডেমবার্ট অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। রেমন্ড এবার নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাইজান্টাইন পতাকার পাশে নিজের পতাকা উত্তোলন করেন।[৫১৪]

এরপর বিশপ ডেমবার্ট এন্টিয়কের শাসক বোহেমন্ড ও এডেসার শাসক বল্ডউইনকে সঙ্গে নিয়ে আল-কুদস অভিমুখে রওনা হন। বোহেমন্ড ও বল্ডউইনের লক্ষ্য ডেমবার্টকে আল-কুদসের বিশপ পদে আসীন করা এবং এর মাধ্যমে ডেমবার্টের ওপর প্রকারান্তরে পোপের ওপর অনুগ্রহ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।[৫১৫]

---

৫১২. Chalandon: Alexis Comnene, p. 218.

৫১৩. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২১৮।

৫১৪. Runciman: op. cit., 1, p. 301.

৫১৫. Setton: op. cit. 1, p. 377.

ক্ষমতার গদি নিয়ে পালাবদলের খেলা!

বিশপ ডেমবার্ট, বোহেমন্ড ও বল্ডউইনের বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক কাফেলা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হয়। পথে যৎসামান্য দুর্ভোগের সম্মুখীন হলেও ত্রিপোলির শিয়া শাসক ইবনে আম্মারের কাছ থেকে তারা পূর্ণ সমাদর লাভ করে। তিনি তাদের জন্য রসদপত্রের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য ক্রুসেডাররা তার রাজধানী নগরী দখল করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তার নগরদ্বার উন্মুক্ত করেননি।[৫১৬]

সম্মিলিত বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছতেই এত অধিক সংখ্যক ক্রুসেডারদের আগমনে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক গডফ্রে অত্যন্ত খুশি হন। তার তো এখন অনেক জনবল প্রয়োজন।[৫১৭] কিন্তু ডেমবার্টের নেতৃত্বে এই বিশাল বাহিনী তো তাকে সহায়তা করার লক্ষ্যে নয়; একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করেছে। তারা চায় নগরীটির বর্তমান বিশপ আরনাল্ফ মালকোরনকে বরখাস্ত করে ডেমবার্টকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে। সম্মিলিত বাহিনীর দাবি শোনার পর গডফ্রে চিন্তা করে দেখেন যে, তাদের এ দাবি মেনে নিলে তার নিজেরই লাভ হবে আর তিনি তা মেনে নিতে বাধ্যও বটে। কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাসে একচ্ছত্র আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে গডফ্রের পিসার শক্তিশালী নৌবহরের সহায়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন পোপের সমর্থন লাভ। অবশেষে পুরোনো বিশপের জন্য দ্রুত ট্রাইবুনালের আয়োজন করা হয়; সেখানে 'প্রমাণিত' হয় যে, তার নির্বাচন সঠিক ছিল না। এরপর তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং ডেমবার্টকে নতুন বিশপ নির্বাচিত করা হয়।[৫১৮]

কিন্তু এতটুকুতেই ডেমবার্টের চাহিদা পূরণ হলে তো ভালোই ছিল! বিশপ পদে আসীন হয়েই ডেমবার্ট এবার বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসনিক বিষয়াদিতেও হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেন। কারণ, তিনি শুধু ধর্মীয় আচার পালন ও রীতি-নীতির চর্চা করার জন্য এই পদ দাবি করেননি; তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন রাজ্যের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল হর্তাকর্তায় পরিণত

---

৫১৬. Archer: The Crusades, pp. 98-99.

৫১৭. Runciman: op. cit., 1, p. 303.

৫১৮. Setton: op. cit. 1, p. 377.

হয়ে পুরো প্রশাসন নিজের হাতে নিয়ে আসতে।[৫১৯]

ধীরে ধীরে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (৪৯৩ হিজরি সনে) গডফ্রে ও ডেমবার্টের মধ্যে অধিকৃত বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের মালিকানা নিয়ে প্রকাশ্যে বিরোধ শুরু হয়। ডেমবার্ট জাফা ও বাইতুল মুকাদ্দাসে নিজের জন্য স্বতন্ত্র রাজত্ব দাবি করেন।[৫২০] চাপের মুখে নিরুপায় গডফ্রে ডেমবার্টকে সরাসরি এ প্রস্তাবও দেন যে, তার মৃত্যুর পর ডেমবার্টই উভয় নগরীর রাজত্ব লাভ করবেন। কিন্তু ডেমবার্ট তো বাকিতে রাজি নন, তার চাই নগদ প্রাপ্তি! এরপর গডফ্রে প্রস্তাব দেন, মুসলমানদের অন্য দুটি নগরী দখল করার পর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস ও জাফা ডেমবার্টের হাতে তুলে দেবেন। তিনি যেন অন্তত ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। কিন্তু এ প্রস্তাবও ডেমবার্টকে তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। তিনি তো অপেক্ষা করতেও রাজি নন![৫২১] এভাবে কোনো সমাধানে পৌঁছা ব্যতিরেকেই বাইতুল মুকাদ্দাসের নেতা ও গির্জার নেতার মাঝে বিরোধ ও সংঘাত চলতে থাকে।

এ তো লোভ ও লালসার সংঘাত! কামনা ও চাহিদা পূরণের লড়াই! সাম্রাজ্যবাদ ও দখলদারিত্বের যুদ্ধ! ধর্ম বা ক্রুশের কোনো জায়গা এখানে নেই!

ধর্মীয় নেতা ডেমবার্ট যখন উঠে-পড়ে লেগেছেন, নরম্যান সেনাপতি ও এন্টিয়কের শাসক বোহেমন্ড কেন বসে থাকবেন! তিনিও এবার নতুন করে শুরু করেন সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান!

অনিঃশেষ লালসা

ডেমবার্টকে আল-কুদসের বিশপ নির্বাচিত করার পর বোহেমন্ড আবারও তার সাম্রাজ্যবাদী লালসা চরিতার্থ করতে এন্টিয়কে ফিরে আসেন। এবার আর এক ফ্রন্ট নয়; একই সঙ্গে তিনি চারটি ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করেন। এরই নাম সাম্রাজ্যবাদের লালসা!

বোহেমন্ড প্রথমে ওরোন্টেস নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ফামিয়া দুর্গ ও

---

৫১৯. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২২১।

৫২০. Michaud: op. cit. 11, p. 10.

৫২১. Guillaume: de tyr, pp. 388-390.

আরব আমির সাইফুদ্দৌলা খাল্‌ফ বিন মালাইবের রাজ্য দখল করার চেষ্টা করেন। সাইফুদ্দৌলা ছিলেন হিমসের আমির জানাহুদ্দৌলা হুসাইন বিন মালাইবের সহোদর। কিন্তু বোহেমন্ড সুরক্ষিত ফামিয়া দুর্গ দখল করতে ব্যর্থ হন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দুর্গের আশেপাশের কৃষিক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেন।[৫২২] এরপর তিনি ছোটেন দ্বিতীয় ফ্রন্ট আলেপ্পো অভিমুখে। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জুলাই তিনি আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ান বিন তুতুশের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বোহেমন্ড রিজওয়ানকে কঠিন পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণে বাধ্য করেন এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি পাঁচশর অধিক মুসলমানকে বন্দি করেন।[৫২৩]

নিরুপায় রিজওয়ান হিমসের আমির জানাহুদ্দৌলা হুসাইন বিন মালাইবের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। সেলজুক নেতা রিজওয়ানের জন্য এটি ছিল চরম অবমাননা ও মর্যাদাহানিকর বিষয়। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই সেলজুকরা এ অঞ্চলে আরবদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত ছিল আর হুসাইন বিন মালাইব ছিলেন অন্যতম আরব নেতা।[৫২৪] অধিকন্তু হুসাইন বয়সেও রিজওয়ানের তুলনায় নবীন ছিলেন এবং হিমসের আমির হিসেবে তার অবস্থান আলেপ্পোর আমিরের তুলনায় নিম্নতর ছিল। এসব দিক চিন্তা করেই রিজওয়ান এর পরপরই একটি ভুল করে বসেন।

জানাহুদ্দৌলা যখন রিজওয়ানকে সহায়তা করার জন্য আগমন করেন, তখন রিজওয়ান তাকে স্বাগত জানানোর পরিবর্তে অসদাচরণ করেন। অথচ তিনিই জানাহুদ্দৌলাকে আগমন করতে অনুরোধ করেছিলেন। রিজওয়ানের অসৌজন্যমূলক আচরণ জানাহুদ্দৌলা হুসাইনের অন্তরে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।[৫২৫]

বোহেমন্ড তখন কঠিন অবরোধের মাধ্যমে সুপ্রাচীন নগরী আলেপ্পোর পতন ঘটিয়ে নগরীটিকে নিজ রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার স্বপ্নে বিভোর।

---

৫২২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২২৩।

৫২৩. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ১/৩৫৬-৩৫৭ ও আলি বিন মুহাম্মাদ তানুখি, *তারীখুল উযায়মি*, পৃষ্ঠা : ৩৬০।

৫২৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ১/৩৫৫।

৫২৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ১/৩৫৭ ও Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 277.

আলেপ্পো জয় করতে পারলে এন্টিয়কবাসী ও নরম্যানদের জন্য আরও সুবিস্তৃত বসবাস ও স্থানান্তরের ব্যবস্থা হবে।[৫২৬] তবে আলেপ্পোর পতন ঘটানোর পূর্বেই অতি লোভী বোহেমন্ড হঠাৎ করেই উত্তরের মারআশ (Kahramanmaraş) নগরী অবরোধ করার লক্ষ্যে আলেপ্পো অবরোধ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন! নগরীটি বছর-দুই পূর্বে ক্রুসেডারদের কর্তৃত্বভুক্ত হলেও এ সময় তা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল। সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে বোহেমন্ডের মনে এই চিন্তা কাজ করছিল যে, সুরক্ষিত আলেপ্পো নগরীর অবরোধ বেশ দীর্ঘমেয়াদি হবে। তা ছাড়া তিনি এ বিষয়টিও অনুভব করছিলেন যে, মারআশ নগরীর পতন ঘটানোর সুযোগ তুলনামূলক অনেক বেশি। কারণ, নগরীটির প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত বাইজান্টাইন বাহিনীটি ছিল ক্ষুদ্র আকৃতির। এ কারণেই বোহেমন্ড আলেপ্পো ফ্রন্ট ছেড়ে তৃতীয় ফ্রন্ট মারআশে চলে যান এবং কয়েকদিন নগরীটি অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু মারআশের পতন ঘটানো তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বোহেমন্ড যখন মারআশের পতন ঘটানোর চেষ্টায় ব্যস্ত, এরই মধ্যে তার কাছে মালাতিয়ার প্রশাসকের কাছ থেকে সাহায্যপ্রার্থনার বার্তা এসে পৌঁছায়।[৫২৭] মারআশ থেকে উত্তরে অবস্থিত মালাতিয়া নগরীর সিংহভাগ নাগরিক ছিল আর্মেনীয়। বনু দানিশমান্দের শাসক গাজি কুমুশতেগিন বিন দানিশমান্দ কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায়[৫২৮] নগরীটির আর্মেনীয় শাসক জিবরিল বোহেমন্ডের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন।[৫২৯] বোহেমন্ড একে সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করে মারআশ ছেড়ে পাঁচশ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে রওনা হন তার চতুর্থ ফ্রন্টে গাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং মালাতিয়া দখল করতে!

---

৫২৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ১/৩৫৭।

৫২৭. সাইদ আত্তর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৩১৩।

৫২৮. Michel Le Syrin (ed. Chabol) III. P. 187.

৫২৯. Matthieu d' Edesse, p. 51.



মানচিত্র নং-১৮

বোহেমন্ডের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান

এভাবেই অলীক আশায় প্রবঞ্চিত হয়ে বোহেমন্ড একই সঙ্গে নিজের জন্য চারটি ফ্রন্ট উন্মুক্ত করেন—ফামিয়া দুর্গ, আলেপ্পো, মারআশ ও মালাতিয়া। এসব ফ্রন্টে তিনি যুদ্ধ করছিলেন যথাক্রমে আরব, সেলজুক, বাইজান্টাইন ও বনু দানিশমান্দের বিরুদ্ধে। মূলত এরই নাম প্রবঞ্চনা, যা দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয়। তিনি তার বাহিনীকে এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রেখেছেন আর নিজে মাত্র পাঁচশ সৈন্য নিয়ে এশিয়া মাইনরের গভীরতম অংশে প্রবেশ করেছেন!

প্রবঞ্চিত-দাম্ভিক নেতা ভুলের শিকার হবেই।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের (Napoléon Bonaparte) ইতিহাস এবং রাশিয়ায় তার পতনের ইতিহাস অধ্যয়ন করে দেখুন।

পাঠ করে দেখুন হিটলারের ইতিহাস এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ায় তার পতনের ইতিহাস।

বরং আরেকবার পাঠ করুন ফেরাউনের পতন-ইতিহাস। দরিয়া বিদীর্ণ হতে দেখে আজব প্রবঞ্চনার শিকার ফেরাউন এতটা হতবুদ্ধি ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, নিজ বাহিনী নিয়ে দরিয়ায় নেমে পড়েছিল এবং সমূলে ধ্বংস হয়েছিল!

ক্রুসেডারদের হঠাৎ বিপদ!

মালাতিয়া দখলের নেশায় আচ্ছন্ন বোহেমন্ড এবার গাজি বিন দানিশমান্দের পাতা ফাঁদে আটকা পড়েন। তার সঙ্গে থাকা পাঁচশ সৈন্যও একই ফাঁদে আটকা পড়ে।[৫৩০] সেনাপতি বোহেমন্ডকে দ্রুত শৃঙ্খলিত করা হয়; তার সৈন্যদের অনেককে হত্যা করা হয় আর বাকিদের বন্দি করা হয়![৫৩১]

নিঃসন্দেহে ক্রুসেড আগ্রাসনের এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এটি ছিল অনেক মূল্যবান একটি শিকার। এটি ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টের শুরুর দিকের ঘটনা। বোহেমন্ড অবশ্য বন্দি হওয়ার পূর্বেই এডেসার শাসক বল্ডউইনের কাছে সাহায্যবার্তা পাঠাতে সক্ষম হন। বার্তা পেয়েই বল্ডউইন মাত্র একশ চল্লিশজন সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বোহেমন্ডের সাহায্যার্থে ছুটে আসেন! স্বাভাবিকভাবেই বল্ডউইনেরও একই পরিণতি বরণ করার কথা ছিল। কিন্তু গাজি বিন দানিশমান্দ তার অতি মূল্যবান শিকার নিয়ে দ্রুত মালাতিয়া থেকে সরে আসেন এবং বন্দি নরম্যান সেনাপতিকে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তার মাঝে আটকে রাখার জন্য এশিয়া মাইনর অঞ্চলের একেবারে উত্তর প্রান্তে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে নিকসার (Niksar) দুর্গে পৌঁছে যান।[৫৩২]

মালাতিয়ায় প্রবেশের পথ উন্মুক্ত পেয়ে বল্ডউইন তার বাহিনী নিয়ে নগরীটিতে প্রবেশ করেন। নগরবাসী তাকে স্বাগত জানায়; স্বাগত জানান নগর-প্রশাসক জিবরিলও। বল্ডউইন দ্রুত মালাতিয়াকে এডেসা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিজ রাজ্যপরিধি বিস্তৃত করে নেন। প্রমাণ হয়ে যায়—তিনি নির্ভেজাল আন্তরিকতা নিয়ে বোহেমন্ডকে উদ্ধার করতে আসেননি। দুজনের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব তো বেশ পুরোনো। এখন তিনি এই ভেবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে হয়তো এর মাধ্যমে তার কোনো স্বার্থ রক্ষা হবে। তা ছাড়া এটি তো ছিল সাহায্যপ্রার্থী নগরীকে নিজের রাজ্যপরিধিতে যুক্ত করার এক অপূর্ব সুযোগ!

---

৫৩০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯। অবশ্য ইবনুল আছির বোহেমন্ডের সঙ্গে থাকা সৈন্যসংখ্যা নিয়ে অতিরঞ্জন করেছেন।

৫৩১. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 378.

৫৩২. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২২৩-২২৪ ও Albert d' Aix, p. 525.

স্বাভাবিকভাবেই বল্ডউইন নিকসার দুর্গ পর্যন্ত তুর্কি দানিশমান্দ বাহিনীর অনুসরণ করার মতো দুঃসাহস দেখানোর চিন্তা করেননি। মালাতিয়ায় নিজ কর্তৃত্বের প্রমাণ হিসেবে এবং নগরীটিকে বশীভূতকরণের দলিল হিসেবে পঞ্চাশজন সৈন্যকে রেখে তিনি নিজে এডেসায় ফিরে যান।[৫৩৩]

এন্টিয়ক ও বাইতুল মুকাদ্দাসে যুগপৎ প্রশাসনিক শূন্যতা

বোহেমন্ড বন্দি হওয়ায় এ অঞ্চলে এক বিরাট প্রশাসনিক ও সামরিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কারণ, এন্টিয়ক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজ্য। এন্টিয়ক দখলে আগ্রহী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাও ছিল অনেক। একদিকে আছে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের সেলজুক মুসলমানগণ, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন কিলিজ আরসালান। আরও আছেন আলেপ্পোর আমির রিজওয়ান, যিনি এন্টিয়ককে নিজের অধিকার ও মিরাছ-সম্পদ মনে করতেন! উচ্চাভিলাষী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও দীর্ঘকাল ধরে এন্টিয়কের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিল। ওদিকে ৪র্থ রেমন্ডও নিজের জন্য একটি রাজ্যের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন। ইতিপূর্বেও তিনি এন্টিয়কের একচ্ছত্র শাসনক্ষমতা লাভ, নিদেনপক্ষে বণ্টিত ক্ষমতালাভের প্রচণ্ড আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া তৎকালীন এন্টিয়ক রাজ্যের সীমা কেবল এন্টিয়ক নগরীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন নগর-জনপদ ও দুর্গও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এন্টিয়ক ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সচ্ছল ও সুরক্ষিত একটি রাজ্য। এই বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতা প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই এক সংঘাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

নতুন করে সংকট সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এবং বিভিন্ন বাহিনী এন্টিয়কের ওপর উন্মাদের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে এন্টিয়কে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী নরম্যান বাহিনী এখন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?

চলমান খেলার অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান একটি ঘুঁটির মালিক হওয়ার পর মুসলিম দানিশমান্দ রাজপরিবারই-বা এখন কী করবে?

সর্বশেষ এই ইতিবাচক পটপরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মুসলিম জনগণই-বা কী করবে?

পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে কোনো পক্ষ কিছু ভাবার পূর্বেই বাইতুল

---

৫৩৩. Albert d' Aix, pp. 525-526.

মুকাদ্দাসে ঘটে আরেক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা, যা সকলের হিসাবনিকাশ উল্টে দেয় এবং পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে!

আকস্মিকভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক গডফ্রে মারা যান। ফলে এন্টিয়ক সমস্যার সম-আকৃতির সমস্যা এবার বাইতুল মুকাদ্দাসে সৃষ্টি হয়। বরং সম্ভবত এটি ছিল এন্টিয়ক সমস্যার চেয়েও কঠিন সমস্যা!

নিঃসন্দেহে গডফ্রের প্রয়াণ ছিল আল-কুদস নগরীতে সৃষ্ট নতুন এক প্রশাসনিক শূন্যতা, যাকে কেন্দ্র করে ক্রুসেডারদের মাঝে নতুন করে দুর্যোগ সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। কারণ, বিশেষ করে আল-কুদস নগরী নিয়ে মুসলমানদের বাদে খোদ ক্রুসেডারদের নিজেদের মধ্যেই ছিল চরম সংঘাত।

এই আকস্মিক মৃত্যু-ঘটনার সময় টেনক্রেড ও ডেমবার্ট প্রথমে আক্কা, এরপর হাইফা নগরীর অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন।[৫৩৪] আমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ধর্মীয় নেতা ও গির্জাধ্যক্ষ ডেমবার্ট একটি সামরিক অবরোধে কী করছেন?! তিনি তখন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নগরী কিংবা মালিকানার জন্য একটি জনপদ খুঁজে ফিরছিলেন। হাইফার অবরোধ চলাকালে তাদের কাছে গডফ্রের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছায়।[৫৩৫] টেনক্রেড যখন জানতে পারেন যে, গডফ্রে মৃত্যুর পূর্বেই গোল্ডমার নামক জনৈক ক্রুসেডার সেনাপতিকে হাইফা নগরী প্রদানের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তখন তিনি তার বাহিনী নিয়ে অবরোধ ছেড়ে সরে যেতে উদ্যত হন।[৫৩৬] কিন্তু ডেমবার্ট হাইফা নগরীর পতনের পর তা টেনক্রেডকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে থেকে যেতে আশ্বস্ত করেন। ডেমবার্টের এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাঝে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন— বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনভার তার হাতেই আসতে যাচ্ছে। বাস্তবেও সামান্য প্রতিরোধের পর হাইফার পতন ঘটে।[৫৩৭] এরপর সকলে বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা

---

৫৩৪. Tranlatio Sancti Nicolai Veoetian (Hist Occid, Tome V), pp. 272-275.
৫৩৫. Albert d' Aix, p. 527.
৫৩৬. Setton: op. cit. 1, p. 380.
৫৩৭. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 290.

করার জন্য—কে হতে যাচ্ছেন বাইতুল মুকাদ্দাসের পরবর্তী শাসক?!

গডফ্রে মাত্র এক বছর বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য শাসন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি এমন কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পারেননি, যে তার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করবে। গডফ্রে ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী সামরিক নেতাদের নীতি ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজকীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসনব্যবস্থা এবং গির্জার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা—এ দুয়ের মাঝামাঝি পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তার মৃত্যুর পর বড় দুটি শক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে।[৫৩৮]

প্রথম পক্ষ অর্থাৎ ধর্মীয় গির্জা-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন আল-কুদসের বিশপ ডেমবার্ট। প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী ডেমবার্ট ছিলেন আল-কুদস নগরীর অভ্যন্তরে সম্ভাব্য অগ্রবর্তী প্রার্থী, ক্রুসেড অভিযানে ইউরোপীয় বাহিনীসমূহের সমন্বয়ক পোপের প্রতিনিধি এবং পবিত্র নগরীর গির্জাধ্যক্ষ। অধিকন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসনিক পরিস্থিতি ও ক্রুসেডার বাহিনীর ভারসাম্য সম্পর্কেও তার সম্যক ধারণা ছিল। ডেমবার্ট তৎক্ষণাৎ টেনক্রেডের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করেন এবং টেনক্রেড তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতালাভে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।[৫৩৯] এরপর তিনি তার বন্ধু এন্টিয়কের শাসক বোহেমন্ডের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়ে তাকে দ্রুত বাইতুল মুকাদ্দাসে আগমন করতে বলেন এবং তার ক্ষমতালাভের পথ পরিষ্কার করার কাজে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৫৪০] বোহেমন্ডের বন্দি হওয়ার সংবাদ তখনও আল-কুদসে এসে পৌঁছায়নি।

এই হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতার দাবিদার প্রথম পক্ষ।

দ্বিতীয় পক্ষে ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজন্যশ্রেণি। গডফ্রের সৈন্যরা আল-কুদসেই অবস্থান করছিল। তারা সকলে পুরোহিততন্ত্র ও ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিশ্রম ও ত্যাগের এই দীর্ঘ পথ

---

৫৩৮. Stevenson: op. cit., p. 42.

৫৩৯. Stevenson: op. cit., p. 42.

৫৪০. Guillaume: de Tyr, p. 406; Albert d' Aix, p. 624.

পাড়ি দেওয়ার পর গির্জার হাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অপসারিত বিশপ আরনাল্ফ মালকোরনের অনুসারীরা এই পক্ষের পাশে দাঁড়ায় এবং ডেমবার্টের শাসন প্রত্যাখ্যান করে। অথচ ডেমবার্ট ধর্মীয় শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন! এখানে কারণ আর কিছুই নয়—ডেমবার্টের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ! অর্থাৎ কোনো নীতি নয়; সবার মাঝে কাজ করছিল ব্যক্তিসংঘাত ও নিজ নিজ উচ্চাভিলাষ পূরণের লালসা।[৫৪১]

প্রশ্ন হচ্ছে—দ্বিতীয় পক্ষ তথা গডফ্রের সৈন্যরা কাকে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য প্রার্থী মনোনীত করবে?!

যেহেতু তারা ছিল ইউরোপে প্রচলিত উত্তরাধিকারী চিন্তার ধারক, তাই তাদের চিন্তা এই ধারায় প্রবাহিত হয় যে, গডফ্রের সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে? তারা চিন্তা করে দেখে যে, এই বিবেচনায় গডফ্রের ভাই ও এডেসা রাজ্যের শাসক বল্ডউইনই বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক পদে গডফ্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত! তাদের চিন্তায় একবারের জন্যও উদিত হয়নি টেনক্রেডের কথা, যিনি অতীতে গডফ্রেকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন; বাইতুল মুকাদ্দাস, জাফা ও হাইফা অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন জটিল ও কষ্টসাধ্য বিষয়কে আয়ত্তে আনার ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবদান রেখেছেন। গডফ্রের শাসনামলে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের অধীনস্থ জালিল অঞ্চলে গভর্নরের দায়িত্বও পালন করছিলেন। তাদের মানসপটে ৪র্থ রেমন্ডের নামও উদিত হয়নি, যিনি তখনও নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য খুঁজে ফিরছিলেন। টেনক্রেড ও রেমন্ডের পরিবর্তে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় সেই বল্ডউইনের প্রতি, যিনি তখন প্রত্যক্ষভাবেই এডেসা রাজ্যের শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গডফ্রের এই সহোদর বাইতুল মুকাদ্দাস পতনের ক্ষেত্রে সামান্য ভূমিকাও রাখেননি!

গডফ্রের সৈন্যরা দ্রুত এডেসায় বল্ডউইনের কাছে একটি গোপন বার্তা প্রেরণ করে এবং তাকে অতিসত্তর বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়ে ক্ষমতার লাগাম হাতে তুলে নিতে অনুরোধ জানায়।[৫৪২] এমন বিনিময়হীন

---

[৫৪১]. Albert d` Aix, p. 526.

[৫৪২]. Michaud; op. cit. p. 19.

প্রস্তাব বল্ডউইন প্রত্যাখ্যান করবেন কেন? কোথায় এডেসা রাজ্যের ক্ষমতা আর কোথায় পবিত্র নগরী বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা! বল্ডউইন তৎক্ষণাৎ তার চাচাতো ভাই বল্ডউইন ডি বুর্গ (Baldwin of Bourg)-এর হাতে এডেসা রাজ্যের দায়িত্ব ছেড়ে দেন এবং তার সহায়তায় একটি শক্তিশালী রেজিমেন্ট রেখে যান; আর নিজে অন্য একটি রেজিমেন্ট নিয়ে দ্রুত ছুটে যান বাইতুল মুকাদ্দাসে।[৫৪৩] দামেশকের অধিপতি দাক্কাক পথে তাকে বাধাপ্রদানের চেষ্টা করেন।[৫৪৪] কিন্তু ত্রিপোলির শিয়া শাসক ইবনে আম্মার বল্ডউইনের সহায়তায় অগ্রসর হন এবং নিজেদের যৌথ শত্রু সুন্নি সেলজুক আমির দাক্কাকের মোকাবিলা করেন।[৫৪৫] বল্ডউইন ইবনে আম্মারের সহায়তায় দাক্কাককে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেন![৫৪৬]

নিঃসন্দেহে তৎকালীন পরিস্থিতি ছিল এমনই ঘৃণ্য ও বেদনাদায়ক!

স্বর্ণের তশতরিতে সাজিয়ে রাখা 'বাইতুল মুকাদ্দাস'!

১১০০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর বল্ডউইন নিরাপদে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছতে সক্ষম হন।

গডফ্রের সৈন্যরা এবং প্রাক্তন বিশপ আরনল্ফের অনুসারীরা আগে থেকেই বাইতুল মুকাদ্দাসের জনগণকে প্রস্তুত রেখেছিল। বল্ডউইন নগরীতে প্রবেশ করতেই খ্রিষ্টান জনগণ ও সৈন্যগণ বিশাল শোভাযাত্রাযোগে বল্ডউইনকে স্বাগত জানাতে অগ্রসর হয় এবং তাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। তারা তাকে নিজেদের নেতা হিসেবে বরণ করে নেওয়ার সম্মিলিত আগ্রহ প্রকাশ করে![৫৪৭]

ডেমবার্টের পক্ষে এই আকস্মিক পরিস্থিতি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিষ্টান জনসাধারণের সমর্থন মোকাবিলা করার সামর্থ্য ছিল না। বিশেষত প্রয়াত

---

৫৪৩. Cam. Med. Hist. Vol. p. 301.

৫৪৪. Guillaume: de Tyr, p. 410.

৫৪৫. Estoire d' Eracles, 1, p. 407 & Gesta Francorum, p. 520.

৫৪৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ১/৪৩। অবশ্য বল্ডউইন ও দাক্কাকের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণে ইবনুল আছির এমন সাদামাটা ইঙ্গিত ব্যবহার করেছেন, যাতে পাঠকের মনে হতে পারে যে, দাক্কাক বল্ডউইনকে পরাজিত করেছিলেন।

৫৪৭. Guillaume: de Tyr, p. 410.

গডফ্রের সৈন্যগণ এবং বল্ডউইনের সঙ্গে আগত সৈন্যগণ গির্জার প্রভাবমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তরবারি ব্যবহার করতেও প্রস্তুত ছিল। সবদিক বিবেচনা করে বিশপ ডেমবার্ট শান্তির দিককেই প্রাধান্য দেন এবং বিশপ পদ নিয়ে তুষ্ট থাকেন।[৫৪৮] এবার বল্ডউইনের মাথায় বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। বল্ডউইন কিন্তু তার ভাইয়ের মতো ভণিতা করেননি! তিনি তার ভাইয়ের মতো 'বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রহরী' উপাধি ধারণ করেননি, ধারণ করেননি অন্যান্য সেনাপতির ন্যায় শাসক-প্রশাসক উপাধি; নিজের জন্য তিনি পছন্দ করেন 'রাজা' উপাধি। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি কারও আনুগত্য করবেন না; বরং সকলে তার আনুগত্য করবে। যদিও এখন বাস্তবে তা কার্যকর হবে না; কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো হবে। কারণ, চলমান প্রেক্ষাপটে তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রুসেডার নেতা এবং তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরীর শাসক। এসব দিক বিবেচনা করে তিনি 'বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা' উপাধি ধারণ করেন। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য (The Kingdom of Jerusalem) আর বল্ডউইন হন সাম্রাজ্যটির প্রথম রাজা। তিনি পরিচিত হন ১ম বল্ডউইন নামে। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর বল্ডউইনের শাসনামলের সূচনা হয়। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে মুকুট পরিধান করানো হয় একই বছরের ২৫ ডিসেম্বর পশ্চিমা ক্যাথলিকদের বড়দিনে।[৫৪৯]

১ম বল্ডউইন যদিও জানতেন যে, ডেমবার্ট তার ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেন, তবুও আপন বিচক্ষণতাবলে তিনি উপলব্ধি করেন যে, ডেমবার্টকে এখনই তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা সমীচীন হবে না। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এ মুহূর্তে ডেমবার্টকে অপসারণ করলে গির্জায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে, তিনি হয়তো তা সহজে পূরণ করতে পারবেন না। তা ছাড়া এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ডেমবার্ট পিসার নৌবহরকে তার বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে প্ররোচিত করতে পারেন। অথচ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বল্ডউইনের পিসা-নৌবহরের সমর্থন ও সহায়তা অনেক বেশি প্রয়োজন।[৫৫০]

---

৫৪৮. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২৩২।

৫৪৯. Stevenson: op. cit., p. 44.

৫৫০. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২৩২।

১ম বল্ডউইন বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার এবং আশেপাশের পথঘাট নিরাপদ রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও কেন্দ্রের দায়িত্ব তার সহযোগী ও নিকটজনদের মাঝে বণ্টন করে দেন। নিঃসন্দেহে এই নতুন পরিস্থিতি ছিল টেনক্রেডের চাহিদার সম্পূর্ণই বিপরীত। টেনক্রেড ভুলে যাননি যে, তিন বছর পূর্বে ক্রুসেড অভিযানের শুরুর দিকে তিনি এই বল্ডউইনের সঙ্গেই তারসুস নগরীর কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদে জড়িয়েছিলেন। তা ছাড়া টেনক্রেড ক্ষমতার লড়াইয়ে ডেমবার্ট নামক এক পরাজিত ঘোড়ার পক্ষে বাজি ধরেছিলেন। তাই তিনি জানতেন যে, বল্ডউইন তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের অধীনস্থ জালিল অঞ্চলের প্রশাসক পদ হতে অপসারণ করতে কিছুতেই দেরি করবেন না। তখন তো বিস্তৃত স্বপ্নের জাল বোনা টেনক্রেড কঠিন সংকটে নিপতিত হবেন।[৫৫১]

ক্রুসেড রাজ্যগুলোর পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতি

তবে চলমান ঘটনাপ্রবাহ আকস্মিকভাবেই টেনক্রেডের জন্য এক অপ্রত্যাশিত শুভ বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। আর তা হলো তার মামার বন্দি হওয়ার ঘটনা! কেউ মোটেও ধারণা করবে না যে, টেনক্রেড তার মামার বন্দি হওয়ার সংবাদ শুনে ব্যথিত হয়েছেন। তাদের মতো করে বললে—বোহেমন্ড নরকে যাক! টেনক্রেডের কী আসে যায়! টেনক্রেড তো নিজের স্বার্থ খুঁজে ফিরছেন; মামার স্বার্থ নয়। ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি যে, তিনি তার শক্তিশালী মামার রাজত্ব থেকে দূরে কোথাও নিজের জন্য রাজত্বের সন্ধানে এন্টিয়কে তার মামাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আর তাই যখন তার কাছে মামার বন্দি হওয়ার সংবাদ পৌঁছায় এবং সঙ্গে পৌঁছায় এন্টিয়কের নরম্যান বাহিনীর প্রেরিত একটি বার্তা, যাতে তাকে বোহেমন্ড মুক্ত হওয়া পর্যন্ত এন্টিয়কের অন্তর্বর্তীকালীন শাসকের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে তাতে সাড়া দেন। এ তো একদিকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতি হতে দূরে সরে যাওয়ার সুযোগ, অপরদিকে নিজের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুবর্ণ সুযোগ। টেনক্রেড চলে যাওয়ায় ১ম বল্ডউইনও যেন হাপ ছেড়ে

---

৫৫১. Setton: op. cit. I, p. 381.

বাঁচেন। তিনি তো কোনো ধরনের সমস্যা বা সংঘাত ছাড়াই তার অপছন্দের এক প্রশাসক থেকে রেহাই পেলেন![৫৫২]

এভাবেই ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে ১ম বল্ডউইন নির্বাচিত হন বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের রাজা, টেনক্রেড নির্বাচিত হন এন্টিয়কের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক আর বল্ডউইন ডি বুর্গ লাভ করেন এডেসার প্রশাসনিক দায়িত্ব। ৪র্থ রেমন্ড তখনও ত্রিপোলি অঞ্চলে কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশায় ঘুরে ফিরছেন। ওদিকে বোহেমন্ড আছেন গাজি বিন দানিশমান্দের হাতে বন্দি।

এসব জটিল ও উত্তেজনাকর ঘটনাপ্রবাহ অধ্যয়নের সময় স্বাভাবিকভাবেই বারংবার আমাদের মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মুসলমানরা তখন কোথায় ছিল?!

নিঃসন্দেহে ক্রুসেডারদের এই চরম সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি ছিল মুসলমানদের আপন ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়ে একক লক্ষ্যপানে অগ্রসর হওয়ার এক অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু হায় আফসোস! প্রবৃত্তির চাহিদা যে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত! মুসলমানদের মাঝে এমন কোনো নিষ্ঠাবান নেতা ছিলেন না, যিনি তাদেরকে এক সুতোয় গেঁথে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। ফলে একের পর এক সুযোগ নষ্ট হতে থাকে; মুসলমানরা লাঞ্ছনা ও হীনতা, তুচ্ছতা ও অপদস্থতার জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। যে তিক্ত বাস্তবতাকে সকলে পুরোপুরি অপছন্দ করে, মুসলমানরা তা-ই মেনে নেয়। অন্যায়-অবিচার অপসারণ এবং যাবতীয় অনাচারের মূলোৎপাটনের কোনো ঝোঁক ও প্রবণতাই সমকালীন মুসলিমসমাজের মাঝে স্পন্দিত হয়নি। এভাবেই কাটতে থাকে দিন, মাস ও বছরের পর বছর। ক্রুসেডাররা দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায় দুর্বল ইসলামি দেহে আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ক্ষতিসাধন করতে থাকে।

চলমান পরিস্থিতিতে ক্রুসেডাররা যখন দেখতে পায় যে, মুসলমানরা মোটেও উত্তেজিত হচ্ছে না; বরং তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আলোচনায় বসতে চাচ্ছে এবং ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার চুক্তি করতে সচেষ্ট হচ্ছে, তখন তারা নিজেদের রাজ্যপরিধি সম্প্রসারণ এবং

---

৫৫২. Albert d' Aix, pp. 537-538.

মুসলমানদের সংকটকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়।

বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ১ম বল্ডউইন নিজের সামরিক শক্তি যাচাই, পথ অনুসন্ধান ও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজ সৈন্যদের মানিয়ে নিতে আল-কুদস নগরীর আশেপাশে দ্রুত কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথমেই তিনি তার বাহিনী নিয়ে আরসুফ অবরোধ করেন। ইতালির জেনোভা হতে আগত একটি নৌবহরের সহায়তায় অল্প কদিনের অবরোধের পরই তার হাতে আরসুফ নগরীর পতন ঘটে।[৫৫৩] এরপর তিনি অবরোধ করেন কায়সারিয়া নগরী। এ নগরীটিরও পতন ঘটে।[৫৫৪] পতনের পরই কায়সারিয়া নির্মম গণহত্যার শিকার হয়; প্রচুর মুসলিম নাগরিক নির্বিচারে নিহত হয়।[৫৫৫] বরং কায়সারিয়ার নাগরিকরা যখন নগরীর মসজিদে আশ্রয় নেয়, তখন ক্রুসেডাররা বল্ডউইনের নেতৃত্বে তাদের পিছু নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে এবং নারী-পুরুষ-শিশু যাদেরকে পায়, নির্বিচারে হত্যা করে। মুসলিম নারী-পুরুষের রক্তে মসজিদটি এক বিরাট রক্ত-পুকুরে পরিণত হয়![৫৫৬] হ্যাঁ, এই বল্ডউইনকেই কিছু কিছু ইতিহাসগ্রন্থে 'প্রাজ্ঞ' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে!

নেতা বোহেমন্ডকে হারিয়ে এন্টিয়ক রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছে—আশেপাশের কেউ এ ধরনের চিন্তা করার পূর্বেই অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক টেনক্রেডও তার সম্প্রসারণমূলক তৎপরতার অনুশীলন করতে দ্রুত বের হন। টেনক্রেড হিংস্রতা ও বর্বরতা, শক্তি ও রণদক্ষতা এবং সামরিক অভিজ্ঞতা কোনো দিক থেকেই তার মামা বোহেমন্ডের চেয়ে কম ছিলেন না।[৫৫৭] তিনি অল্প কয়েক মাসের মধ্যে এন্টিয়কের উত্তরে কিলিকিয়া অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি নগরী দখল করতে সক্ষম হন। নগরীগুলো হলো তারসুস (Tarsus), আদানা (Adana) ও মপসুয়েসটিয়া (Mopsuestia)। নগরী-তিনটি ইতিপূর্বে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দখলে ছিল। এরপরই তিনি এন্টিয়কের দক্ষিণে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর

---

৫৫৩. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৯।
৫৫৪. আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৫/১৬৭।
৫৫৫. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৩৯ ও Foucher de chartres,pp. 389-390.
৫৫৬. Albert d' Aix, pp. 453-454.
৫৫৭. Runciman: op. cit., 11, pp. 32.

লাতাকিয়া অবরোধ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক বছরের অধিক সময় পূর্বে বোহেমন্ডও লাতাকিয়া নৌবন্দর অবরোধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ রেমন্ডের চাপে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন টেনক্রেড কিছুতেই 'বয়োবৃদ্ধ' বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের লাভ-ক্ষতি বিবেচনায় আনবেন না। তিনি লাতাকিয়ার পতন ঘটাতে নগরীটিকে ঘিরে তার সৈন্যদের নিয়োজিত করেন।[৫৫৮] বাস্তবেও লাতাকিয়ার পতন ঘটে, তবে প্রায় দুই বছর পর!

এডেসা রাজ্যের নতুন প্রশাসক বল্ডউইন ডি বুর্গই-বা বসে থাকবেন কেন?! মুসলিম নগরী সারুজে হামলা চালিয়ে তিনিও তার তৎপরতা শুরু করেন। হাসানকেইফের (Hasankeyf) মুসলিম প্রশাসক সুকমান বিন উরতুক এডেসার প্রাক্তন শাসক ১ম বল্ডউইন বাইতুল মুকাদ্দাসে চলে যাওয়ার পর সারুজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন।[৫৫৯] তবে পরিতাপের বিষয়, তিনি এ অঞ্চলের অন্যান্য মুসলিম প্রশাসকের কোনো সহযোগিতা পাননি। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বল্ডউইন ডি বুর্গ তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। সারুজে গণহত্যা চালানো হয় এবং প্রচুর সংখ্যক মুসলিম নাগরিককে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়।[৫৬০]

বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য ও দুই ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক ও এডেসার যখন এই পরিস্থিতি, আরেক ক্রুসেডার সেনাপতি ৪র্থ রেমন্ড তখন কী করছেন?! রেমন্ড টেনক্রেডকে লাতাকিয়া থেকে অবরোধ তুলে নিতে চাপ প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেমন্ড বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের স্বার্থের অনুকূলে লাতাকিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। টেনক্রেডের কাছে নতি স্বীকার করে রেমন্ড এবার লাতাকিয়া ছেড়ে কনস্টান্টিনোপলে চলে যান এবং সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের সঙ্গে লাতাকিয়া পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি নিয়ে বৈঠকে বসেন।[৫৬১] তবে এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত

---

৫৫৮. Runciman: op. cit., 11, p. 33.

৫৫৯. Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 363.

৫৬০. Matthieu d' Edesse (Doc. Arm 1), pp. 53-54.

৫৬১. Raoul de Caen, pp. 706-707.

হয়, যা সকলের হিসাবনিকাশই বদলে দেয় এবং সকলের স্বপ্ন ও পরিকল্পনাই এলোমেলো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়!

ক্রুসেড অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য পশ্চিম ইউরোপ থেকে নতুন করে বিশাল বিশাল বাহিনী রওনা হতে থাকে। ইউরোপিয়ানরা ইসলামি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে তিনটি ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংবাদ জানতে পেরেছিল। তারা শুনেছিল—ক্রুসেডার বাহিনী সেখানে প্রচুর ধনসম্পদ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে। ইউরোপিয়ানরা জানতে পেরেছিল যে, ক্রুসেডারদের হাতে একে একে ইসলামি নৌবন্দরগুলোর পতন ঘটছে এবং ইতালিয়ান বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের নৌবহরগুলো বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করছে। সবচেয়ে বড় কথা—তারা জানতে পেরেছিল যে, অপ্রত্যাশিতভাবে মুসলমানরা নতজানু হয়ে পড়েছে এবং পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ও গৃহদ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছে। এ সবকিছু জানতে পেরে অতি সুলভ 'মিরাছ সম্পত্তি' লাভ করার জন্য প্রচুর সংখ্যক ইউরোপীয় জনগণ এ অঞ্চলে ছুটে আসতে প্ররোচিত হয়েছিল![৫৬২]

ইউরোপের নতুন জাগরণ

১১০১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিশাল এক কাফেলা কনস্টান্টিনোপলে এসে পৌঁছায়।[৫৬৩] প্রথমে কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিত হয় ইতালির উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত লোমবারদি (Lombardy) অঞ্চলের একটি বাহিনী। বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন মিলান নগরীর প্রধান বিশপ আনসেল্‌ম (Anselm)।

---

৫৬২. দেখুন : মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখু সালাজিকাতির রূম ফী আসিয়াস সুগরা*, পৃষ্ঠা : ৯৬।

৫৬৩. Setton: vol.pp. 343-367.



মানচিত্র নং-১৯

৪৯৪ হিজরি সনে/১১০১ খ্রিষ্টাব্দে আগত নতুন ক্রুসেডার বাহিনীসমূহ

বাহিনীটির সঙ্গে যদিও আলবার্ট, জিওবার্ট ও হিউম্যানসহ ইতালিয়ান রাজন্য ও সামন্তদের একটি দলও ছিল,(৫৬৪) তবে অধিকাংশ সদস্যই ছিল কৃষক ও সাধারণ জনগণ। প্রচুর নারী ও শিশুও বাহিনীটিতে ছিল। বাহিনীটিকে তুলনা করা যেতে পারে ধর্মযাজক পিটার ও কাঙাল ওয়ালটারের বাহিনীর সঙ্গে।(৫৬৫) আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে প্রথম সামরিক বাহিনীটি প্রেরিত হয়েছিল পোপের প্রতিনিধি ও ফ্রান্সের লি-পিউ অঞ্চলের বিশপ অ্যাডমারের নেতৃত্বে। এরপর দ্বিতীয় একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল পিসার প্রধান বিশপ ডেমবার্টের নেতৃত্বে। এবার মিলানের প্রধান বিশপ আনসেল্‌মের নেতৃত্বে প্রেরিত হচ্ছে বর্তমান সহায়ক বাহিনীটি। এ তথ্য দ্বারা আমাদের সামনে ইসলামি ভূখণ্ডে বাহিনী প্রেরণে গির্জার নীতি ও ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

৫৬৪. Albert d' Aix, p. 559.

৫৬৫. যাবুরাফ, *আসসালিবিয়্যুনা ফিশ-শারক্ব*, পৃষ্ঠা : ১২৭-১২৯ ও Anna Comnena, pp. 355-356.

আনসেল্‌মের নেতৃত্বাধীন বাহিনীটি কনস্টান্টিনোপল পৌঁছেই তৎকালীন ইউরোপীয় জনগণের অভ্যাস অনুযায়ী ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও রাহাজানি শুরু করে দেয়। বাধ্য হয়ে সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস কালবিলম্ব না করে তাদেরকে বসফরাস প্রণালি পার করিয়ে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। অন্যান্য বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে লোমবারদি অঞ্চলের বাহিনীটি নিকিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়।[৫৬৬] এরপর সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস রেমন্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন যে, এ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের অবস্থান এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকায় রেমন্ডই নতুন এই বাহিনীটির নেতৃত্ব দেবেন।[৫৬৭] এর মাধ্যমে সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, নতুন বাহিনীটি যেন টেনক্রেড, ১ম বল্ডউইন বা অন্য কারও স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে বাইজান্টাইনদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়!

এক মাস বা সামান্য বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ক্রুসেডারদের আরেকটি দল এসে পৌঁছায়। এ দলটি বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে এসেছিল।[৫৬৮] তারা নিকিয়ায় পৌঁছে প্রথম দলটির সঙ্গে মিলিত হয়। এই সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন অনুমান অনুসারে দুই লক্ষ! ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের ভাষ্যমতে তাদের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ![৫৬৯]

৪র্থ রেমন্ডের নেতৃত্বে সুবিশাল বাহিনীটি শামে অবস্থানরত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হতে দোরিলায়ুম অভিমুখে অগ্রসর হয়। সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের আগ্রহও এমনই ছিল। তিনি এ অঞ্চলের যেসব নগরীতে বাইজান্টাইনদের কর্তৃত্ব ছুটে গিয়েছিল, সেগুলোতে পুনঃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন।[৫৭০] ওদিকে রেমন্ড চাচ্ছিলেন এই বিশাল বাহিনীর সহায়তায় ত্রিপোলির পতন ঘটিয়ে সেখানে নিজের স্বপ্নের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তবে লোমবারদি হতে আগত বাহিনীটি রেমন্ডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং পুরো বাহিনীকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে

---

৫৬৬. Albert d' Aix, pp. 561-562.
৫৬৭. রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৩৯-৪০।
৫৬৮. Albert d' Aix, pp. 562-563.
৫৬৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯।
৫৭০. Albert d' Aix, pp. 560-562.

দানিশমান্দ পরিবারের শাসিত অঞ্চলে যুদ্ধ করার মনস্থ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল বিখ্যাত নরম্যান সেনাপতি বোহেমন্ডকে মুক্ত করে আনা।[৫৭১] আমরা এ তথ্যটি হয়তো ভুলে যাইনি যে, লোমবারদির এই বাহিনীটি ছিল বন্দি বোহেমন্ডের দেশ ইতালি থেকে আগত। রেমন্ড যখন তাদেরকে অবগত করেন যে, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত সুরক্ষিত নিকসার দুর্গে বন্দি বোহেমন্ডকে মুক্ত করা বেশ কঠিনসাধ্য হবে,[৫৭২] তখন বিশপ আনসেল্মের নেতৃত্বাধীন লোমবারদির বাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে রেমন্ডকে জানিয়ে দেয় যে, তারা যদি বোহেমন্ডকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবুও অন্তত বনু দানিশমান্দের শাসিত অঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ দুই নগরী আমাসিয়া (Amasya) ও সিভাস (Sivas)-এর ধ্বংস সাধন তো করতে পারবে।[৫৭৩] সম্মিলিত বাহিনীটির বৃহৎ অংশের পীড়াপীড়ির সামনে রেমন্ড নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ দিকে ক্রুসেডার বাহিনী আঙ্কারায় (Ankara) পৌঁছায় এবং অতি সহজে নগরীটি দখল করে নেয়। এরপর তারা আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে কাস্তামনু (Kastamonu) নগরীতে পৌঁছায়।[৫৭৪]

ক্রুসেডারদের দুর্যোগ

রেমন্ডের নেতৃত্বে নবগঠিত ক্রুসেডার বাহিনীটি এখন মুসলিম তুর্কিদের রাজ্যের গভীরতম অংশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। সুতরাং দেখার বিষয়—এ অঞ্চলের মুসলিম শাসক গাজি কুমুশতেগিনের প্রতিক্রিয়া কী হয়? আর যিনি কোনিয়া নগরীকে নিজ ঘাঁটি নির্ধারণ করেছিলেন, সেই কিলিজ আরসালানই-বা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?

গাজি সঠিক পদক্ষেপই গ্রহণ করেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রোমান সেলজুক সুলতান কিলিজ আরসালানের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কিলিজ আরসালানও তাকে নিরাশ না করে দ্রুত সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং নিজ বাহিনী নিয়ে গাজির সঙ্গে মিলিত হন। বরং এরপর

---

৫৭১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯।

৫৭২. Setton: op. cit. 1, pp. 35.

৫৭৩. Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 324-325.

৫৭৪. Runciman: op. cit., 11, pp. 22.

তাদের দুজনের সঙ্গে আলেপ্পোর অধিপতি রিজওয়ান বিন তুতুশের কিছু সৈন্যও যোগ দেয়।[৫৭৫]

দীর্ঘদিন ধরে যেসব নেতা পরস্পর বিবাদ ও সংঘাতে জড়িয়ে ছিল, তাদের এই হঠাৎ সম্মিলন ছিল নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ঘটনা। মূলত যখন তারা অনুভব করে যে, অচিরেই এক বিরাট দুর্যোগ তাদের ওপর নেমে আসতে যাচ্ছে, বিশেষত এই বিশাল বাহিনীর সদস্যসংখ্যা দুই লক্ষাধিক, তখন অনেকটা নিরুপায় হয়েই তারা একজোট হতে বাধ্য হয়!

যদিও চলমান ইতিহাস কোনো শুভ বার্তাবাহী ছিল না, যদিও অন্তরগুলো পরিশুদ্ধ-পরিচ্ছন্ন ছিল না; কিন্তু ঐক্য এমনই এক কল্যাণকর গুণ, তা যেমনই হোক না কেন নিশ্চিত সুফল বয়ে আনে। ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে না হয়, তাহলে তার সুফল যদিও হয় ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক; কিন্তু তা-ও বিচ্ছিন্নতা ও বিবাদ-বিসংবাদের চেয়ে উত্তম। একই কথা প্রযোজ্য এসব নেতার ক্ষেত্রেও। তারা যদিও এমন কিছু করেননি, যা আমাদের পূর্ণ আশ্বস্ত করতে পারে, তবে তারা কিছু একটা করতে সক্ষম হয়েছেন; বরং উল্লেখযোগ্য একটি কাজই করতে পেরেছেন। আর এই শাশ্বত সোনালি মূলনীতি তো কার্যকর সর্বযুগেই—

«يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»

আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য ঐক্যবদ্ধ জামাতের সঙ্গে থাকে।[৫৭৬]

ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর পদক্ষেপ

কিলিজ আরসালানের বাহিনী ক্রুসেডার বাহিনীর আগে আগে চলতে থাকে। এরপর ক্রুসেডার বাহিনীকে আরও সামনে অগ্রসর হতে প্রলুব্ধ করতে হঠাৎ করেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার ভান করে এবং পলায়নের মতো করে সরে পড়তে শুরু করে। পলায়নের সময় সেলজুকরা পথের আশেপাশের বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রের ফসলে আগুন লাগিয়ে দেয়, পানির কূপগুলো মাটি ফেলে ভরাট করে দেয় এবং খাদ্য বা যেকোনো রসদ

---

৫৭৫. রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৪৩।

৫৭৬. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২১৬৬ (ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান-গরিব বলেছেন।) ও ইমাম ইবনে হিব্বান আল-বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৫৭৭।

সংগ্রহের সকল উৎস নষ্ট করে দেয়। উদ্দেশ্য ক্রুসেডার বাহিনীর যেন কোনো ধরনের রসদপত্র সংগ্রহের সুযোগ না থাকে।

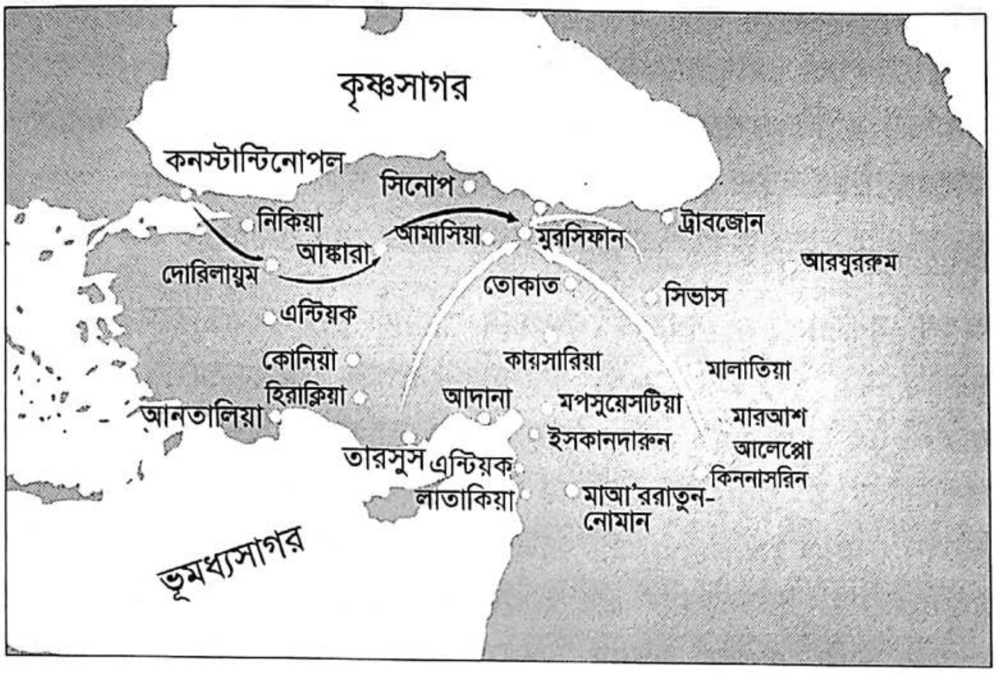
একে তো জুলাই মাসের প্রচণ্ড উত্তপ্ত আবহাওয়া, তার ওপর দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের ভোগান্তিকর পাথুরে পথ; আর তাই দীর্ঘ পথ চলতে চলতে একসময় ক্রুসেডাররা ক্লান্তশ্রান্ত হতে শুরু করে।[৫৭৭] এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সেলজুকরা ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল এবং পথ চলাকালেই শত্রুপক্ষের শক্তি ক্ষয় করার উদ্দেশ্যে মাঝেমধ্যেই হামলা করে দ্রুত সটকে পড়ছিল। এর ফলে ক্রুসেডাররা মানসিকভাবেও অস্থির-উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সেনাপতি রেমন্ড আরও একবার ক্রুসেডারদের বনু দানিশমান্দের ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশ করার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শাম অঞ্চলের যুদ্ধে বোহেমন্ডকে নিজেদের নেতা হিসেবে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ক্রুসেডাররা তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকে!

পথ চলতে চলতে একসময় ক্রুসেডাররা হালিস নদী (The Halys River) পাড়ি দিয়ে বনু দানিশমান্দের শাসনাধীন অঞ্চলে প্রবেশ করে। এরপর তারা পূর্ব দিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে হালিস নদী ও আমাসিয়া নগরীর প্রায় মাঝামাঝি পথে মুরসিফান নগরীতে পৌঁছায়।[৫৭৮] এ সময় তুর্কি গোয়েন্দারা উপলব্ধি করে যে, ক্রুসেডাররা ক্লান্তির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। এবার তুর্কিরা ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য এক বিপজ্জনক ফাঁদ পাতে। শুরু হয় ভয়াবহ সংঘর্ষ!

---

৫৭৭. Runciman: op. cit., 11, pp. 22.

৫৭৮. রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৪৪।



মানচিত্র নং-২০

মুরসিফানের যুদ্ধ

ক্রুসেডার যোদ্ধারা যদিও সংখ্যায় ছিল প্রচুর, তারপরও লড়াইয়ে দু-পক্ষের মাঝে ভারসাম্য ছিল না। কারণ, ক্রুসেডাররা ক্ষুৎপিপাসা, ভীতি ও প্রচণ্ড গরমের কারণে শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। তা ছাড়া তাদের বাহিনীতে ছিল প্রচুর সংখ্যক সামরিক অভিজ্ঞতাহীন কৃষকশ্রেণির জনগণ। আর অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ সকলেই এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও পথঘাট সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। আর তাই বলা যায় যে, যুদ্ধ কেবল এক পক্ষ থেকেই হচ্ছিল!

মুসলমানরা মুরসিফানের যুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। ক্রুসেডার বাহিনীর প্রায় চার-পঞ্চমাংশ সৈন্য নিহত হয়, বাকিদের অধিকাংশই বন্দি হয়। ৪র্থ রেমন্ডসহ অল্প কয়েকজন রাজন্য আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। তারা যখন দেখতে পায় যে, যুদ্ধপরিস্থিতি ক্রুসেডার বাহিনীর প্রতিকূলে চলে গেছে, তখন রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে একেবারে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে থামে![৫৭৯]

মুরসিফানের যুদ্ধ ছিল ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য এক চরম দুর্যোগ। কেবল এক লক্ষ ষাট হাজারের অধিক যোদ্ধাপুরুষের পতন নয়, তাদের সঙ্গী

৫৭৯. Albert d' Aix, pp. 569-607 &Foucher de chartres, p. 377.

হয়ে আসা অসংখ্য নারী ও শিশুর মৃত্যু নয়, প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও সম্পদের হানি নয়;[৫৮০] বরং এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণে ক্রুসেডাররা নিজেদের সামরিক খ্যাতি ও প্রভাবও হারিয়ে ফেলে। এটি ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টের শুরুর দিকের ঘটনা।

হিরাক্লিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ

অবশ্য মুরসিফানের পরাজয়ই চলমান পরিস্থিতিতে ক্রুসেডারদের সর্বশেষ দুর্যোগ ছিল না। এরই মধ্যে কনস্টান্টিনোপলে ক্রুসেডারদের আরেকটি বাহিনী এসে পৌঁছায়। ফ্রান্স থেকে আগত বাহিনীটি ছিল পনেরো হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত। বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন নেভার্স (Nevers)-এর কাউন্ট ২য় উইলিয়াম (William II)।[৫৮১] মুরসিফানের যুদ্ধ চলাকালে এই বাহিনী এসে পৌঁছায়। ২য় উইলিয়াম তার বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে চলে আসেন এবং অতি সহজে আঙ্কারায় পৌঁছে যান। প্রথম ক্রুসেডার বাহিনীটি কোন পথে অগ্রসর হয়েছে, তা ২য় উইলিয়ামের জানা ছিল না। যেহেতু প্রথম বাহিনীটির অধিকাংশ সদস্য ইতিমধ্যে নিহত হয়েছিল, আর যারা বেঁচে পালাতে পেরেছিল, তারাও সোজা উত্তরে রওনা হয়েছিল, তাই কাউন্ট উইলিয়ামের পক্ষে তা জানার সুযোগও ছিল না।[৫৮২] অবশেষে তিনি তার বাহিনী নিয়ে দক্ষিণে হিরাক্লিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। যথাসময়ে নতুন এই ক্রুসেডার বাহিনীর আগমন-সংবাদ জোটবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে যায়। তারা এবার দ্রুত হিরাক্লিয়া অভিমুখে রওনা হয়। মুরসিফানের যুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় মুসলিম বাহিনীর আত্মবিশ্বাস ও মনোবলের পারদ তখন অনেক উঁচুতে।

১১০১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টের শেষ দিকে হিরাক্লিয়ায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। পূর্বের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করলে এবারের লড়াই ছিল মুসলিম বাহিনীর জন্য অনেকটা সামরিক অনুশীলন-ভ্রমণের ন্যায়! আর

---

৫৮০. Albert d` Aix, pp. 571-572. ইবনুল আছির উল্লেখ করেছেন যে, তিন লক্ষ ক্রুসেডারের মধ্য হতে মাত্র তিন হাজার সৈন্য জীবিত ফিরতে পেরেছিল। তারা আহত অবস্থায় পালিয়ে গিয়েছিল। দেখুন : আল-কামিল ফিত-তারীখ, ৯/২৯।

৫৮১. Setton :vol 1, p. 358, Oman : vol 1, p.242.

৫৮২. Albert d' Aix, pp. 576-578.

তাই যুদ্ধ শুরু হয়ে অল্প সময় অতিবাহিত না হতেই পুরো ক্রুসেডার বাহিনী নিঃশেষ হয়ে যায়। বাহিনীর সেনাপতি নেভার্সের কাউন্ট ২য় উইলিয়াম ও তার বিশেষ ছয়জন অনুচর বাদে সকলেই এ যুদ্ধে নিহত হয়![৫৮৩] যেহেতু এর দুই সপ্তাহেরও কম সময় পর একই স্থানে আরেকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাই পার্থক্যকরণের জন্য ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'প্রথম হিরাক্লিয়ার যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

হিরাক্লিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয় এই দুর্ভাগা ক্রুসেডার বাহিনীর দ্বিতীয় অংশ পৌঁছার মধ্য দিয়ে। কনস্টান্টিনোপলে এবার ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে ষাট হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী এসে পৌঁছায়। বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন আকুইতিন অঞ্চলের ডিউক ৯ম উইলিয়াম (William IX Duke of Aquitaine) ও ব্যাভারিয়া (Bavaria) অঞ্চলের ডিউক ৪র্থ ওয়েল্ফ।[৫৮৪] বাহিনীটি কোনিয়া অতিক্রম করে সরাসরি হিরাক্লিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। মুসলিম বাহিনী তাদের সঙ্গে হুবহু প্রথম বাহিনীর সঙ্গে প্রয়োগকৃত কৌশল অবলম্বন করে এবং পথে ফল-ফসল, পানি ও অন্যান্য রসদ সংগ্রহের উৎসগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে ক্রুসেডারদের হিরাক্লিয়ার দিকে টেনে আনে। ক্রুসেডার বাহিনী ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে অবশেষে সেপ্টেম্বরের শুরুতে হিরাক্লিয়ায় পৌঁছায়।[৫৮৫] যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতেই এ বাহিনীটিও পূর্বের দুই বাহিনীর পরিণতি বরণ করে। পুরো বাহিনীটি ধ্বংস হয়ে যায় আর সেনাপতি ও রাজন্যবর্গ কোনোমতে জান বাঁচিয়ে এন্টিয়কে পালিয়ে যায়![৫৮৬]

তিনটি যুদ্ধেরই এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো—বাহিনীগুলোর সেনাপতিগণ অসহায় সৈন্যদের অশুভ ও মন্দ পরিণতি বরণের জন্য ফেলে রেখে নিজেরা পলায়নের পথ খুঁজে নিয়েছিল!

যে বাহিনী অভিযানে বের হয় স্বার্থের খোঁজে, যে বাহিনীর নেতা ও সেনাপতি অগ্রসর হয় প্রবৃত্তির চাহিদা ও সাম্রাজ্যবাদের লালসা পূরণে,

---

৫৮৩. Albert d` Aix, pp. 575-578.

৫৮৪. Matthieu d' Edesse(Hist. Arm. 1), p. 59.

৫৮৫. Setton: op. cit. 1, pp. 361-362.

৫৮৬. Foucher de chartres, p. 399 & Guibert de Nogent, p. 243.

যুগে যুগে সর্বযুগে তাদের প্রকৃতি ও পরিণতি এমনই হয়!

দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত এই তিনটি যুদ্ধে ক্রুসেডাররা প্রায় আড়াই লক্ষ যোদ্ধাপুরুষ হারায়। বন্দি হয় প্রচুর, প্রভূত সম্পদহানিও হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চলমান প্রেক্ষাপটে অসংখ্য প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। আর তাই আমরা এখানে ইতিহাসের ধারাবিবরণী কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর লাভ-ক্ষতি পর্যালোচনা এবং চলমান ঘটনাপ্রবাহে যুদ্ধগুলোর প্রভাব নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি।

১. যুদ্ধতিনটিতে জয়লাভ করায় কেবল এশিয়া মাইনর অঞ্চল নয়; বরং পুরো ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। মুসলমানরা এমন একটি বিজয়ের প্রতীক্ষায় ছিল, যার ফলে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে এবং ক্রুসেডারদের শক্তিমত্তা তাদের সামনে তুচ্ছ বিবেচিত হবে। এই সমুন্নত মনোবলের যদিও তাৎক্ষণিক কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া ছিল না; কিন্তু সকলের মনমস্তিষ্কে এই দাবির অসারতা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ক্রুসেডাররা অপরাজেয় শক্তি। আর তাই এটি ছিল পরিবর্তনের সূচনার অতি গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ।

২. স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, এই তিনটি যুদ্ধের পর সমকালীন মুসলিম উম্মাহ বিজয়ের কিছু কার্যকারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সম্ভবত এসব কার্যকারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জিহাদ ও ঐক্য।

   কারণ, এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, অত্যাচারী-জবরদখলকারীদের প্রতি আক্রমণাত্মক না হয়ে তাদেরকে তুষ্ট করার চেষ্টার মাধ্যমে কখনোই হৃত অধিকার ফিরে পাওয়া যায় না। অধিকার ফিরে পাওয়া যায় না সমঝোতার গোলটেবিল বৈঠকে কিংবা প্রাচ্য-পশ্চিমের নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায়; হৃত অধিকার ফিরে পাওয়া যায় একমাত্র দুঃসাহসী প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি দৃঢ়তা ও সহনশীলতা, শ্রেয়তর ধৈর্য ও উপযুক্ত প্রস্তুতি এবং শক্তি ও সামর্থ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে। এই তিনটি যুদ্ধের পদক্ষেপগুলোতে আমাদের সামনে এ সবকিছুই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

কিলিজ আরসালান ও গাজি কুমুশতেগিনের মধ্যকার ঐক্যই মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেছিল, তাদেরকে সঠিক লক্ষ্যপানে পরিচালিত করেছিল, শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিল এবং তাদের অন্তর্জগতে প্রকম্পন সৃষ্টি করেছিল। আর এ সবকিছুর সমন্বয়ে রচিত হয়েছিল এক দৃশ্যমান বিজয়।

৩. পরিতাপের বিষয় হলো, ক্রুসেড আগ্রাসনের একেবারে গোড়ার দিকের মতো এবারও আমরা সেলজুক ও দানিশমান্দ বাহিনীর সদস্যদের মাঝে ইসলামি আদর্শের সুস্পষ্ট কোনো ছাপ অবলোকন করিনি। ইতিহাস গ্রন্থগুলোতেও তাদের শাহাদাত ও জান্নাতলাভের বাসনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তারা মূলত জাতিগত ও ভূখণ্ডগত দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু বিবেচনা করেছিল। তাদের কাছে এসব যুদ্ধ ছিল নিজেদের ভূখণ্ড, ঘরবাড়ি ও সহায়সম্পত্তি রক্ষার লড়াই। আর এ ধরনের মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করলে যদিও ক্ষেত্রবিশেষে বিজয় অর্জিত হয়; কিন্তু সে বিজয় হয় সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ, আল্লাহ তাআলা কেবল তাদেরকেই চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিজয় দান করেন, যারা তার পথে লড়াই করে এবং নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখে। আলোচ্য যুদ্ধগুলোতে তুর্কিরা যে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছিল, তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে, তারা অর্জিত বিজয়কে কাজে লাগিয়ে অধিকৃত ইসলামি নগরীগুলো পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টাই করেনি। অথচ বিশেষ করে এন্টিয়ক ও এডেসা ক্রুসেড রাজ্য ছিল তাদের ভূখণ্ডের অতি নিকটে।

৪. প্রতিটি বিজয় যদিও অত্যন্ত মহান ছিল, ছিল উজ্জ্বল ও তৃপ্তিদায়ক; কিন্তু শাম অঞ্চলের তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের চোখে যেন পট্টি বাঁধা ছিল। আর তাই না তারা এই বিজয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, না বিজয়ের কার্যকারণসমূহ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছে। ক্রুসেডাররা এত বিপুল সংখ্যক জনবল হারিয়ে কঠিন সংকটে নিপতিত হলেও তারা একে কাজে লাগানোর চিন্তা করেনি এবং নিজেদের মাতৃভূমি ও ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করেনি।

৫. এই যুদ্ধগুলোর পর এশিয়া মাইনর অঞ্চলের তুর্কিরা সেখানকার নগরীগুলোতে কর্তৃত্ব বিস্তারে মনোযোগী হয়। কিলিজ আরসালান

এশিয়া মাইনরের মধ্যাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোনিয়াকে নিজের রাজধানী নির্ধারণ করেন।[৫৮৭] অপরদিকে গাজি কুমুশতেগিন বিন দানিশমান্দ পূর্বাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় জোর দেন এবং মালাতিয়ার পতন ঘটিয়ে নিজের অধিকারে নিয়ে নেন।[৫৮৮]

৬. এই যুদ্ধগুলোর ফলে ক্রুসেডার শক্তির সামনে কনস্টান্টিনোপল থেকে শাম অভিমুখী স্থলপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ সময় থেকে নিয়ে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে জার্মান সম্রাট ফ্রেডেরিক বারবারোসা (Frederick Barbarossa)-এর আমল পর্যন্ত প্রায় পূর্ণ এক শতাব্দী পথটি তাদের জন্য রুদ্ধ ছিল।[৫৮৯] এর দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, জিহাদ ও প্রতিরোধের পতাকা যখন উত্তোলিত হয়, মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের অন্তর্জগতে তখন কী পরিমাণ ভয়-ডর-শঙ্কা সৃষ্টি হয়।

৭. শাম অভিমুখী স্থলপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কনস্টান্টিনোপলে ও শামের বিভিন্ন নৌবন্দরে রসদপত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও সৈন্য সহায়তা পৌঁছানোর জন্য ভূমধ্যসাগরে জাহাজের আনাগোনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আর যেহেতু এসব জাহাজের অধিকাংশই ছিল ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্রগুলোর মালিকানাধীন, তাই স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনগুলোতে ক্রুসেড যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহে ইতালির প্রজাতন্ত্রগুলোর ভূমিকা যে অত্যন্ত প্রভাবক বিবেচিত হবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।[৫৯০]

৮. মুসলমানদের এসব বিজয়ের ফলে শামে আগে থেকেই অবস্থানরত ক্রুসেডারদের মাঝে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ধারা স্থগিত হয়ে পড়ে এবং তারা নিজেদের দখলে থাকা ভূখণ্ড রক্ষা করতে পেরেই তুষ্ট থাকে। বিশেষত ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজয় পশ্চিম ইউরোপে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সেখান থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ করার গির্জা-প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

---

৫৮৭. রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৪৭।

৫৮৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯, ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১২৬ ও Cahen: La Syrie du Nord : p. 232.

৫৮৯. Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 332-333.

৫৯০. Runciman: op. cit., 11, p. 30.

৯. পরপর তিন-তিনটি যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য উপলব্ধি করে যে, এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তুর্কিদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর মতো শক্তি বাইজান্টাইন বাহিনীর নেই। এ কারণেই তখন থেকে নিয়ে ছয় বছর পর কিলিজ আরসালানের মৃত্যু পর্যন্ত তারা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে কোনো বাহিনী পাঠানোর চেষ্টা করেনি।

১০. এই বিজয়ের অত্যন্ত দুঃখজনক একটি নেতিবাচক ফল হলো, দুই তুর্কি শাসকপরিবার সেলজুক ও বনু দানিশমান্দ এই বিজয়ের পর পরস্পর প্রচণ্ড সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং উভয় পক্ষই অপর পক্ষের ক্ষতিসাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে ঐক্যের যে নিয়ামত দান করেছিলেন, তারা তার মূল্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের সম্প্রসারণমূলক চাহিদা বাস্তবায়নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যেহেতু এশিয়া মাইনর অঞ্চলের পরিধি ছিল সীমিত, তাই এক পক্ষের সম্প্রসারণ নীতি অপর পক্ষের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে অর্জিত প্রচুর পরিমাণ সম্পদও উভয় পক্ষকে ইসলামি নীতি-আদর্শের কথা ভুলিয়ে দিয়ে পার্থিব সম্পদ অর্জনের প্রতি প্ররোচিত করতে অন্যতম কার্যকারণের ভূমিকা পালন করেছিল।[৫৯১]

তবে ব্যাপকভাবে এই যুদ্ধগুলোর কারণে এশিয়া মাইনর অঞ্চল ক্রুসেড যুদ্ধের চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রুসেডাররা যেমন দীর্ঘ দিনের জন্য তাদের পরিকল্পনা থেকে এ অঞ্চলকে বাদ দিয়ে দেয়, এ অঞ্চলের মুসলিম অধিবাসীগণও অধিকৃত শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলসহ অন্যান্য ইসলামি ইস্যুকে নিজেদের বিবেচনার বাইরে রেখে দেয়। আল-কুদস ও অধিকৃত অন্যান্য ইসলামি নগরী যেন ফিলিস্তিন ও শাম অঞ্চলের মুসলমানদের একান্ত অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে পরিণত হয়। অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের যেন এ বিষয়ে কোনো দায়-দায়িত্বই নেই। নিঃসন্দেহে এটি বোধ ও উপলব্ধির অনেক বড় ঘাটতি ও শিথিলতা এবং দ্বীন ও শরিয়তের স্বভাব-প্রকৃতি হতে বড় ধরনের দূরত্ব!

---

[৫৯১]. Gamb. Hist. of Byzantine Empire vol IV prt, 1, p. 741.

উবায়দিদের ব্যর্থ তৎপরতা

আবারও শাম ও ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত ক্রুসেড রাজ্যগুলোতে ফিরে আসছি। নতুন আগত ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পূর্বে সেখানকার রাজা ১ম বল্ডউইন তার নতুন রাজ্যের প্রশাসনিক বিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন। এরই মধ্যে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় উবায়দি বাহিনী!

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, উবায়দি সাম্রাজ্য ক্রুসেডারদের সঙ্গে রাষ্ট্রবণ্টনের সমঝোতায় আগ্রহী ছিল। তাদের চাওয়া ছিল শাম থাকবে ক্রুসেডারদের ভাগে আর ফিলিস্তিন উবায়দি সাম্রাজ্যের ভাগে। কিন্তু ক্রুসেডাররা এ প্রস্তাবে তুষ্ট না হয়ে একের পর এক নগরী দখল করতে করতে পুরো ফিলিস্তিনই নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ঘটায়। নিঃসন্দেহে এসব ঘটনা ছিল উবায়দি সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা ও লালসার সঙ্গে সম্পূর্ণই সাংঘর্ষিক। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্রোধ ও অসন্তোষ আল-কুদস নগরী ও মসজিদুল আকসার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হওয়ায় বা অন্য কোনো ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধের কারণে ছিল না; তাদের অসন্তোষ ছিল নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ ও কর্তৃত্ববাদের চাহিদায় বাধা সৃষ্টি হওয়ায় এবং উবায়দি সাম্রাজ্যের সরাসরি পূর্ব সীমান্তসংলগ্ন ফিলিস্তিন অঞ্চলে ক্রুসেডারদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উবায়দি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হওয়ায়।

এর প্রায় দুই বছর পর ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে উবায়দিরা ১ম বল্ডউইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করে এবং সাদুদ্দৌলা আল-কাওয়াসির নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রেরণ করে। সাদুদ্দৌলা ইতিপূর্বে বৈরুতের প্রশাসক ছিলেন।[৫৮২] উবায়দি বাহিনী আসকালানে শিবির স্থাপন করে। পূর্বেও আমরা জেনেছি যে, আসকালান তখন উবায়দিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আসকালানে পৌঁছে উবায়দি বাহিনী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ লড়াই শুরু করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে, উবায়দি বাহিনীর পদক্ষেপ অত্যন্ত ধীরগতির ছিল। প্রস্তুতি নিতেই তারা ছয় মাসের

---

৫৮২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৬৭।

বেশি সময় কাটিয়ে দেয়। অবশেষে ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শুরুতে তারা ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হয়। এই বিলম্বের ফলে একদিকে যেমন ক্রুসেডাররা আসন্ন যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়, অপরদিকে উবায়দিরা ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে যুদ্ধ করতে বাধ্য করার সুযোগ হারিয়ে ফেলে।[৫৯৩]

১১০১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর রামলায় উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'রামলার প্রথম যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এক পক্ষে বিশাল উবায়দি বাহিনী, আরেক পক্ষে ১ম বল্ডউইনের নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র কিন্তু সুবিন্যস্ত ক্রুসেডার বাহিনী। উবায়দিরা যদিও জনবল বিবেচনায় ক্রুসেডারদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল; কিন্তু দ্রুতই তারা পরাজিত হয় এবং তাদের সেনাপতি সাদুদ্দৌলা আল-কাওয়াসি যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন।[৫৯৪] উবায়দি বাহিনীর প্রচুর সৈন্য নিহত হয়; বাকিরা পালিয়ে সুরক্ষিত আসকালানে আশ্রয় নেয়। তাদের অস্ত্রশস্ত্র, রসদসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সবকিছু ক্রুসেডাররা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে লাভ করে।[৫৯৫]

নিঃসন্দেহে রামলার প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের ঘটনা ছিল মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের জন্য চরম বেদনাদায়ক আঘাত!

মিশরীয় প্রশাসনের যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রক উজির আফজাল বিন বদর আল-জামালি এ পরাজয়ের সংবাদ জানতে পেরে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এর প্রতিশোধ নিতে আরেকটি বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নতুন আরেকটি বাহিনী প্রস্তুত করতে কেটে যায় আট মাসের অধিক সময়! এর ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস অঞ্চলের পরিস্থিতি অনেকটা স্থিতিশীল হয়ে যায়।

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে নবাগত ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার কাছাকাছি সময়েই রামলায় ক্রুসেডাররা উবায়দি বাহিনীকে পরাজিত করে। এর ফলে ক্রুসেডারদের হৃত আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও ফিরে আসে।

---

৫৯৩. Stevenson: op. cit., pp. 44-45.

৫৯৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৬৭-৬৮।

৫৯৫. Albert d` Aix, p. 553 & Guillaume de Tyr, 1, p. 26.

রেমন্ডের নতুন লালসা

তুলুজের কাউন্ট ৪র্থ রেমন্ড তখনও পর্যন্ত নিজের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি এবার ভেবে দেখেন যে, লেবানন অঞ্চলে নিজের জন্য একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষিপ্র ও ত্বরিত প্রচেষ্টা চালানো উচিত। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, তিনি সুরক্ষিত ত্রিপোলিতে নিজের জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেও ক্রুসেড অভিযানের অন্যান্য সেনাপতির সঙ্গে বিরোধের কারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। একইভাবে তিনি নতুন আগত ক্রুসেডার বাহিনীকে নিয়ে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন এবং পুরো বাহিনী বলতে গেলে মুসলমানদের পদতলে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রেমন্ড ভেবে দেখেন যে, বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে তার কোনো লাভ তো হচ্ছেই না; উল্টো অন্যান্য ক্রুসেডার সেনাপতির মাঝে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে যে, রেমন্ড তাদের সঙ্গে এবং ক্রুসেড পরিকল্পনার সঙ্গে গাদ্দারি করছেন। ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রেমন্ড যখন নিজের জন্য একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নবোদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে এন্টিয়কের দক্ষিণে সেন্ট সাইমন নৌবন্দর অভিমুখে রওনা হতে কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করেন, তখন এন্টিয়কের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনকর্তা টেনক্রেডের জনৈক সেনাপতি ক্রুসেডারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে রেমন্ডকে বন্দি করে। এরপর টেনক্রেড তাকে এন্টিয়কের কারাগারে বন্দি করে রাখেন[৫৯৬] এবং তার বিরুদ্ধে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে আঁতাত ও যোগসাজশ করার বরং বাইজান্টাইনদের স্বার্থরক্ষায় ক্রুসেডার বাহিনীকে ইচ্ছাকৃত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ আনেন। একে কেন্দ্র করে ক্রুসেডারদের মাঝে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টির উপক্রম হয়। কারণ, রেমন্ডের পক্ষে প্রভিন্স অঞ্চলের পূর্ণ একটি বাহিনী ছিল। এ কারণেই অন্যান্য ক্রুসেডার নেতা রেমন্ডকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য টেনক্রেডের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে টেনক্রেড এই শর্তে রেমন্ডকে মুক্তি দেন যে, রেমন্ড ভবিষ্যতে এন্টিয়ক ও লাতাকিয়ার বিষয়ে কোনো ধরনের অধিকার দাবি করা থেকে বিরত থাকবেন। শর্ত মেনে নিয়ে রেমন্ড বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। এরপর তিনি দ্রুত এন্টিয়ক থেকে বের হয়ে লেবানন অভিমুখে

---

৫৯৬. Matthieu d` Edesse (Doc. Ar. 1), p. 27.

অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি (বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত) তারতুস (Tartus) নগরী অবরোধ করেন।[৫৯৭] জেনোভার একটি নৌবহর তাকে এই অবরোধে সহায়তা করে।[৫৯৮] ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে নগরীটির পতন ঘটে। রেমন্ড নগরীটিকে তার অভিযানের মূল ঘাঁটি এবং ত্রিপোলি অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার কেন্দ্র নির্ধারণ করেন।[৫৯৯]

যদিও রেমন্ডের বাহিনী ছিল একেবারেই ক্ষুদ্র, সর্বোচ্চ কয়েকশ সৈন্যবিশিষ্ট; কিন্তু তিনি সামান্য দ্বিধার শিকার না হয়ে এরপর এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই ত্রিপোলি অবরোধ করেন।[৬০০] এখন তো তার অস্তিত্বের ও টিকে থাকার লড়াই! ইতিমধ্যে তার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আর তাই সবকিছু হারানোর পূর্বেই প্রয়োজন ঐকান্তিক ও কঠোর প্রচেষ্টা।

পূর্বেও বলা হয়েছে যে, ত্রিপোলির প্রশাসক ইবনে আম্মার শিয়া মতাদর্শী হলেও উবায়দি সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। আর তাই ত্রিপোলির অভ্যন্তরে একাকী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেও তার পক্ষে উবায়দি সাম্রাজ্যের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। কারণ, তিনি জানতেন যে, তার রাষ্ট্রের প্রতি উবায়দিদের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। আর এ কারণেই তিনি নিরুপায় হয়ে অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুই পরম শত্রুর কাছে সাহায্যবার্তা পাঠান। একজন হলেন দামেশকের শাসক দাক্কাক, অপরজন হিমসের শাসক জানাহুদ্দৌলা।[৬০১] দামেশক ও হিমস ত্রিপোলির তুলনামূলক নিকটবর্তী হলেও সুন্নি নগরীদুটির সঙ্গে ইবনে আম্মারের পুরোনো ও ঘোরতর বিরোধ ছিল। কদিন পূর্বেই দাক্কাক যখন ক্রুসেডার বাহিনীর প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন, তখন এই ইবনে আম্মারই ক্রুসেডার বাহিনীকে এমন পথ দেখিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি, যার মাধ্যমে তারা দাক্কাকের বাহিনীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণই ভিন্ন। সেদিনের পথপ্রদর্শক আজ নিজেই শিকার! নিঃসন্দেহে কারও মাঝেই ইসলামি চেতনাবোধ ছিল

---

৫৯৭. Albert d' Aix, pp. 582-683.

৫৯৮. Heyd : op. cit., 1, p. 139.

৫৯৯. Archer: Op. cit., p. 156.

৬০০. Raoul de Caen,p. 708.

৬০১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৫৫।

না। না ইবনে আম্মারের মাঝে, না দাক্কাক বা জানাহুদ্দৌলার মাঝে। বিষয় কেবলই ব্যক্তিস্বার্থ!

মুসলিম নেতাদ্বয় এমন আবেদন গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন কেন! এটি তো ত্রিপোলি রাজ্যের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রদত্ত এক মহা সুযোগ। রেমন্ডের বাহিনী তো একেবারেই ক্ষুদ্র! কদিন আগেই রেমন্ডের বাহিনী এশিয়া মাইনর অঞ্চলে কিলিজ আরসালান ও কুমুশতেগিন বিন দানিশমান্দের হাতে পরাজিত হয়েছে। অবশেষে দুই নেতা ইবনে আম্মারকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে রওনা হন![৬০২]

যদিও দাক্কাক, জানাহুদ্দৌলা ও ইবনে আম্মারের সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী রেমন্ডের বাহিনীর চেয়ে অনেক গুণ বড় ছিল; কিন্তু রেমন্ড তাদেরকে পরাজিত করে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হন। বরং ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের ভাষ্যমতে এই কয়েকশ সৈন্য নিয়েই রেমন্ড মুসলিম বাহিনীর সাত হাজার সৈন্যকে হত্যা করেন! ইবনে আম্মারের বাহিনী পালিয়ে ত্রিপোলির অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয় আর দাক্কাক ও জানাহুদ্দৌলার বাহিনী পালিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যায়। রেমন্ড যুদ্ধ শেষে আবারও ত্রিপোলি অবরোধ করেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ইবনে আম্মার রেমন্ডকে জিজিয়া প্রদানের প্রস্তাব দিলে রেমন্ড তা মেনে নেন। কারণ, তিনি জানতেন—এত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ত্রিপোলির পতন ঘটানো কার্যত অসম্ভব। এরপর ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ বা এপ্রিল মাসে রেমন্ড নিজ ঘাঁটি তারতুসে ফিরে আসেন।[৬০৩]

রেমন্ড কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তারতুসে ফিরে আসেননি। তিনি ফিরে এসেছেন তার সৈন্যদের নতুন অভিযানের জন্য প্রস্তুত করতে। আর তাই ফিরে আসার কদিন পরই ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই তিনি হিমস নগরীর অধিভুক্ত তুবান ও আকরাদ দুর্গসহ বেশ কিছু দুর্গ দখলের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েন।[৬০৪] ইতিপূর্বে জানাহুদ্দৌলার বাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি দুর্গগুলো অবরোধ করে হামলা শুরু করেন। রেমন্ড যখন দুর্গগুলো অবরোধে ব্যস্ত, তখনই হিমস নগরীতে

---

৬০২. প্রাগুক্ত, ৯/৫৫।

৬০৩. প্রাগুক্ত, ৯/৫৫ ও Raoul de Caen,p. 707.

৬০৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৫৫-৫৬ ও Stevenson: op. cit., p. 54.

এমন এক দুর্যোগ সংঘটিত হয়, যা দ্বারা তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের পরিমাণ কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায়।

আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ান ও হিমসের শাসক জানাহুদ্দৌলা হুসাইন বিন মালাইবের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরোধ জিইয়ে ছিল। হুসাইন বিন মালাইব যদিও রিজওয়ান বিন তুতুশের মাকে বিয়ে করেছিলেন; কিন্তু রিজওয়ান এমন কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ সময়ে অমার্জনীয় এক অপরাধ করে বসেন। তিনি তার মায়ের পতি ও হিমসের অধিপতি জানাহুদ্দৌলাকে হত্যা করেন। এ জাতীয় গুপ্তহত্যায় সিদ্ধহস্ত শিয়া ইসমাইলি বাতিনি সম্প্রদায়ের তিনজন গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে রিজওয়ান এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। ৪৯৫ হিজরি সনে (১১০২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) জানাহুদ্দৌলা হিমসের জামে মসজিদে নামাজ আদায়কালে নিহত হন![৬০৫]

নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত গর্হিত এক অপরাধ!

অপরাধের ভয়াবহতা কেবল অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানের প্রাণহরণ কিংবা নামাজ চলাকালে মসজিদের অভ্যন্তরে গুপ্তহত্যার কারণে নয়, অপরাধ কেবল এতটুকু নয় যে, রিজওয়ান তার মায়ের পতিকে হত্যা করেছেন; বরং অপরাধের ভয়াবহতা এই বিবেচনায়ও যে, তা উম্মাহর এই চরম কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সংঘটিত হয়েছে!

হিমস যে তখন রেমন্ডের বাহিনীর মোকাবিলা করছিল, রিজওয়ান সেদিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি; ভ্রুক্ষেপ করেননি দেশটি তখন যে সংকটে নিপতিত হয়েছিল সেদিকেও। তিনি এ বিষয়টি ভেবে দেখেননি যে, শাসককে হারিয়ে হিমস আরও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। দাম্ভিক রিজওয়ান শুধু নিজের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন! তার প্রতিহিংসার শিকার হয়ে হিমস এক কঠিন ও সঙ্গিন মুহূর্তে হয়ে পড়ে নেতৃত্বহারা।

রেমন্ড এই ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি দ্রুত তার বাকি সৈন্যদের নিয়ে সরাসরি হিমসে চলে আসেন এবং পতন ঘটানোর লক্ষ্যে নগরীটি অবরোধ করেন।[৬০৬] নিরুপায় হিমসবাসী দামেশকের অধিপতি

---

৬০৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৫৬ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৪৬।

৬০৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৫৬।

দাক্কাকের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে। দাক্কাক একে রাজ্য বিস্তৃতির সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করে তার বাহিনী নিয়ে হিমস অভিমুখে রওনা হন। রেমন্ড যখন দেখতে পান যে, অচিরেই তিনি হিমস ও দামেশকের বাহিনীর মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে যাচ্ছেন, তখন তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে তারতুসে ফিরে যান। এদিকে দাক্কাক হিমসে পৌঁছে নগরীটিকে নিজ রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন। এটি ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা। এরপর দাক্কাক তার জনৈক সেনাপতি তুগতেকিনকে হিমসে প্রশাসক নিযুক্ত করে নিজে দামেশকে ফিরে আসেন।[৬০৭]

এর মাধ্যমে আবারও এ অঞ্চলে তুলনামূলক স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরে আসে। রেমন্ড ত্রিপোলি অবরোধের প্রস্তুতি নিতে সৈন্য বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত থাকায় আপাতত কিছু দিন শান্ত থাকেন। দাক্কাকও রেমন্ডের শান্তভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে নিশ্চুপ থাকেন এবং রেমন্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা বা তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। যেন রেমন্ড যে ভূখণ্ডের ওপর হাত রেখেছেন, তা তার অধিকারে পরিণত হয়েছে এবং এমন বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক!

নতুন করে উবায়দিদের আত্মপ্রকাশ

আমরা আবারও বাইতুল মুকাদ্দাসের আলোচনায় ফিরে আসছি। ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রথম রামলার যুদ্ধে উবায়দিদের পরাজয়ের পর ইতিমধ্যে কয়েক মাস কেটে গেছে। রামলার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে উবায়দিরা আবারও বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিনে আগমন করে এবং ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আসকালানে অবতরণ করে। অর্থাৎ প্রথম যুদ্ধের বিপর্যয়ের পর ইতিমধ্যে আট মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এবার উবায়দি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উজির আফজাল বিন বদর আল-জামালির পুত্র শারফ আল-মাআলি। বোঝাই যাচ্ছে, উবায়দি প্রশাসন এবারের অভিযানকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।[৬০৮]

সংবাদ পেয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের রাজা ১ম বল্ডউইন জাফা অঞ্চলে তার কয়েক হাজার সৈন্যকে সমবেত করেন। এরপর তিনি জাফা ও রামলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনুসন্ধানমূলক তৎপরতার উদ্দেশ্যে

---

৬০৭. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৪৭।

৬০৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৬৮।

বের হন। তার সঙ্গে তখন মাত্র দুইশ সৈন্য ছিল। আকস্মিকভাবে উবায়দিরা সেখানে তাদের ওপর হামলা চালায়। অপ্রত্যাশিত হামলায় ক্রুসেডার সৈন্যরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আকস্মিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ক্রুসেডার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়; বাকিরা পালিয়ে কিছু জাফায় এবং কিছু রামলায় চলে যায়। সেনাপতি বল্ডউইন নিজে পালিয়ে রামলায় চলে যান। এটি ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের ১৭ তারিখের ঘটনা।[৬০৯]

এরপর উবায়দি বাহিনী বল্ডউইনকে হত্যা করার জন্য রামলা অবরোধ করে। কিন্তু বল্ডউইন রাতের অন্ধকারে রামলা থেকে পালিয়ে জাফা অভিমুখে রওনা হন। উবায়দি বাহিনীর হাতে রামলার পতন ঘটে।[৬১০] এরপর উবায়দিরা জাফা অবরোধের উদ্দেশ্যে একটি দ্রুতগামী বাহিনী প্রেরণ করে।[৬১১] বল্ডউইনও তৎক্ষণাৎ পথ পরিবর্তন করে জাফার উত্তরে আরসুফে চলে যান।[৬১২] এরপর তিনি আরসুফে অবস্থানকারী ক্রুসেডারদের সমবেত করেন এবং তাদেরকে নিয়ে জাফায় অবস্থানরত ক্রুসেডার বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য সমুদ্রপথে জাফায় চলে আসেন। পাশাপাশি তিনি প্রচুর সৈন্য ও তীর্থযাত্রী নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আগত দুইশ জাহাজবিশিষ্ট একটি নৌবহরের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। উপকূলীয় অঞ্চলে উবায়দি জাহাজসমূহের উপস্থিতি সত্ত্বেও বল্ডউইন সমুদ্রপথে জাফায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি নগরীর অভ্যন্তরে তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করতে শুরু করেন।[৬১৩] মে মাসের ২৭ তারিখে বল্ডউইন উবায়দি বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে জাফার নগরপ্রাচীরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। পরিতাপের বিষয়, অল্প সময়ের যুদ্ধের পর উবায়দি বাহিনী চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয়। উবায়দি বাহিনীকে পরাভূত করতে ক্রুসেডার বাহিনীকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রাণক্ষয়ও করতে হয়নি। পরাজিত উবায়দি বাহিনীর সৈন্যরা পালিয়ে

---

৬০৯. প্রাগুক্ত, ৯/৬৮ ও Albert d' Aix, p. 593.

৬১০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৬৮ ও Foucher de chartres, p. 402.

৬১১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৬৮।

৬১২. Albert d' Aix, p. 595.

৬১৩. Michaud: op. cit. 11, p. 30 & Runciman: op. cit., 11, 79-80.

আসকালানে ফিরে যায়।[৬১৪] আট মাসের মধ্যে টানা দ্বিতীয় পরাজয়ে উবায়দি সাম্রাজ্যের সামরিক সংকট আরও ঘনীভূত হয় আর ফিলিস্তিন অঞ্চলে ক্রুসেডারদের কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় অবস্থান লাভ করে।

বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যে স্থিতিশীলতা

উবায়দি বাহিনীকে পরাজিত করে বল্ডউইন বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং প্রশাসনিক বিন্যাসে মনোযোগী হন। এ সময় পোপ ২য় পাসকাল বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশপ ডেমবার্টের বিষয়ে তদন্ত করতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। বল্ডউইনই ইতিপূর্বে পোপের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ডেমবার্টের অসদাচরণ সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এবং তার বিভিন্ন আচরণ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। পোপের প্রতিনিধি বিশপ অ্যাবরামার (Abramar) বাইতুল মুকাদ্দাসে আগমন করলে বল্ডউইন তাকে স্বাগত জানান। বিশপ অ্যাবরামার স্বাভাবিকভাবেই বল্ডউইনের সহায়তায় তদন্ত শুরু করেন। সামান্য তদন্তের পরই প্রমাণিত হয় যে, ডেমবার্ট বিভিন্ন অন্যায়ে জড়িত। এরপর ডেমবার্টকে গুরুত্বপূর্ণ বিশপ পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং অ্যাবরামার তার স্থলাভিষিক্ত হন!

এর মাধ্যমে বল্ডউইন তার ক্ষমতার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমবার্টের থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন।[৬১৫] এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে এন্টিয়কের শাসক টেনক্রেড অভিযোগ-আপত্তি করলেও বল্ডউইনের তাতে কী আসে যায়! তিনি তো এখন ক্রুসেডার সেনাপতিদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিমান নেতা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক!

বল্ডউইনের এই পদক্ষেপ থেকে আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেও ঠিক হবে না যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে ধর্মনিরপেক্ষ রাজকীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গির্জার প্রভাব-প্রতিপত্তি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। বরং বাস্তবতা হলো, এরপরও গির্জার ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় ছিল। রাজনৈতিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদিও গির্জার উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গির্জার ছিল ব্যাপক প্রভাব। ক্রুসেড রাজ্যগুলোর আশ্রম ও গির্জাগুলো প্রচুর সম্পদ ও ভূ-মালিকানার অধিকারী ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা বাইতুল

---

৬১৪. Foucher de chartres, pp. 404-405 & Guillaume: de Tyr, p. 435.

৬১৫. Runciman: op. cit., II, 81-82.

মুকাদ্দাসের জিওন পাহাড়ে (Mount Zion) অবস্থিত আশ্রমটির কথা বলতে পারি। এই আশ্রমটি ৫৮৩ হিজরি সনে (১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) একেবারে বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর অভ্যন্তরে একটি পূর্ণ মহল্লার মালিকানা লাভ করে। এ ছাড়াও আশ্রমটির আসকালান, জাফা, নাবলুস, কায়সারিয়া, আক্কা, সুর, এন্টিয়ক ও কিলিকিয়ায় প্রচুর বাগান, জমিজমা ও বাজারের মালিকানা ছিল। বরং একই আশ্রমের ইউরোপের সিসিলি, ইতালি ও ফ্রান্সেও প্রচুর ভূ-সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ছিল!

নিঃসন্দেহে আশ্রম ও গির্জাগুলোর সম্পদপ্রাচুর্য ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও সেনাপতিদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করত। বিশেষত এ বিষয়টিও তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করত যে, গির্জার মালিকানাধীন সম্পদ ছিল করমুক্ত[৬১৬] আর গির্জাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সামরিক কোনো দায়িত্ব পালন করতে হতো না। সেনাপতিগণ যেহেতু মনে করত যে, তাদের জীবনে ধর্মের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও প্রভাব নেই, যার বিনিময়ে গির্জা এত বিশাল সম্পদ ভোগ করতে পারে, তাই তাদের মনমস্তিষ্কে হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খেত। তবে মনে যত প্রশ্নই তোলপাড় করুক, তারা এই বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য ছিল। তখন থেকে আরও কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরই কেবল সাধারণ ইউরোপবাসী রাজন্যবর্গের এই অসন্তোষ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল![৬১৭]

মুসলিম রাজন্যবর্গের পতন!

যে সময় ক্রুসেড রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক একই সময় মুসলিম রাজ্যগুলোর পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির পথে ধাবিত হচ্ছিল। এতদিন তো মুসলিম রাজ্যগুলো পরস্পর বিরোধ ও সংঘাতে জড়িয়ে ছিল; এবার প্রতিটি রাজ্যের অভ্যন্তরেই শুরু হয় গৃহসংঘাত। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় মসুলের কথা। ৪৯৫ হিজরি সনে (১১০২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে) মসুলের প্রশাসক কারবুগা মৃত্যুবরণ করলে মসুলের শাসনক্ষমতা নিয়ে সুনকুরজা ও মুসা তুর্কমানি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। সংঘাতে সুনকুরজা নিহত হন এবং মুসা তুর্কমানি শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন। অল্প কদিন পরই তিনি

---

৬১৬. Thomson: op. cit., p. 406.

৬১৭. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৩৮৯।

জাকারমিশের (Djekermish) হাতে নিহত হন এবং ক্ষমতার লাগাম চলে যায় জাকারমিশের হাতে। এভাবেই চলতে থাকে নেতৃত্বের পতন ও নতুন নেতৃত্বের আগমন![৬১৮]

জনজীবনে দ্বীনি শিক্ষা ও ধর্মীয় চেতনার অনুপস্থিতি, ক্ষমতার মোহ ও সম্পদের লালসা, ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতার বিলুপ্তি ইত্যাদি কারণে মুসলিম সমাজে যে শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাজে লাগিয়ে ক্রুসেডাররা যে মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রমূলেই শেকড় গেড়ে বসবে, তা কেবল অনুমেয় নয়; অবশ্যম্ভাবী ছিল! আর তাই এ তথ্যে মোটেও বিস্ময়ের কিছু নেই যে, মসুলে যখন ক্ষমতা নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মাঝে চলছে চরম সংঘাত, তার মাঝেই ১১০২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে প্রায় দেড় বছরের অবরোধের পর এন্টিয়ক অধিপতি টেনক্রেডের হাতে লাতাকিয়া নগরীর পতন ঘটে। ক্রুসেডারদের হাতে শাম অঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই নৌবন্দরটির নিয়ন্ত্রণ চলে গেলেও আলেপ্পো, হামা, হিমস বা পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো ইসলামি নগরী এ সময় লাতাকিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়নি। লাতাকিয়া বিজয়ের ফলে ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক সমুদ্র অভিমুখী বিস্তৃত করিডোরের অধিকারী হয়। এর ফলে পরবর্তী দশকের পর দশক ধরে ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে আগত রসদপত্র এন্টিয়কে সহজে পৌঁছা নিশ্চিত হয়, যা রাজ্যটির অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে।[৬১৯]

১১০৩ খ্রিষ্টাব্দের (৪৯৬ হিজরি) ঘটনাপ্রবাহ দ্বারাও তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক অধঃপতনের পরিমাণ আন্দাজ করা যেতে পারে। মসুলের মতো কেবল ক্ষমতার গদি নিয়ে সংঘাত নয়; কোনো কোনো মুসলিম নেতার অবস্থা এ সময় এতটা নিন্দনীয় পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তারা এক মুঠো দিনারের বিনিময়ে উম্মাহর স্বার্থকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে কিংবা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ের চুক্তি করতে সামান্য দ্বিধা করছিলেন না! এরই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

পূর্বের ঘটনাপ্রবাহে আমরা জেনেছি যে, দানিশমান্দ রাজ্যের শাসক গাজি কুমুশতেগিন ক্রুসেডার সেনাপতি ও এন্টিয়কের সাবেক শাসক

---

৬১৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৫৪-৫৫।

৬১৯. Raoul de Caen, pp. 708-709.

বোহেমন্ডকে পাকড়াও করার পর এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী সুরক্ষিত নিকসার দুর্গে বন্দি করে রেখেছিলেন। এ ঘটনার প্রায় তিন বছর পর ১১০৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ এন্টিয়কের গির্জাধ্যক্ষ বার্নাডের সঙ্গে সমঝোতা করে দুজনে মিলে বোহেমন্ডকে মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বল্ডউইন ডি বুর্গ তখন এন্টিয়কের অন্তর্বর্তীকালীন শাসক টেনক্রেডের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে ভীত হয়ে পড়েছিলেন।[৬২০]

বিশেষ করে ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের ব্যর্থ ক্রুসেড অভিযানের স্মৃতিচারণ করে বল্ডউইন উপলব্ধি করেন যে, সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বোহেমন্ডকে মুক্ত করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই তিনি রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন। গাজি কুমুশতেগিন বোহেমন্ডকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে কী দাবি করেন, তা জানার জন্য বল্ডউইন ডি বুর্গ গাজিকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আহ্বান জানান। উভয়ের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও দরকষাকষি হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সুনির্দিষ্ট কোনো সমাধানে একমত হতে ব্যর্থ হয়।[৬২১]

এ সময় বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস দু-পক্ষের বৈঠক সম্পর্কে অবগত হন। সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস বোহেমন্ডকে প্রচণ্ড অপছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন যে, বোহেমন্ড তাকে নিয়ে খেলেছেন, হৃদ্যতা, মিত্রতা, আনুগত্য ইত্যাদির বুলি আওড়িয়ে তাকে প্রবঞ্চিত করেছেন এবং শেষে এ সবকিছু অস্বীকার করে এন্টিয়ক দখল করে নিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বোহেমন্ডের বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি ও তার ভাগ্নে টেনক্রেড বাইজান্টাইন সম্রাটকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে এন্টিয়কের উত্তরে কিলিকিয়া অঞ্চলের তারসুস, আদানা ও মপসুয়েসটিয়া নগরী দখল করে নিয়েছেন। সবশেষে টেনক্রেড সেই লাতাকিয়া নৌবন্দরও দখল করে নিয়েছেন, যার কর্তৃত্ব নিয়ে ক্রুসেডারদের সঙ্গে বাইজান্টাইনদের বিরোধ চলছিল। লাতাকিয়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় এ অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গৌরব ও মর্যাদা প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া বোহেমন্ডের সঙ্গে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শত্রুতার ইতিহাস তো

---

৬২০. Runciman: op. cit., 11, p. 38.
৬২১. Albert d' Aix, p. 610.

আরও পুরোনো। ক্রুসেড অভিযান শুরু হওয়ারও কয়েক বছর পূর্ব থেকেই উভয় পক্ষের বিরোধ চলে আসছিল। আর তাই বাইজান্টাইন সম্রাট যখন বোহেমন্ডের মুক্তিসংক্রান্ত আলোচনার কথা জানতে পারেন, তখন তিনিও এই রাজনৈতিক খেলায় প্রবেশ করে বোহেমন্ডের বিষয়ে গাজির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও দরকষাকষির সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস নরম্যান সেনাপতি বোহেমন্ডকে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে গাজিকে দুই লক্ষ ষাট হাজার দিনার প্রদানের বিরাট প্রস্তাব প্রদান করেন![৬২২]

বোহেমন্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণই নয়; বাইজান্টাইন সম্রাট এর মাধ্যমে এমন একটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছিলেন, যা বোহেমন্ডকে বন্দি করার পর বিগত তিন বছরে মুসলমানরা চিন্তাও করেনি। তিনি চাচ্ছিলেন বোহেমন্ডকে কেনার পর তাকে নিয়ে এন্টিয়কের নরম্যানদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে। তার আশা ছিল, বোহেমন্ডকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে এক বা একাধিক নগরীর মালিকানা বাগিয়ে নিতে পারবেন। নরম্যানদের কাছে বোহেমন্ডের মূল্য কতটা বেশি, বাইজান্টাইন সম্রাট তা ভালো করেই জানতেন। সম্রাটের স্মরণ ছিল যে, এই বোহেমন্ডকে মুক্ত করার জন্যই ১১০১ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণ একটি ক্রুসেডার বাহিনী নিকসার দুর্গ অভিমুখে রওনা হয়েছিল। অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নরম্যানদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং পুরো বাহিনীটি ধ্বংসের শিকার হয়েছিল।

বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্তাব ছিল গাজি বিন দানিশমান্দের জন্য অত্যন্ত লোভনীয় ও প্রলুব্ধকর এক প্রস্তাব! তিনি তো লড়াই করছেন সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে, অর্থসম্পদ বৃদ্ধির লালসায়। বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তেমন কোনো কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই তার পকেটে ঢুকবে বিরাট অঙ্কের অর্থ!

এ প্রস্তাব মোটেও ফেলে দেওয়ার নয়! এ তো ভালোভাবে চিন্তা করে গ্রহণ করার মতো বিষয়!

আচ্ছা, আর কেউ কি বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্তাবের কথা জানে?!

হ্যাঁ, বিখ্যাত সেলজুক নেতা কিলিজ আরসালানের কানেও বাইজান্টাইন

---

৬২২. Albert d' Aix, p. 610.

সম্রাটের প্রস্তাবের সংবাদ পৌঁছে গেছে। কিলিজ আরসালান তো এশিয়া মাইনর অঞ্চলের ক্ষমতাসীন দুই তুর্কি পরিবারের আরেকটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি ও তার ভাইয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রেই দানিশমান্দ পরিবারের বিরুদ্ধে শত্রুতা লালন করে আসছেন। কিলিজ আরসালান যখন জানতে পারেন যে, দানিশমান্দ পরিবারের সম্পদভান্ডারে অচিরেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ যুক্ত হতে যাচ্ছে, তখন তার লোভাতুর মন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ গাজি কুমুশতেগিনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে প্রস্তাবিত অর্থ পাওয়ামাত্র অর্ধেক তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। কারণ, ১১০১ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধে তিনি তো গাজিকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন।[৬২৩]

তাহলে সেই যুদ্ধ ও সহায়তা মোটেও আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ছিল না!

যুদ্ধ ছিল নিজেদের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য, অর্থ ও সম্পদ অর্জন করার জন্য। একনিষ্ঠতা, আত্মনিবেদন, দ্বীনের সহায়তা, জান্নাতের আগ্রহ, আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও লড়াই ইত্যাদি সুউচ্চ ইসলামি নীতি ও তাৎপর্যের কোনো স্থান তৎকালীন মুসলিম নেতাদের অন্তরে ছিল না!

গাজি কুমুশতেগিন এবার কিলিজ আরসালানের দাবি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। কিলিজ আরসালানের দাবি মেনে নিলে তার পকেটে থাকবে 'মাত্র' এক লক্ষ ত্রিশ হাজার দিনার! যদিও তা পরিমাণে অনেক বড় অঙ্ক; কিন্তু তার চাওয়া তো আরও অনেক অনেক বেশি। তা ছাড়া তিনি তো কিছুতেই কিলিজ আরসালানের কোনো দাবির সামনে নতি স্বীকার করাকে মেনে নিতে পারেন না।

করণীয় নির্ণয়ে গাজি বিন দানিশমান্দ এবার প্রকৃতই দিশেহারা হয়ে পড়েন!

বোহেমন্ডের মুক্তি

এই যখন পরিস্থিতি, তখন আরও একটি পক্ষ দরকষাকষির আলোচনায় প্রবেশ করে। এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ ও বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের পর এবার মঞ্চে

---

৬২৩. Runciman: op. cit., 11, 301.

আবির্ভূত হন স্বয়ং বন্দি বোহেমন্ড!

মুসলিম সমাজে তখন যে অবক্ষয় বিরাজ করছিল, তাতে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, মুসলমানদের মধ্য হতেই কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কিছু অর্থ, জায়গির ভূমি বা অন্য কোনো সম্পদের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বন্দি বোহেমন্ডের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। আর তাই এডেসা অধিপতি বল্ডউইন ডি বুর্গের প্রচেষ্টা, বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্তাব ও সুলতান কিলিজ আরসালানের ভাগ-বাটোয়ারার দাবির পর এবার স্বয়ং বোহেমন্ড গাজিকে নতুন এক প্রস্তাব প্রদান করেন![৬২৪]

বোহেমন্ড গাজিকে বুঝিয়ে বলেন যে, 'দেখুন, বাইজান্টাইন সম্রাট আমাদের উভয়ের যৌথ শত্রু। তিনি এশিয়া মাইনর অঞ্চলের নগরীগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভের আশায় সকলের সঙ্গে বিরোধ করছেন। আবার কিলিজ আরসালানও আমাদের উভয়ের শত্রু। (কারণ, এশিয়া মাইনর অঞ্চলে কিলিজ আরসালানের স্বার্থ ও লালসা সন্দেহাতীতভাবেই বোহেমন্ড ও গাজি উভয়ের লালসার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল।) আর তাই আমাকে বাইজান্টাইন সম্রাটের হাতে তুলে দেওয়া হলে কিংবা কিলিজ আরসালানকে তার দাবিকৃত অর্ধেক অর্থ প্রদান করা হলে আমার তো ক্ষতি হবেই, তার পূর্বে আপনার বিরাট স্বার্থহানি হবে।'

এসব দিক তুলে ধরে বোহেমন্ড গাজিকে প্রস্তাব দেন যে, তিনি এন্টিয়ক রাজ্য ও তার বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে গাজিকে এক লক্ষ দিনার প্রদান করবেন এবং এ অর্থ তার মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ছাড়াও উভয় পক্ষের মাঝে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং এর মাধ্যমে ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক বনু দানিশমান্দের মুসলিম রাজ্যের বন্ধুরাষ্ট্রে পরিণত হবে![৬২৫]

নিঃসন্দেহে এ প্রস্তাব ছিল চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক গাজি বিন দানিশমান্দের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রলুব্ধকর! কারণ—

১. এ প্রস্তাব মেনে নিলে তিনি বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের মালিক হবেন। যদিও বোহেমন্ডের প্রস্তাবিত অঙ্ক বাইজান্টাইন সম্রাটের

---

৬২৪. Setton: op. cit. vol. 1, p. 388.

৬২৫. Albert d' Aix, p. 610-612.

প্রস্তাবিত অঙ্কের চেয়ে অনেক কম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও বিরাট একটি অঙ্ক। বোহেমন্ডের প্রস্তাবটিও যে যথেষ্ট বড় ছিল তা আমরা এভাবেও উপলব্ধি করতে পারি যে, এন্টিয়ক রাজ্য একা এই অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেনি; বরং তারা এডেসা রাজ্য ও সিসিলিতে বসবাসকারী বোহেমন্ডের পরিবারের সহায়তাও গ্রহণ করেছিল। এ তথ্যটিও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য হতে পারে যে, এর কিছুদিন পর যখন এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ বন্দি হন, তখন তার মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয় মাত্র পনেরো হাজার দিনার!

২. বোহেমন্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে গাজির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের শক্তিবৃদ্ধিতে কোনো প্রকার অবদান রাখবে না।

৩. এটা হবে গাজির পরম শত্রু কিলিজ আরসালানের গন্ডদেশে সরাসরি চপেটাঘাত।

৪. এর মাধ্যমে গাজি বিন দানিশমান্দ বন্দি শাসক বোহেমন্ডের হৃদ্যতা লাভ করবেন এবং ক্রুসেডার রাজ্য এন্টিয়কের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন।

গাজি বিন দানিশমান্দের পক্ষে এসব দিক বিবেচনা করে এই প্রলুব্ধকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বোহেমন্ডের প্রস্তাবে সম্মতি জানান এবং মালাতিয়ায় চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন। মালাতিয়া তখন গাজির কর্তৃত্বাধীন ছিল।[৬২৬]

এ সংবাদ এন্টিয়কে পৌঁছতেই বোহেমন্ডের অনুসারীরা এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গের সঙ্গে মিলে দ্রুত অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে। আরও কিছু বিত্তশালী ক্রুসেডার এতে শরিক হয়। সিসিলিতে বসবাসকারী বোহেমন্ডের পরিবারের পক্ষ থেকেও কিছু অর্থ প্রেরণ করা হয়। ১১০৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের শুরুতে (৪৯৬ হিজরি সনে) উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং বোহেমন্ড মুক্তি লাভ করেন। বোহেমন্ডের সঙ্গে হৃদ্যতা ও মিত্রতা রক্ষা এবং ভবিষ্যতে নিষ্ঠাপূর্ণ যৌথ সহযোগিতার অঙ্গীকার

---

[৬২৬]. Runciman: op. cit., 11, p.39.

বিনিময়ের পর গাজি চুক্তি অনুযায়ী অর্থ লাভ করেন।[৬২৭]

এ সংবাদ জানতে পেরে কিলিজ আরসালান ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যান!

এত বিরাট অঙ্ক হাতছাড়া হয়ে গেল!

বোহেমন্ডকে যদি সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের হাতে তুলে দেওয়া হতো, তাহলে কিন্তু কিলিজ আরসালান মোটেও বিক্ষুব্ধ হতেন না। অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস বুঝি মুসলমানদের বন্ধু; তার হাতে শক্তি-বৃদ্ধির উপকরণ তুলে দিতে কোনো আপত্তি নেই! কিন্তু এখন বোহেমন্ড মুক্তি পাওয়ায় কিলিজ আরসালান বড় ক্রুদ্ধ। কারণ, তিনি যে বিনিময়-মূল্যের কোনো অংশই লাভ করেননি!

ক্রুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ কিলিজ আরসালান এবার গাজি কুমুশতেগিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এশিয়া মাইনর অঞ্চলের মুসলমানদের মাঝে আবারও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের আগুন জ্বলে ওঠে। বরং কিলিজ আরসালান তৎকালীন আব্বাসি খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহ ও সেলজুক সুলতান বারকিয়ারুকের কাছে বার্তা পাঠিয়ে গাজির বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা কামনা করেন। অথচ রাজনৈতিকভাবে কিলিজ আরসালান তাদের দুজনের ক্ষমতার অস্তিত্বই স্বীকার করতেন না। কিন্তু এখন রাজনীতির খেলায় তিনি সম্ভাব্য সবগুলো তাসই ব্যবহার করতে চাচ্ছেন![৬২৮]

কিলিজ আরসালান ও গাজি কুমুশতেগিনের মধ্যকার সংঘাত পরিস্থিতি যদিও এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য দুর্যোগের কারণ ছিল, তবে বোহেমন্ডের মুক্তিলাভের ঘটনা ছিল তার চেয়েও অধিক দুর্যোগপূর্ণ বিষয়। বোহেমন্ড এন্টিয়কে ফিরতেই এন্টিয়কবাসী তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানায়।[৬২৯] ইবনুল আছির বলেন, 'তার আগমনে এন্টিয়কবাসীর মনোবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে।'[৬৩০] এর পরপরই তিন বছরের অধিক সময় মুসলমানদের হাতে বন্দি থাকা বোহেমন্ড নবোদ্যমে প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

---

৬২৭. Runciman: op. cit., 11, p. 39.
৬২৮. Albert d' Aix, p. 613-614.
৬২৯. Runciman: op. cit., 11, p. 39.
৬৩০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৫৬।

প্রথমেই তিনি আলেপ্পোর অধীনস্থ বিভিন্ন জনপদে হামলা চালান। বোহেমন্ড প্রথমে কিননাসরিন নগরীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার অধিবাসীদের ওপর জিজিয়া আরোপ করেন।[৬৩১] এরপর তিনি আলেপ্পোর উত্তরে কুয়েক নদীর (The Queiq) তীরে বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেন। যারা প্রাণে বেঁচে যায়, তাদের ওপর তিনি বিশাল অঙ্কের জিজিয়া আরোপ করেন। এমনকি তিনি আলেপ্পো নগরীর ওপরও অর্থ ও অশ্বের জিজিয়া আরোপ করেন এবং সেখানে বিদ্যমান সকল বন্দি ক্রুসেডারকে মুক্তি দিতে বাধ্য করেন।[৬৩২]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল মুসলমানদের ওপর আপতিত চরম দুর্যোগ। এটি ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্যোগ; বরং এ সবকিছুর পূর্বে ধর্মীয় ও চারিত্রিক দুর্যোগ এবং ঘৃণ্য ও গর্হিত বিচ্ছিন্নতার সংকট; পরবর্তী কয়েক বছর যার দুর্ভোগ উম্মাহকে পোহাতে হয়।

আর এ সবকিছুর বিনিময় মূল্য?!

এক লক্ষ দিনার ও ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়কের সঙ্গে মিত্রতা!

এ জাতীয় ঘটনা নিয়ে আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি এবং এ জাতীয় পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে হয়তো আমরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারব যে, মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য, সম্পদ-প্রাচুর্য ও সুরক্ষিত নিরাপত্তাব্যবস্থা সত্ত্বেও কীভাবে ক্রুসেডাররা বিভিন্ন ইসলামি নগরী দখল করে নিয়েছিল।

> “নিঃসন্দেহে আমরা কখনোই শত্রুদের শক্তির কারণে পরাজিত হই না; আমরা পরাজিত হই নিজেদের দুর্বলতার কারণে এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে নিজেদের দূরবর্তিতার কারণে।”

সুন্নাতুল্লাহ তো শাশ্বত ও চিরন্তন! আল্লাহর রীতিতে কোনো বৈষম্য ও অসংগতি নেই!

* * *

৬৩১. প্রাগুক্ত, ৯/৫৬।

৬৩২. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৪৭ ও Runciman: op. cit., 11, p. 39.

একাদশ পরিচ্ছেদ

উত্তর ইরাকের দিগন্তে আলোর উদ্ভাস!

পূর্বের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, তৎকালে শাম ও এশিয়া মাইনর উভয় ইসলামি ভূখণ্ডেই চলছিল চরম প্রান্তিক সংকট। অঞ্চলদুটির বিভিন্ন জনপদে শেকড় গেড়ে বসেছিল ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। আমরা দেখেছি যে, সমকালীন মুসলিম সমাজ ছিল কঠিন পরাভবতায় আচ্ছন্ন এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও অধিকার রক্ষার বিষয়ে চরম শিথিলতার শিকার। এমনকি ৪৯৪ হিজরি সনে (১১০১ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানরা যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরপর তিনটি যুদ্ধে বিজয় লাভ করে, তখনও এ অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের এই নেতিবাচক মনোবৃত্তি থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। পেছনে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, সেই বিজয়কালেই এশিয়া মাইনর অঞ্চলের সমকালীন দুই শক্তিশালী মুসলিম নেতা কিলিজ আরসালান ও গাজি বিন দানিশমান্দ কেবল পারস্পরিক বিরোধই নয়; সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

শামের পরিস্থিতি তো এশিয়া মাইনর অঞ্চলের চেয়েও শোচনীয় ছিল। তৎকালীন শামবাসী মুসলমানদের মাঝে আমরা প্রতিরোধ-লড়াই বা প্রতিরক্ষাপ্রচেষ্টা—কোনো ধরনের কর্মতৎপরতাই লক্ষ করিনি। বরং আমরা দেখেছি, শামের মুসলমানরা নির্লজ্জভাবে নতি স্বীকার করে নিজেদের ভূখণ্ড ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হৃদ্যতা ও মিত্রতার সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছে। অথচ শাম অঞ্চলে ক্রুসেডাররা আক্ষরিক অর্থেই গণহত্যা চালিয়েছিল, যার নির্মম শিকার হয়েছিল লক্ষ মুসলিম সন্তান; বরং আরও বেশি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—কালের পরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ কি কখনো এমন বন্ধ্যত্বের শিকার হয় যে, উম্মাহর যাপিত জীবনের অঙ্গনে

তখন থাকে না কল্যাণের ছিটেফোঁটা, নেতৃত্বের আসনে থাকে না স্রষ্টার ভয়ে প্রকম্পিত হৃদয়ের অধিকারী কোনো মুসলিহ ও সংস্কারক?!

উত্তর হলো—না। সন্দেহাতীতভাবেই দাবি করা যায় যে, এমনটি কখনোই হতে পারে না!

এই নিশ্চিত দাবির উৎস কেবল ঐতিহাসিক বাস্তবতা হতে অর্জিত গবেষণা-ফল বা দালিলিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসার নিছক আশাবাদ নয়; বরং এটি একটি সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি; যা আমাদের প্রদান করেছেন স্বয়ং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذٰلِكَ»

> আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হক ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) এসে পড়বে আর তারা তেমনই থাকবে।[৬৩৩]

অতএব, মুসলিম উম্মাহ কখনোই কল্যাণশূন্য হবে না। প্রভাব ও নেতৃত্ব মুসলিম জাতির সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে থাকবে। সর্বদাই উম্মাহর কিছু সদস্যের বুকে বিজয়ের চেতনা জাগ্রত থাকবে। তারা ন্যায়ের ঝান্ডা বহন করে মর্যাদা ও বীরত্বের পথে আহ্বান করবে, শরিয়তের দাবি আঁকড়ে ধরে জিহাদ ও সংগ্রামকে ভালোবেসে যাবে। সর্বদাই জাতির কতিপয় সন্তান আল্লাহর জমিনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা সংরক্ষণ ও সত্যের প্রদীপ প্রজ্বলিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। মুসলিম উম্মাহর জীবনে কখনোই এমন কোনো কাল অতিবাহিত হবে না, যখন বীরত্ব ও সাহসিকতার ধারা বিলীন হয়ে যাবে কিংবা চাপা পড়ে যাবে। ক্ষণে ক্ষণে হয়তো দুর্বলতা দেখা দেবে, তবে যুগে যুগে সর্বযুগে উম্মাহর বীর শার্দূলেরা ছিল, আছে এবং থাকবে।

---

৬৩৩. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৮৮১, ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৯২০ ও ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদিস নং ৬।

ক্রুসেড আগ্রাসনের ঘটনাপ্রবাহে দৃষ্টি বোলালে গবেষক ও বিশ্লেষক তো বটেই, একজন সাধারণ পাঠকের চোখেও একটি বিষয় ধরা পড়বে।

আর তা হলো, এ সময়ের প্রতিটি জিহাদি আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টার উৎস ছিল ইরাকের উত্তরাঞ্চল! আমরা সেই সময়ের কথা বলছি, যখন শাম, মিশর ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে জিহাদ ও সংস্কার প্রচেষ্টার ধারা অনেকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক এ বাস্তবতা সত্য হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—এ সত্যের পেছনের রহস্য কী?!

পেছনের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ক্রুসেড আগ্রাসনের একেবারে গোড়ার দিকে ৪৯০ হিজরি সনে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) অবরুদ্ধ এন্টিয়কবাসীকে ক্রুসেডার বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করতে মসুলের প্রশাসক কারবুগা বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, এন্টিয়ক গমনের পথে তিনি এডেসা নগরীও অবরোধ করেছিলেন এবং নগরীটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। এরপর তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাম অঞ্চলের বিভিন্ন নগরীর প্রশাসকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টাও করেছিলেন। ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে আমরা এ-ও জেনেছি যে, তৎকালীন শামের প্রশাসক ও রাজন্যবর্গ কারণে-অকারণে তাকে নিরাশ করে একা ফেলে চলে গিয়েছিল। আর তাই তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার অভিযান সফলতার মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তারপরও ব্যাপকতর বিবেচনায় তখন কারবুগাই ছিলেন একমাত্র মুসলিম নেতা, যিনি আগ্রাসী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আগামীর আলোচনায় আমরা দেখব, আরও অনেকেই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা বহন করবেন। বরং কারবুগা যে মসুল থেকে আগমন করেছিলেন, সেই মসুল থেকেই সংগ্রামী পতাকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতো মহান ব্যক্তিবর্গ, যাদের পরিচয় ও কীর্তি আলোচনারও ঊর্ধ্বে।

কেন কেবল উত্তর ইরাক থেকে?!

এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একের পর এক সংগ্রামী ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ কেন এই একটি অঞ্চল থেকেই হলো? কেন ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ড জন্ম দিতে পারল না একজন ইমাদুদ্দিন জিনকি কিংবা একজন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি?!

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে এবং এর নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে একটু পেছনে, জানতে হবে এ অঞ্চলের নিকট অতীতের ইতিহাস, অধ্যয়ন করতে হবে এ অঞ্চলের ও অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাসের পার্থক্যের দিকটি। তাহলেই আমরা এসব সংগ্রামী আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টার শেকড় ও উৎসমূল সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারব এবং পেয়ে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর।

আমরা যদি হিজরি ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ ক্রুসেড আগ্রাসনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব যে, সে সময়ই বরং আরও নির্দিষ্ট করে বললে ৪৪৭ হিজরি সনে (১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) সুন্নি সেলজুক নেতা তুগরল বেগ বাগদাদে প্রবেশ করে আব্বাসি খিলাফতকে শিয়া বুওয়াইহি পরিবারের স্বেচ্ছাচারী শাসন থেকে উদ্ধার করেন।[৬৩৪] ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের বর্ণনামতে সুলতান তুগরল বেগ ছিলেন সহনশীল, বিচক্ষণ ও অত্যুচ্চ ধৈর্যশক্তির অধিকারী। ইবনুল আছির তার সম্পর্কে আরও বলেছেন, 'তিনি নামাজ আদায়ে যত্নশীল ছিলেন এবং নিয়মিত সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।'[৬৩৫]

তুগরল বেগের ইন্তেকালের পর সেলজুক সালতানাতের হাল ধরেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ইতিহাসখ্যাত অনন্যসাধারণ ইসলামি সেনাপতি আলপ আরসালান। আলপ আরসালান সেই মহান সুলতানের নাম, যিনি জগৎজুড়ে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পৃথিবীকে সমৃদ্ধ

---

[৬৩৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩২২-৩২৩ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/৬৬।

[৬৩৫]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩৬২।

করেছিলেন দয়া ও প্রজ্ঞায়, জ্ঞান ও অনুকম্পায় এবং জিহাদ ও সংগ্রাম চর্চায়। ইবনুল আছির তাকে ভূষিত করেছেন নিম্নোক্ত অভিধায়—

> তিনি ছিলেন গুণী ও উদার, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ। পরনিন্দা-কানকথা মোটেও শুনতে পারতেন না। তার শাসনামলে সেলজুক সাম্রাজ্যের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং দিগন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তার বশীভূত হয়। তাকে প্রদত্ত 'সুলতানুল আলম' বা জগতের সুলতান অভিধা ছিল সত্যিই তার শানে যথোপযুক্ত। মহৎ হৃদয় এই সুলতান দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করতেন, আল্লাহর দরবারে প্রচুর দোয়া করতেন। সৈন্যরা যেন জনসাধারণের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে, এ বিষয়ে তিনি কঠোর নজরদারি করতেন।[৬৩৬]

হ্যাঁ, এমন মহান এক সুলতান তখন শাসন করতেন ইসলামি ভূখণ্ড। সুলতান আলপ আরসালানের শাসনব্যবস্থা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল পারস্য ও ইরাক অঞ্চলজুড়ে। পুরো সালতানাতে তার ন্যায় ও অনুগ্রহ পরিব্যাপ্ত ছিল। ৪৬৩ হিজরি সনে (১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে) মানজিকার্টের যুদ্ধে তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এমন চমকপ্রদ ও ঐতিহাসিক এক বিজয় অর্জন করেন, যার কীর্তি আলোচনায় আজকের পৃথিবীও সবাক-মুখর।[৬৩৭] নিঃসন্দেহে তার সেই অমর কীর্তি তার রাজ্যের জনগণের হৃদয়জগতে এক অবিস্মরণীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল এবং তাদেরকে চিনিয়েছিল আল্লাহর পথে জিহাদের মূল্য ও প্রভাব।

সমকালীন ইরাক ও পারস্য অঞ্চলের জনগণ যে কেবল সুলতান আলপ আরসালানের সযত্ন তত্ত্বাবধান লাভ করেছিল, তা-ই নয়; আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দান করেছিলেন ইসলামি ইতিহাসের এক মহান উজিরের সাহচর্য-কল্যাণ। তিনি ছিলেন ন্যায় ও সততার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী একজন সৎ সহচর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন—

৬৩৬. প্রাগুক্ত, ৮/৩৯৪।
৬৩৭. প্রাগুক্ত, ৮/৩৮৮-৩৮৯।

«مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَه بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُه بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّه عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُه بِالشَّرِّ وَتَحُضُّه عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ»

খলিফা পদে যিনিই অধিষ্ঠিত হন, তার দু ধরনের সহচর থাকে। এক দল তাকে সৎকর্মের পরামর্শ দেয়, সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অপর দল তাকে মন্দ কাজের পরামর্শ দেয়, মন্দের প্রতি প্ররোচিত করে। আর নিরাপদ সে-ই থাকে, আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন।[৬৩৮]

মহান সেই উজির হলেন নিজামুল মুলক তুসি। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলিমে দ্বীন। উজির নিজামুল মুলক শরিয়ত ও সুন্নাহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন, জনগণকে জিহাদ ও আত্মোৎসর্গের প্রতি উৎসাহ জোগাতেন। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল-অবিচল, জনসাধারণের প্রতি উদার ও দয়ার্দ্র। প্রতিটি উত্তম চরিত্রগুণের তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট নমুনা। জ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার প্রতি তার ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ সুগভীর অনুরাগ। সুলতান আলপ আরসালান যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নিজামুল মুলক-ই ছিলেন তার প্রধান উজির। ৪৬৫ হিজরি সনে (১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে) আলপ আরসালানের ইন্তেকালের পর তার পুত্র মালিকশাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন আর নিজামুল মুলক যথারীতি তার উজির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মালিকশাহর শাসনামলে সেলজুক সাম্রাজ্য পূর্বে চীন ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও শাম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। পিতার মতো সুলতান মালিকশাহও ছিলেন জ্ঞান-অনুরাগী। তিনিও আলিমসমাজ ও জ্ঞানী-গুণীদের মর্যাদার চোখে দেখতেন। সুলতান মালিকশাহ মহান উজির নিজামুল মুলকের যথার্থ মূল্যায়ন করতেন। এমনকি দায়িত্ব গ্রহণকালে তিনি নিজামুল মুলককে বলেছিলেন, 'আমি রাজ্যের ছোট-বড় সার্বিক বিষয়ের দায়িত্ব আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম। (পিতার অবর্তমানে) এখন তো আপনিই আমার পিতা।'[৬৩৯]

৬৩৮. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬২৩৭, ইমাম নাসায়ি, *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, হাদিস নং ৪২০১, ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭২৩৮ ও তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস নং ৪৬১২।

৬৩৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩৬৯।

নিজামুল মুলক তুসি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে এমন এক অসাধারণ খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছিলেন, যাকে তার কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি বিবেচনা করা হয়। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনেকগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তার প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো 'নিজামিয়া মাদরাসা' নামে খ্যাতি লাভ করে। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে প্রতিটি মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ও আবাসনের সুলভ ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ভাতাও প্রদান করা হতো। উজির নিজামুল মুলক মাদরাসাগুলোতে অধ্যাপনার জন্য ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও বিদ্বানদের খুঁজে নিয়ে আসতেন। হাদিস, ফিকহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের খ্যাতনামা আলিমগণ নিজামিয়া মাদরাসাসমূহে শিক্ষাদান করতেন।[৬৪০] তৎকালে ইসলামি ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ফিতনারূপে ছড়িয়ে পড়া শিয়া মতাদর্শ ও বাতিনি চিন্তাধারার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধে এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সে সময় শিয়াশাসিত প্রধান দুটি অঞ্চল ছিল মিশর ও শাম।

ক্রুসেড আগ্রাসন শুরু হওয়ার মাত্র ছয় বছর পূর্বে ৪৮৫ হিজরি সনে (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে) উজির নিজামুল মুলক জনৈক শিয়া ইসমাইলি বাতিনি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।[৬৪১] এর মাসখানেক পরেই ইন্তেকাল করেন সুলতান মালিকশাহ।[৬৪২] আমাদের বিশ্বাস—এই দুই কীর্তিমান পুরুষ যদি ক্রুসেড অভিযানের সময় জীবিত থাকতেন, তাহলে কিছুতেই ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালানোর সুযোগ দিতেন না। কিন্তু তাকদিরের ফয়সালাই তো চূড়ান্ত! আল্লাহ যা চান, তাই-ই হয়। মহান আল্লাহ উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম এই দুই মহান ব্যক্তিকে আপন বিস্তৃত রহমতে আচ্ছাদিত রাখুন।

---

৬৪০. প্রাগুক্ত, ৮/৪৮০-৪৮১।

৬৪১. প্রাগুক্ত, ৮/৪৭৮।

৬৪২. প্রাগুক্ত, ৮/৪৮১-৪৮২।
নিজামুল মুলক উনত্রিশ বছর উজিরের দায়িত্ব পালন করার পর ৪৮৫ হিজরি সনের ১০ রমজান (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর) নিহত হন। এর পয়ত্রিশ দিন পর একই বছরের ১৫ শাওয়াল (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর) ইন্তেকাল করেন সুলতান মালিকশাহ। [অনুবাদক]

কিন্তু রাব্বে কারিমের শাশ্বত নীতির দাবি হলো, পৃথিবী থেকে এ জাতীয় মহান ব্যক্তিগণ বিদায় নিলেও তাদের কীর্তি ও কর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হয় না। এই দুই মহান ব্যক্তি তাদের শাসিত ভূখণ্ডে রেখে গিয়েছিলেন দ্বীনের প্রতি অনুরাগ ও শরিয়তের প্রতি ভালোবাসার এক বহমান ধারা। তাদের শাসনকালে যেসব সমুন্নত চেতনা জনমানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় হলো ইলম ও জ্ঞানের অনুরাগ এবং জিহাদ ও সংগ্রামের চেতনা। আর বাস্তবতা হলো, যেকোনো জাতির মর্যাদা ও উন্নতি জ্ঞানানুরাগ ও সংগ্রামী চেতনা ধারণের মাঝেই নিহিত এবং যেকোনো জাতির লাঞ্ছনা ও অধঃপতন এই দুই গুণ পরিত্যাগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। জ্ঞান ও সংগ্রামের চেতনা অতি দ্রুত বিলীন হয়ে যায় না; চেতনার আহ্বায়ক বিদায় নেওয়ার পরও থেকে যায় কালের পরিক্রমায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

এই ছিল ইতিহাসে 'বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্য' নামে খ্যাত পারস্য, ইরাক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের পরিস্থিতি। মালিকশাহর মৃত্যুর পর বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তার পুত্র বারকিয়ারুক।[৬৪৩] সুলতান বারকিয়ারুক উদার, সহনশীল, জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল ছিলেন। অবশ্য যোগ্যতা ও কর্মগুণে তিনি তার মহান পিতা ও পিতামহের স্তরের ছিলেন না। তার শাসনামলে সেলজুক সাম্রাজ্যে নানাবিধ অস্থিরতা ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তার আমলেই ক্রুসেডার বাহিনী ইসলামি ভূখণ্ডে আগ্রাসন শুরু করে। এ সময় নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরে অব্যাহত বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সুলতান বারকিয়ারুক ক্রুসেডারদের আগ্রাসন থেকে এন্টিয়ক ভূমিকে রক্ষার জন্য মসুলের আমির কারবুগাকে প্রেরণ করতে সামান্য দ্বিধা করেননি। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

সামগ্রিকভাবে এটি ছিল সুবিস্তৃত বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সাধারণ পরিস্থিতি। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের পরিবর্তে বিশেষ করে উত্তর ইরাক থেকে অধিকাংশ জিহাদি তৎপরতা ও সংস্কার আন্দোলনের উৎপত্তির কারণ হলো, বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের এই অংশটিই ছিল শাম ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলের সবচেয়ে নিকটবর্তী অংশ। যেমন এডেসার অবস্থান ছিল

---

৬৪৩. প্রাগুক্ত, ৮/৪৮৬।

মসুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে। আর তাই ক্রুসেড আগ্রাসনে আক্রান্ত অঞ্চলসমূহে সংগ্রামী যোদ্ধা ও জ্ঞানী আলিমদের প্রেরণের দায়িত্ব ইরাকের উত্তরাঞ্চল নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিল। অপরদিকে পারস্যসহ বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল ইসলামি বিশ্বের পূর্ব অংশে তুর্কিস্তান ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন পৌত্তলিক গোষ্ঠীর বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দমনে।

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, উত্তর ইরাকের সাধারণ জনগণও প্রশংসনীয় কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। তারা আলিমসমাজের মূল্যায়ন করত, শরিয়তের আলোকে শাসকের মান বিচার করত। এ কারণেই কোনো শাসক দ্বীন ও শরিয়তের সহায়তা করলে তারা তার পাশে দাঁড়াত আর যে শাসক অন্যায়-অবিচার করত, লঙ্ঘন করত শরিয়তের সুনির্ধারিত সীমা, তারা তার প্রতিরোধ করত।

আদি বিন মুসাফির

উত্তর ইরাকের জনসমাজে আলিমদের মূল্যায়ন ও প্রভাব কেমন ছিল, তার নমুনা হিসেবে আমরা এখানে একজন মহান আলিমের কথা উল্লেখ করছি। আমাদের নির্বাচিত সেই মহান আলিম হলেন আদি বিন মুসাফির রহ.।

বর্তমান সময়ের অনেক মুসলমান হয়তো তার নামই শোনেনি; কিন্তু তিনি ছিলেন তৎকালীন অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিম। আদি বিন মুসাফির ক্রুসেড অভিযানের সূচনাকাল পেয়েছিলেন। তিনি উত্তর ইরাকে হাকার পাহাড়ের নিকটে কুর্দি শাখাগোত্র হাকারিয়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় বাস করতেন।[৬৪৪] ইবনে তাইমিয়া রহ. তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান পুরুষ। তার অনুসারীরাও ছিল সৎ ও পুণ্যবান।'[৬৪৫] আবদুল কাদির জিলানি রহ. তো তার সম্পর্কে বড় আশ্চর্য মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সাধনার মাধ্যমে যদি নবুওয়ত লাভ করা যেত, তাহলে আদি বিন মুসাফির-ই তা লাভ করতেন।'[৬৪৬]

---

[৬৪৪]. প্রাগুক্ত, ৯/৪৫৯।
[৬৪৫]. ইবনে তাইমিয়া, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ১১/১০৩।
[৬৪৬]. আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৫/৩৪৪।

শাইখ আদি বিন মুসাফির একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেখানে জনসাধারণকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করতেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছির বলেছেন, 'তার যুহদ ও নির্মোহতা, ন্যায় ও সততা এবং হিদায়াতের পথে ইখলাছ ও নিষ্ঠার গুণ প্রত্যক্ষ করে আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তার কাছে ছুটে আসত।' আরেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেছেন, 'আদি বিন মুসাফিরের সুখ্যাতি দিগন্তজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রচুর।'[৬৪৭] ইমাম যাহাবি রহ. বলেছেন, 'তার দ্বীনি দাওয়াত উক্ত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। কুর্দি জাতিগোষ্ঠীর অসৎ ও দুষ্ট শ্রেণির লোকেরা তার দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে তাওবা করে এবং সৎ পথে ফিরে আসে।'[৬৪৮]

এটি তৎকালীন উত্তর ইরাকীয় জনগণের আলিমদের মূল্যায়ন ও শরিয়তের মর্যাদা অনুধাবনের একটি নমুনামাত্র। সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও তাদের এই চেতনাবোধ প্রতিফলিত হতো। যে শাসক বা সেনাপতি দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করতেন এবং কর্মক্ষেত্রে শরিয়তের দাবি বাস্তবায়ন করতেন, তিনি জনসমাজে বরণীয়-মাননীয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করতেন। আর যে এর ব্যতিক্রম করত, সমাজে সে ঘৃণিত ও নিন্দিত হতো; সকলেই তাকে প্রথম সুযোগে অপসারণ বা সরিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকত।

জনসাধারণ যদি হয় এমন অত্যুচ্চ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাহলে তাদের কাছ থেকে তো সমূহ কল্যাণ প্রত্যাশা করাই যায়।

এ অঞ্চলে সেলজুকদের অত্যুজ্জ্বল কীর্তি ও অবদান কক্ষনোই উপেক্ষা করা যাবে না। তদ্রূপ এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, সেলজুকদের পাশাপাশি আরও কিছু জনগোষ্ঠী ইরাক অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর চেতনা সংরক্ষণে সেলজুকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে উরতুক পরিবার ও কুর্দি জনগোষ্ঠীর কথা।

---

[৬৪৭]. ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, ৩/২৫৪।

[৬৪৮]. ইমাম যাহাবি, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২০/৩৪২।

উরতুক-পরিবার ও কুর্দি জনগোষ্ঠী

উরতুক পরিবার দ্বারা উরতুক তুর্কমানির বংশধরগণ উদ্দেশ্য। সেলজুকদের মতো উরতুক তুর্কমানিও তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন মহান সেলজুক সুলতান মালিকশাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা। সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর সবশেষে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের গভর্নর পদে দায়িত্ব পালন করেন।[৬৪৯] উরতুক তুর্কমানি ৪৮৪ হিজরি সনে (১০৯১ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।[৬৫০] এরপর অল্প কিছুদিন তার দুই পুত্র সুকমান ও ইলগাজি বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর ৪৯১ হিজরি সনে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দিরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নিলে সুকমান ও ইলগাজি বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করে উত্তরে চলে আসেন। ইলগাজি বাগদাদে পৌঁছে সেলজুক সুলতান বারকিয়ারুকের সেবায় নিয়োজিত হন আর সুকমান উত্তর ইরাকের দিয়ারে বকর অঞ্চলে পৌঁছে সেখানে সেলজুক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। (বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত) মারদিন ও হাসানকেইফ ছিল রাজ্যটির গুরুত্বপূর্ণ দুই নগরী।[৬৫১]

উরতুক-পুত্র সুকমান ও ইলগাজির কর্মধারায় ইসলামি চেতনাবোধ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ছিল। একই কথা প্রযোজ্য তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র বাল্‌ক (Balk) বিন বাহরামের ক্ষেত্রেও। আগ্রাসী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের প্রত্যেকেরই ছিল বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। আগামীর ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহে আমরা এর বিভিন্ন নমুনা প্রত্যক্ষ করব, ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে কুর্দিরা হলো ইসলামের অন্যতম মহান জাতি। প্রবল ধারণামতে, কুর্দি জাতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-Europeans)

---

৬৪৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৪৩।
৬৫০. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২ /১৭০।
৬৫১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯।

জাতিগোষ্ঠী হতে উদ্ভূত। খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার সনের পূর্বে তারা উত্তর ইরাক, দক্ষিণ তুরস্ক ও পূর্ব ইরানে এসে বসতি স্থাপন করে।[৬৫২]

কুর্দি জাতির ইসলামগ্রহণের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। ২১ হিজরি সন শুরু হওয়ার পূর্বেই অধিকাংশ কুর্দি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। যুগে যুগে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নানারকম পালাবদল ও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হলেও কুর্দিরা ইসলামগ্রহণের পর থেকে সর্বদাই ধর্মের দাবি ও দ্বীনের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছে এবং ইসলামের সহায়তায় অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছে। নিজেদের ইতিহাসে সব সময়ই তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতাদর্শ আঁকড়ে ধরে ছিল। মাজহাবগত দিক থেকে অধিকাংশ কুর্দি ছিল শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারী। এমনকি হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে শিয়া বুওয়াইহি গোষ্ঠী যখন আব্বাসি খিলাফতের ওপর চেপে বসেছিল, তখনও কুর্দিরা নিজেদের মৌলিক সুন্নি মতাদর্শ ও মজবুত ধর্মীয় চেতনায় অটল-অবিচল ছিল। আর তাই তাদের অঞ্চল থেকে যদি আল্লাহর দ্বীনের সহায়তায় কোনো মহান কর্ম সম্পাদিত হয়, যদি তাদের মাঝ থেকেই বেরিয়ে আসে একজন নাজমুদ্দিন আইয়ুব, আসাদুদ্দিন শিরকুহ, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন, তাহলে তাতে মোটেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

বলতে গেলে, এই ছিল তৎকালীন উত্তর ইরাকের সার্বিক পরিস্থিতি। এ আলোচনার মাধ্যমে আশা করি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কেন সে যুগের বিভিন্ন জিহাদি তৎপরতা ও সংস্কার আন্দোলনের সূচনা এ অঞ্চল থেকেই হয়েছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, আমাদের পেছনের আলোচনায় যেসব ব্যক্তি ও গোত্রের নাম এসেছে, তারা সকলেই বংশমূলের বিচারে ছিলেন অনারব। বরং পুরো ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে যারা সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পরিবর্তন সূচিত করেছেন, তাদের মধ্যে আরব পরিচয়ধারী ব্যক্তির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এ কথা বলার উদ্দেশ্য আরবদের মর্যাদাহানি নয়; বরং এটিই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। অধিকন্তু এটি ইসলামের অনন্য মর্যাদারও একটি

---

৬৫২. দেখুন: আহমাদ তাজুদ্দিন, *আল-আকরাদ : তারীখু শা'বিন ওয়া ক্বাযিয়্যাতু ওয়াতানিন*, পৃষ্ঠা : ১৫।

স্বীকৃতি। ইসলাম এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও গোত্র-বর্ণের মানুষকে অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ করতে পেরেছে। আর তাই সেলজুক, উরতুক ও কুর্দিদের ন্যায় অনারবি বংশপরিচয়ধারীরাও দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসে ইসলামের ঝান্ডা বহন করেছে এবং দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করেছে। তাদের যেন মনেও ছিল না যে, উম্মাহর নবী ছিলেন আরব বংশীয় এবং সে যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অনারব হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের দায়িত্ব ছিল আরবদের কাছে। বরং আমাদের বর্তমান কালেও মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনারব। বর্তমানে মুসলমানদের মোট সংখ্যার মাত্র পঁচিশ শতাংশ আরব। মূলত ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর ইন্তেকালের পর হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকাল শুরু হলে যখন পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকে নিয়ে সব সময়ই উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনারবই ছিল। আর তাই এ তথ্যে মোটেও আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ইসলামি ইতিহাসের অধিকাংশ সংগ্রামী নেতা ও মহান সংস্কারক ছিলেন অনারব। তারিক বিন যিয়াদ, আলপ আরসালান, ইউসুফ বিন তাশফিন, ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন মাহমুদ, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সাইফুদ্দিন কুতুজ, মুহাম্মদ আল-ফাতিহ—এভাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেক নামই উল্লেখ করা যেতে পারে, যাদের কেউই আরব নন।

একই কথা প্রযোজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও ইসলামি শরিয়তসংশ্লিষ্ট শাস্ত্রীয় অঙ্গনসমূহের ক্ষেত্রেও। প্রতিটি ক্ষেত্র অনারব কীর্তিমানদের উজ্জ্বল কর্মগৌরবে আলোকিত। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হতে পারে প্রসিদ্ধ হাদিস সংকলকগণের বংশ-পরিচয়। হাদিসশাস্ত্রে যে ছয়জন ইমাম 'উম্মাহাতুল হাদিস' বা 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে খ্যাত ছয়টি গ্রন্থের সংকলক হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাদের পাঁচজনই যদি অনারব হয়ে থাকেন, তাতে কি বিস্ময়ের কিছু আছে?! বুখারি রহ., মুসলিম রহ., তিরমিজি রহ., নাসায়ি রহ. ও ইবনে মাজা রহ.—এই পাঁচ অনারব ইমামের সঙ্গে একমাত্র আরব প্রতিনিধি হিসেবে আছেন আবু দাউদ রহ.!

নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম সুস্পষ্ট দলিল। ইসলাম যে পৃথিবীজুড়ে বসবাসকারী রক্তে-বর্ণে শতধা বিভক্ত মানবশ্রেণির বিচার-বুদ্ধি, আবেগ-বিবেক ও সম্মিলন-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা

রাখে, এটি তার অনন্য প্রমাণ। হায়! সেই ইসলামের সন্তানরা যদি কোনো দিন কোনো কালে দ্বীনি চেতনার ওপর জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রাধান্য দেয় এবং আকিদা ও ধর্মের উপাদানের পরিবর্তে বংশ ও রক্তপরিচয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে তা কতই-না পরিতাপের বিষয়!

ক্রুসেডারদের আগ্রাসন চলাকালে এই ছিল উত্তর ইরাকের পরিস্থিতি!

জানা দরকার, যে শাম অঞ্চল সরাসরি ক্রুসেডারদের হিংস্র থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল, তার পরিস্থিতি কেমন ছিল?!

অত্যাচারীদের পরিণতি

মিশরের ন্যায় শাম অঞ্চলও ৩৫৯ হিজরি সন (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) থেকেই উবায়দিদের নোংরা দখলদারিত্বের শিকার ছিল। পূর্ণ এক শতাব্দীরও অধিক সময় পর ৪৭৭ হিজরি সনে (১০৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) সেলজুকরা শাম অঞ্চল থেকে উবায়দিদের বিতাড়িত করে। মিশরে অবশ্য শিয়া উবায়দিরা এরপরও ক্ষমতা ধরে রেখেছিল আরও এক শতাব্দী। ৫৬৭ হিজরি সনে (১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে) মিশরে উবায়দি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। এই দীর্ঘ সময়ে উবায়দিরা অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে সুন্নি আলিমশূন্য করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এবং বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে সমাজে বিদআত-কুসংস্কার ছড়িয়ে দেয়। উবায়দি প্রশাসনের কর্মপন্থায় জিহাদ ও সংগ্রামের কোনো স্থান তো ছিলই না; তারা মুজাহিদদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট ছিল। উবায়দিরা মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তেও দ্বিধা করত না। ক্রুসেডারদের সঙ্গে তাদের গৃহীত নীতি ও সমঝোতার প্রচেষ্টা সম্পর্কে পেছনে আমরা কিছুটা ধারণাও পেয়েছি।

এই অবসাদগ্রস্ত এবং দ্বীনি শিক্ষা ও চেতনাশূন্য পরিবেশে বসবাসকারী জনগণের মাঝ থেকে এমন নতজানু ও নমনীয় জনশ্রেণি বের হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী, যাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নেই! শাম ও মিশরে এমন কোনো আলিমকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়নি, যিনি জনসাধারণকে সঠিক পথের দিশা দেবেন; এমন কোনো মুজাহিদের অস্তিত্ব রাখা হয়নি, যিনি সকলের আদর্শ বিবেচিত হবেন। এই শূন্যতা এক বছর বা দু-বছরের নয়; শাম পূর্ণ এক শতাব্দী আর মিশর দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে এই দুর্যোগ ও শূন্যতার শিকার ছিল। আর তাই এ অঞ্চলের জনগণ

মুসলমানদের কোনো ইস্যুতে স্পন্দিত হবে এবং করণীয় দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে, এমনটি মোটেও প্রত্যাশিত ছিল না। এমনকি নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ লঙ্ঘিত হলেও তাদের নীরব-নির্বিকার থাকারই কথা ছিল! ক্রুসেড আগ্রাসনে তো অন্যদের নয়; তাদের নিজেদের সম্পদই লুণ্ঠিত হচ্ছিল, নিজেদের বাড়িঘরই ধ্বংস হচ্ছিল, আপন ভাই, সন্তান ও পরিবারের রক্তেই জমিন রঞ্জিত হচ্ছিল!

আরও পরিতাপের বিষয়—শেষ পর্যন্ত যিনি শাম অঞ্চলকে উবায়দিদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, ধর্মপরিচয়ে সুন্নি হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি ছিলেন উবায়দিদের মতোই সাক্ষাৎ জালিম!

উবায়দিরা বিতাড়িত হওয়ার পর শামে সেলজুক রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন তুতুশ বিন আলপ আরসালান। স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন তার মহান পিতা আলপ আরসালান ও ভাই মালিকশাহর সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতা-পুত্রের এই ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈপরীত্য উপলব্ধির জন্য আমাদের সামনে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নুহ আ. ও নুহ-পুত্রের আলোচনা।

তুতুশ ছিলেন অত্যাচারী-স্বেচ্ছাচারী একজন শাসক। ক্ষমতা নিষ্কণ্টক রাখাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতেন না, নিজের মতের বিপরীত কারও পরামর্শ সহ্য করতে পারতেন না। তার কাছে জনসাধারণের জান-মালের কোনো মূল্যই ছিল না, ছিল না আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস বা বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কোনো আবেদন। এভাবে তিনি সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং একেকবার একেকজনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন। এমনকি ভাই মালিকশাহর মৃত্যুর পর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুকের সঙ্গে সংঘাত ও যুদ্ধে জড়াতেও সামান্য দ্বিধা করেননি। এ সবকিছুর কারণ আর কিছুই নয়—সাম্রাজ্যবাদী চেতনা ও সম্পদ বৃদ্ধির লালসা।

অনাচার-অবিচারে নিমজ্জিত এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠা জনগণ যে হীনম্মন্য, নতজানু ও দলিত মানসিকতা লালন করবে, চাবুকের ইশারায় পরিচালিত হবে, অম্লান বদনে ইজ্জত-সম্মানের ওপর আঘাত মেনে নেবে এবং অধিকার লুণ্ঠিত হলেও তুষ্ট চিত্তে বসে থাকবে, এমনটাই তো স্বাভাবিক। আর তাই তৎকালীন শাম অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে

ক্রুসেডাররা তুতুশ বা উবায়দিদের চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন কিছু ছিল না। বরং তাদের অনেকে তো এক মুঠো খাবার বা যৎসামান্য অর্থ ও ভূমির লোভে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ও করেছিল।

৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) তুতুশ নিহত হওয়ার পরও শামের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তুতুশের শাম-রাজ্য এরপর বিভক্ত হয়ে পড়ে তার দুই পুত্র রিজওয়ান ও দাক্কাকের মাঝে। রিজওয়ানের ভাগে আলেপ্পো আর দাক্কাকের ভাগে দামেশক। স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে দুই ভাই ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। আর তাই তাদের শাসন ছিল কেবল শাসিত অঞ্চলের জনগণের জন্য নয়; পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্যই এক চরম দুর্যোগ।

অত্যাচারী স্বভাবের পাশাপাশি রিজওয়ানের চরিত্রে উবায়দি অনাচারও যুক্ত হয়েছিল। রিজওয়ান শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ করে কুখ্যাত ইসমাইলি-বাতিনি গোষ্ঠীকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং জনমনে ত্রাস সৃষ্টি ও ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার লক্ষ্যে তাদেরকে যথেচ্ছা অন্যায়-অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করেছিলেন। এখনো পর্যন্ত যে ইতিহাস আমরা বর্ণনা করে এসেছি, তাতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, শিয়া বাতিনি ফিরকার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় বড় বড় দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রথমে তারা ৪৮৫ হিজরি সনে মহান উজির নিজামুল মুলক তুসিকে হত্যা করে; এরপর ৪৯৫ হিজরি সনে সরাসরি রিজওয়ানের প্ররোচনায় হত্যা করে রিজওয়ানের সৎ পিতা হুসাইন বিন মালাইবকে।

পরিচ্ছেদের শুরু থেকে যে বিশ্লেষণ আমরা পেশ করলাম, তাতে আমাদের সামনে এই আশাবাদই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগামী দিন ও বছরগুলোতে উত্তর ইরাক থেকেই কোনো সংস্কারমূলক জিহাদি তৎপরতা সূচিত হবে; বিপরীতে নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার মাঝে বেড়ে ওঠা দ্বীন ও শরিয়তবিমুখ শামের জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ দুর্বল হবে। হ্যাঁ, অন্যের হাত ধরে পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে যখন জনসাধারণের মনোভাবেও পরিবর্তন শুরু হবে, আশা করা যায় যে, তখন শাম অঞ্চলেও এমন এক প্রজন্ম তৈরি হবে, যাদের হাত ধরে যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতার অবসান ঘটবে।

এক মহিমান্বিত বিজয়

এ তো গেল অতীতের আলোকে আগামীর আশাবাদের গল্প! বাস্তব ইতিহাস আমাদের জন্য কী তথ্য সংরক্ষণ করেছে?! বাস্তবতা তো অতীতের ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে। আর তাই ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই যে, অতীতের মহান পুরুষগণ উত্তর ইরাকে কল্যাণের যে বীজ রোপণ করে গিয়েছিলেন, ৪৯৬ হিজরি সনেই (১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে) তা ডালপালা মেলে বেড়ে উঠতে শুরু করে। শুরু হয় ক্রুসেডারদের প্রতিরোধের লক্ষ্যে এক জিহাদি আন্দোলন।

আসুন, আবারও ফিরে যাই ইতিহাসের ধারাবর্ণনায়!

এ সময় মসুলের শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন জাকারমিশ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মসুলের সাবেক প্রশাসক কারবুগার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট বিরোধ-বিশৃঙ্খলার মাঝে একসময় তিনি শাসনক্ষমতা লাভ করেন।[৬৫৩] জাকারমিশ ছিলেন সুস্পষ্ট ধর্মীয় চেতনার অধিকারী ন্যায় ও উদার একজন নেতা। প্রজা-আচরণনীতি সম্পর্কেও তার বাস্তবানুগ জ্ঞান ছিল। এ কারণেই মসুলের জনগণ তাকে পছন্দ করে শাসক হিসেবে বরণ করে নেয়। অবশ্য জাকারমিশের স্বাধীন ক্ষমতার প্রতি ঝোঁক ছিল। বিশেষত সেলজুক সুলতান বারকিয়ারুক ও তার ভাই সুলতান মুহাম্মাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও অব্যাহত সংঘাতের কারণে জাকারমিশের মনে মসুলকেন্দ্রিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। অবশ্য বাহ্যিকভাবে তিনি সুলতান বারকিয়ারুকের প্রতি আনুগত্য ও মিত্রতা বজায় রেখে চলছিলেন।[৬৫৪]

কারবুগার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে মসুলে যেমন প্রশাসনিক অস্থিরতা চলছিল, ঠিক একই সময় হাররান নগরীতেও তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক সংকট। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাররান নগরীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাররান ছিল ক্রুসেড রাজ্য এডেসা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তা ছাড়া নগরীটির অবস্থান ছিল আলেপ্পো থেকে আনুমানিক দুইশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং মসুল থেকে সমদূরত্বে বা সামান্য অধিক দূরত্বে উত্তর-পশ্চিমে। অধিকন্তু শামের সঙ্গে ইরাকের সংযোগপথ

---

৬৫৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৫৫।

৬৫৪. প্রাগুক্ত, ৯/৭৮-৭৯।

বরং আরও নির্দিষ্ট করে বললে আলেপ্পোর সঙ্গে মসুলের সংযোগপথের ওপর নগরীটির নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটিতেই মসুলের মতো একই ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন শাসককে হত্যা করা হয় এবং ক্ষমতার পালাবদলে শেষ পর্যন্ত প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন 'জাওলি' নামক জনৈক তুর্কি আমির।[৬৫৫]

মসুল ও হাররানের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রতি ক্রুসেডারদের নজর ছিল। তারা একে কাজে লাগিয়ে নগরীদুটি দখলের এবং এর মাধ্যমে উত্তরের দুই ক্রুসেড রাজ্য এডেসা ও এন্টিয়কের বিভিন্ন স্বার্থ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়।[৬৫৬]

ক্রুসেড রাজ্য এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ তার সহকারী তিল-বাশির (Turbessel) (নগরীটি এডেসা রাজ্যের অংশ ছিল) নগরীর প্রশাসক জোসেলিন ডি কার্টেনি (Joscelin de Courtenay)-কে সঙ্গে নিয়ে এন্টিয়কের শাসক বোহেমন্ড এবং তার ভাগ্নে ও প্রধান সহযোগী টেনক্রেডের সঙ্গে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, সকলে মিলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি যৌথ সামরিক অভিযান পরিচালনা করবেন। আর তা হলো (বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত) হাররান নগরীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এটি হবে অভিযানের প্রথম অংশ। পরবর্তী পর্যায়ে তারা একেবারে মসুল নগরী দখলের চেষ্টা চালাবেন।[৬৫৭]

অভিযান সফল হলে ক্রুসেডারদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জিত হবে।

১. এর মাধ্যমে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ ও উর্বর ভূমির জন্য প্রসিদ্ধ হাররান নগরীর পতন ঘটাতে পারবে।

২. তারা ইরাক ও শামের পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে। তখন ইরাক থেকে সেলজুকদের প্রেরিত কোনো ধরনের

---

[৬৫৫]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ১০২। হাররানের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৯৮ ও আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৫/১৯১।

[৬৫৬]. Setton: op. cit., 1389.

[৬৫৭]. Guillaume de Tyr, 1, P. 389.

সামরিক সহায়তা শামের ক্রুসেডার অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছতে পারবে না।[৬৫৮]

৩. হাররান বিজয়ের মধ্য দিয়ে মসুল দখলের পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। আগেই বলা হয়েছে যে, মসুল ছিল জিহাদি আন্দোলনের উর্বর ভূমি, মসুলে ছিল অনুকূল ইসলামি পরিবেশ। আর তাই পরিকল্পনামতো মসুলের পতন ঘটাতে পারলে এ অঞ্চলের মুসলমানদের নিক্ষেপ করা যাবে পতনের গভীর খাদে।

৪. মসুল দখল করতে পারলে খিলাফতের রাজধানী ও ইসলামি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদও ক্রুসেডারদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর বাগদাদের পতন ঘটাতে পারলে তো নিঃসন্দেহে পুরো ইসলামি বিশ্বকেই প্রকম্পিত করে তোলা যাবে। তখন তো পুরো ইসলামি বিশ্বই চলে আসবে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে!

৫. এন্টিয়ক শাসক বোহেমন্ডের একান্ত একটি স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। আর তা হলো হাররান দখল করতে পারলে আলেপ্পো পূর্ব দিক থেকে এন্টিয়ক ও পশ্চিম দিক থেকে হাররানের মাঝে আটকা পড়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে আলেপ্পোর পতন ঘটানোও সহজ হবে। আর তখন বর্তমান ক্ষুদ্র এন্টিয়ক রাজ্যের পরিবর্তে বোহেমন্ডের নেতৃত্বে শামের উত্তরাঞ্চলে গড়ে উঠবে সুবিশাল ক্রুসেড সাম্রাজ্য।[৬৫৯]

এসব সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের বিবেচনায় হাররানের পতন ক্রুসেডারদের অতি আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নে পরিণত হয়। আর তাই এ অঞ্চলের সকল ক্রুসেডার সেনাপতির সমন্বয়ে প্রস্তুত হয় এক বিরাট বাহিনী। বল্ডউইন, জোসেলিন, বোহেমন্ড ও টেনক্রেডের সঙ্গে আরও যোগ দেয় এডেসা ও এন্টিয়কের গির্জার নেতৃবৃন্দ। সবমিলিয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় বিশ হাজার।

ক্রুসেডারদের এই পরিকল্পনা ছিল সামগ্রিক বিচারে অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশেষত এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দুই ইসলামি নগরী মসুল ও হাররান সদ্যই অস্থির সময় পাড়ি দিয়ে এসেছিল। এদিকে মসুলের শাসক জাকারমিশ ও (হাররানের পূর্বে অবস্থিত) হাসানকেইফের শাসক সুকমান বিন উরতুকের

---

৬৫৮. Elisseeff: op. cit., p. 296.

৬৫৯. Runciman: op. cit., 11, p. 44.

মধ্যকার সম্পর্ক ছিল বেশ বিরোধপূর্ণ। কদিন পূর্বে মসুলের ক্ষমতা নিয়ে জাকারমিশ যখন মুসা তুর্কমানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তখন সুকমান সরাসরি মুসার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

ক্রুসেডাররা এই অভিযানের জন্য মুসলমানদের অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ সময়কেই বেছে নিয়েছিল। চলমান পরিস্থিতিতে বাহ্যত মনে হচ্ছিল যে, তাদের বিজয় অতি সন্নিকটে! কিন্তু এ সময়ই এমন এক ঘটনা সংঘটিত হয়, যা এই অস্থিরতাপূর্ণ সময়ে ক্রুসেডারদের কল্পনাতেও ছিল না। এর ফলে এ অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য অনেকটা বদলে যায়। দুই মুসলিম নেতা জাকারমিশ ও সুকমান বিন উরতুক প্রায় কাছাকাছি সময়ে পত্রবিনিময় করেন এবং উভয় নেতা তার মুসলিম ভাইকে পারস্পরিক অতীত বিভেদ ভুলে গিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যৌথ সহযোগিতা বিনিময়ের আহ্বান জানান। নিঃসন্দেহে এমন সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের এই ঐক্য ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা। তবে এর চেয়েও চমকপ্রদ বিষয় হলো—এই ঐক্য যুদ্ধজয়, রাজ্যবিস্তৃতি বা সম্পদবৃদ্ধির ন্যায় পার্থিব কোনো স্বার্থে ছিল না; উভয় নেতার সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী এ ঐক্য ছিল কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে!

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির বর্ণনা করেছেন, উভয় নেতাই অপরজনের কাছে প্রেরিত বার্তায় বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব লাভের আশায় নিজেকে এ বিষয়ে নিবেদিত করেছি।'[৬৬০]

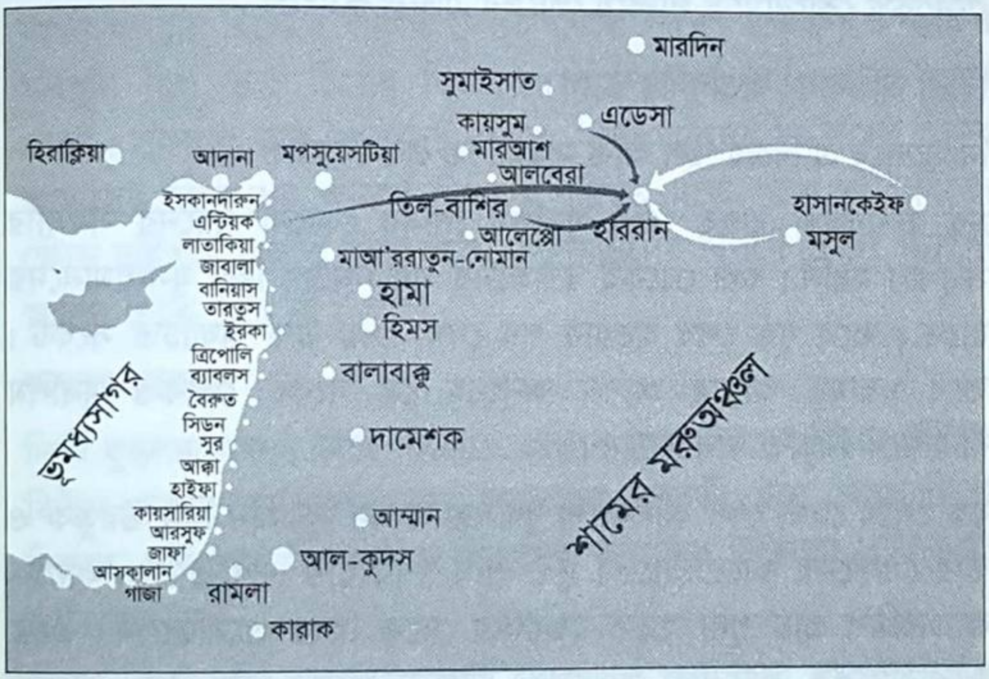
ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথমবার আমরা দেখছি, জিহাদের পতাকা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে উত্তোলিত হয়েছে। হ্যাঁ, সময় ছিল দুর্যোগপূর্ণ, মুসলমানদের হৃদয়জগৎ ছিল বিশৃঙ্খল, মেধা ও মননে ছিল অস্থিরতা, ক্ষমতা ও রাজত্বের লালসা ছিল ব্যাপক-বিস্তৃত, ব্যক্তিস্বার্থের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু আল্লাহর শোকর, তখনও কিছু হৃদয়ে কল্যাণ অবশিষ্ট ছিল; তখনও এমন কিছু মানুষের অস্তিত্ব ছিল, যারা কেবল আল্লাহর লক্ষ্যে কাজ করে যায়। আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো, উভয় নেতা একই সময়ে একে অপরের কাছে পত্র প্রেরণ করেছেন। স্পষ্টতই অনুমিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনের এবং উম্মাহর কল্যাণ কামনা করছেন।

---

৬৬০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৩।

বিশাল ক্রুসেডার বাহিনী হাররানের কাছে পৌঁছে কঠিন অবরোধ আরোপ করে। মসুল ও হাসানকেইফের ইসলামি শক্তির সম্মিলন সম্পর্কে তাদের জানা ছিল না। আর তাই ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বাহিনী যখন ক্রুসেডার বাহিনীর দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়, তখন তারা বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। যৌথ মুসলিম বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার। জাকারমিশের নেতৃত্বে তিন হাজার আরব, সেলজুক ও কুর্দি সৈন্য আর সুকমান বিন উরতুকের নেতৃত্বে সাত হাজার তুর্কমেন সৈন্য।[৬৬১]

১১০৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে বালিখ নদীর তীরে মুসলিম ও ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে সংঘটিত হয় এক রক্তক্ষয়ী লড়াই।[৬৬২] ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'হাররানের যুদ্ধ' বা 'বালিখের যুদ্ধ' নামে খ্যাত।



মানচিত্র নং-২১

হাররানের (বালিখের) যুদ্ধ

বল্ডউইন ও জোসেলিন নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে লড়াই করেন। কারণ, যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল অনেকটা তাদের রাজ্যসীমাতেই। অপরদিকে

---

৬৬১. প্রাগুক্ত, ৯/৭৩।

৬৬২. বালিখ রাক্কা অঞ্চলের একটি নদী। রাক্কা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল বয়ে চলার পর নদীটি সেই দুর্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে, যা মাসলামা বিন আবদুল মালিক নির্মাণ করেছিলেন। *মুজামুল বুলদান*, ১/৪৯৩।

বোহেমন্ড ইতিপূর্বে একবার বন্দি হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভাগ্নে টেনক্রেডকে সঙ্গে নিয়ে বাহিনীর পেছনের দিকে অবস্থান গ্রহণ করেন। তার দায়িত্ব ছিল বাহিনীর পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পালানোর পথ খোলা রেখে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।[৬৬৩]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অল্প সময় অতিবাহিত হতেই নিরঙ্কুশ বিজয় মুসলিম বাহিনীর পদচুম্বন করে। ক্রুসেডার বাহিনীর বারো হাজারের অধিক সৈন্য নিহত হয়,[৬৬৪] বন্দি হয় দুই ক্রুসেডার সেনাপতি বল্ডউইন ও জোসেলিন! বন্দি হয় আরও অনেক ক্রুসেডার সৈন্য। মুসলিম বাহিনী লাভ করে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। অপর দুই সেনাপতি বোহেমন্ড ও টেনক্রেড কোনোমতে পালিয়ে পৌঁছেন এন্টিয়কে।[৬৬৫]

বিরল অভিযান! অভাবনীয় ত্যাগ!

নিঃসন্দেহে এ বিজয় ছিল অতি মহিমান্বিত এক বিজয়!

যুদ্ধ চলাকালে বাস্তব অর্থে মুসলিম শিবির কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। শুরু থেকেই রণাঙ্গনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল মুসলমানদের হাতে। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা দেয় এক অযাচিত সংকট। তবে দয়াময় আল্লাহ আপন অনুগ্রহে সে সংকট থেকেও মুসলিম বাহিনীকে নিষ্কৃতি দান করেন।

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল অধিকাংশ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সুকমান বিন উরতুক ও তার সৈন্যদের কাছে আছে। দুই দামি 'শিকার'ও ছিল তাদের কাছে। জাকারমিশ প্রায় শূন্য হাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছিলেন। এতে জাকারমিশের বাহিনীর সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের সেনাপতি জাকারমিশকে তার অংশ নিয়ে আসতে প্ররোচিত করে। সাধারণ সৈন্যদের পীড়াপীড়িতে জাকারমিশ একসময় প্রভাবিত হন; তার সৈন্যরা এবার ছুটে যায় তুর্কমেন শিবিরে। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারে যে, সুকমান তার কিছু সৈন্যকে নিয়ে ক্রুসেডারদের তাড়া

---

৬৬৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৩।
৬৬৪. প্রাগুক্ত, ৯/৭৪।
৬৬৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৩, ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৩২ ও Setton: op. cit., 1,p. 389.

করতে বেরিয়েছেন। জাকারমিশের সৈন্যরা বন্দিদের তাঁবুতে প্রবেশ করে দামি শিকার এডেসার শাসক বল্ডউইনকে পেয়ে যায় এবং তাকে নিয়ে নিজেদের শিবিরে ফিরে আসে!

এরই নাম পার্থিব মোহ! যে যুগে মানুষের বোধ ও চিন্তার জগৎ হাজারো দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন ছিল, সে যুগে সেনাপতি ও যোদ্ধাদের অন্তর্জগতে পার্থিব মোহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সুকমান বিন উরতুক ফিরে এসে সবকিছু জানতে পারেন। তার সৈন্যরা তাকে জাকারমিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে বল্ডউইনকে ফিরিয়ে আনার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু সুকমান রহ. আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এমন এক অবস্থান গ্রহণ করেন, যাকে তার জীবনের সবচেয়ে মহান অবস্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তার এ অবস্থান ছিল তার চিত্তের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুকমান তার সৈন্যদের বলেন, 'মুসলমানদের যুদ্ধজয়ের আনন্দ আমাদের বিরোধের কারণে বিষাদে পরিণত হতে পারে না। নিজের ক্ষোভ চরিতার্থ করতে গিয়ে আমি মুসলমানদের বিপদে ফেলে শত্রুদের আনন্দ দিতে পারি না।'[৬৬৬]

আল্লাহু আকবার!

তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে মুসলমানদের বিজয়-সৌভাগ্য বিলীন করতে চাচ্ছিলেন না, আবেগের বশবর্তী হয়ে জাকারমিশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শত্রুদের আনন্দের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন না।

এরই নাম নিষ্ঠা ও নির্মোহতা, যার পেছনে অপেক্ষা করে আল্লাহর নুসরত ও বিজয়-গৌরব!

এই নিষ্ঠাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেই সুকমান থেমে থাকেননি; বরং তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয়কে কাজে লাগিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ক্রুসেড সেনাদের ফেলে যাওয়া যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ-পোশাকগুলো সংগ্রহ করেন এবং শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সেগুলো নিজের সৈন্যদের পরিধান করতে বলেন। এরপর তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে ক্রুসেডারদের

---

৬৬৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৯/৭৩-৭৪।

অধিকৃত বিভিন্ন দুর্গে অভিযান চালান। দুর্গগুলোর অভ্যন্তরে অবস্থানরত ক্রুসেডাররা সুকমানের বাহিনীকে নিজেদের লোক ভেবে দুর্গদ্বার খুলে দেয়। ফলে মুসলিম সৈন্যরা অতি সহজে দুর্গগুলোতে প্রবেশ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এভাবে এ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসে।[৬৬৭]

অপরদিকে জাকারমিশ তার বাহিনী নিয়ে হাররানে পৌঁছার পর নগরীটির কর্তৃত্ব বুঝে নেন এবং হাররানকে মসুল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর তিনিও থেমে না থেকে তার স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই ক্রুসেড রাজ্য এডেসা অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানতেন যে, এই সীমিত জনবল নিয়ে সুরক্ষিত এডেসা রাজ্য জয় করা সম্ভব নয়।[৬৬৮] মূলত তার এই পদক্ষেপ ছিল এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক লড়াই, যা বালিখের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণকারী ক্রুসেডারদের মনোবল আরও বেশি দুর্বল করে দিতে বড় ভূমিকা রাখে।[৬৬৯]

বালিখের যুদ্ধের প্রভাবসমূহ

সামরিক দৃষ্টিকোণ ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বালিখের যুদ্ধ যদিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো যুদ্ধ ছিল না; কিন্তু ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ চলমান সংঘাতে এই যুদ্ধ অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বরং বাহ্যত সাধারণ এই যুদ্ধকে বিবেচনা করা যেতে পারে চলমান ঘটনাপ্রবাহের এক উজ্জ্বল টার্নিং পয়েন্ট ও বাঁক পরিবর্তন হিসেবে। ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে সামান্য বিরতি নিয়ে এখানে আমরা সংক্ষেপে বালিখের যুদ্ধের দশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ও ফলাফল উল্লেখ করছি।

১. মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করে। এ বিজয়ের প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদের মানসজুড়ে বিদ্যমান থাকে। প্রতিপক্ষের বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা নিহত হয়েছে, বন্দিও হয়েছে প্রচুর ক্রুসেড সেনা—কেবল এ কারণেই যে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল এমন নয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট; তারা উপলব্ধি করতে

[৬৬৭]. প্রাগুক্ত, ৯/৭৪।
[৬৬৮]. প্রাগুক্ত, ৯/৭৪।
[৬৬৯]. Runciman: op. cit., 11, p. 44.

পেরেছিল বিজয়ের মূলমন্ত্র কী এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রভাব কত সমুন্নত; তারা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছিল আল্লাহর নির্দেশিত পথে অবিচল বান্দাদের প্রতি রাব্বে কারিমের নুসরত ও অনুগ্রহ।

২. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ যুদ্ধ একদিকে যেমন মুসলমানদের মাঝে লক্ষণীয় মাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে, বিপরীত দিকে অবশ্যই ক্রুসেডারদের মাঝে আরও বেশি পরিমাণে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বালিখের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ক্রুসেডাররা মানসিকভাবেও পরাজিত হয়ে পড়ে এবং চরম ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই পরাভবতা ও ব্যর্থতার গ্লানি তাদেরকে যেমন ছেয়ে গিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সংক্রমিত হয়েছিল তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও। বরং এ দাবি করলেও অত্যুক্তি হবে না যে, এ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণেই ইরাক ও পারস্য নিয়ে ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। এটিই ছিল এ অঞ্চলে ক্রুসেডারদের প্রথম ও শেষ অভিযান পরিকল্পনা। আর তাই আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ এই যুদ্ধই ক্রুসেডারদের স্বপ্ন ও লালসার সীমানা বেঁধে দিয়েছিল।[৬৭০]

৩. ক্রুসেডাররা এ যুদ্ধে বারো হাজারের অধিক সৈন্য হারায়। নিঃসন্দেহে এটি তাদের সামরিক শক্তিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষত এর মাত্র তিন বছর পূর্বে ৪৯৪ হিজরি সনে (১১০১ খ্রিষ্টাব্দে) নবাগত ক্রুসেডার বাহিনীগুলো মর্মন্তুদ পরিণতি বরণের কারণে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা ইসলামি ভূখণ্ডে নতুন করে বাহিনী প্রেরণের সাহস একদমই হারিয়ে ফেলেছিল। আর তাই বালিখের যুদ্ধে আশঙ্কাজনক হারে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস এন্টিয়ক ও এডেসা রাজ্যের সামরিক পরিকল্পনায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

৪. বালিখের যুদ্ধে ক্রুসেড রাজ্য এডেসার ক্ষতি ছিল আরও বেশি। তারা তো কেবল বিপুল সংখ্যক যোদ্ধাই হারায়নি, হারিয়েছে শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ ও তার অন্যতম প্রধান সহযোগী জোসেলিন ডি কার্টেনিকেও! বল্ডউইন ও জোসেলিন এখন শত্রুদের হাতে বন্দি।

---

৬৭০. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ৬৪।

কেউ জানে না—কবে তারা মুক্তি পাবেন। অধিকন্তু দুজন বন্দি দুই জায়গায়; বল্ডউইন মসুলের শাসক জাকারমিশের কবজায়, আর জোসেলিন হাসানকেইফ ও মারদিনের অধিপতি সুকমানের হাতে।[৬৭১] নেতা ও তার প্রধান সহকারীর অনুপস্থিতিতে এডেসার ক্রুসেড যোদ্ধারা এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছিল না, যে আপাতত এডেসা রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে। অগত্যা তারা নরম্যান সেনাপতি টেনক্রেডকে তাদের নেতাদ্বয় ফিরে আসা পর্যন্ত এডেসা রাজ্যের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানায়।[৬৭২] স্বভাবতই সুযোগসন্ধানী টেনক্রেডের জন্য এ প্রস্তাব ছিল নিজের লালসা বাস্তবায়নের অপূর্ব সুযোগ। এভাবেই টেনক্রেড শাম অঞ্চলে সেই ভাঁড়ের ন্যায় কাজ করতে থাকেন, যাকে কেবল সংকটকালে অভিনয়ের জন্য ডাকা হয়। কখনো তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অভ্যন্তরে জালিল অঞ্চলের প্রশাসক, কখনো বোহেমন্ডের অনুপস্থিতিতে এন্টিয়কের অন্তর্বর্তীকালীন শাসক, আর এখন বল্ডউইন ডি বুর্গের অনুপস্থিতিতে এডেসার ভারপ্রাপ্ত শাসক!

৫. এই পরাজয়ের পরপরই ক্রুসেডাররা বেশ কয়েকটি দুর্গের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে; হারিয়ে ফেলে উল্লেখযোগ্য কিছু নগর-জনপদ ও ভূখণ্ডের কর্তৃত্বও। এর ফলে এ অঞ্চলের মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের পরপরই সুকমান বিন উরতুক অতর্কিত হামলা চালিয়ে যেসব দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিলেন, তার সবগুলোই ছিল এডেসা রাজ্যভুক্ত। তবে বিষয়টি কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এ অঞ্চলের আরেক ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়কও এ সময় হারিয়েছিল বেশ কয়েকটি বড় বড় জনপদ ও দুর্গের নিয়ন্ত্রণ।

এর বিবরণ হলো, আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ান বিন তুতুশ বালিখের যুদ্ধে জোটবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার চিন্তা না করে নিজের বাহিনী নিয়ে ফুরাত নদীর তীরে অবস্থান করে ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখছিলেন। তিনি যখন জানতে পারেন—যুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনী পরাজিত হয়েছে, তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত

---

৬৭১. Setton: op. cit., 1, p. 389.

৬৭২. Archer: op. cit., p. 616.

হয়েছে, বোহেমন্ড ও টেনক্রেড পালাতে পারলেও বল্ডউইন ও জোসেলিন বন্দি হয়েছেন এবং এরপর বল্ডউইনের অনুপস্থিতিতে এডেসার শাসনভার গ্রহণ করতে টেনক্রেড এডেসায় চলে গেছেন, তখন তিনি এন্টিয়কের অধিভুক্ত বিভিন্ন দুর্গ ও জনপদে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। এসব অঞ্চল ইতিপূর্বে আলেপ্পো রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। অল্প কদিনেই তিনি মাআ'ররাতু-মিসরিন (Ma'arrat Misrin) ও সারমিন (Sarmin)-সহ আলেপ্পোর নিকটবর্তী কয়েকটি নগরী ও দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। একই সময় এ অঞ্চলের আরেকটি ইসলামি রাজ্য রাফিনার আমির শামসুল-খাওয়াছ শাইজার নগরীর পূর্বে অবস্থিত সুরান (Suran) নগরী পুনরুদ্ধার করেন। এ ছাড়া মাআ'ররাতুন-নোমান, বারা, কাফারতাব (Kafartab) ও লাতমিন (Latmin) অঞ্চলে অবস্থানরত ক্রুসেডার বাহিনীর বিভিন্ন অংশ এ সময় এন্টিয়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এন্টিয়কে চলে আসে। ফলে ক্রুসেডাররা এসব নগরীর নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেলে। এভাবে এন্টিয়ক রাজ্যের পূর্ব সীমানা অনেকটা সংকুচিত হয়ে যায়। এতদিন রাজ্যটির পূর্ব সীমানা ছিল আলেপ্পোর উচ্চভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত, এখন তা আমিক হ্রদ পর্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে।[৬৭৩]

৬. এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের জন্য ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী যোগাযোগব্যবস্থা উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। ফলে পরবর্তী কালে মসুল ও তৎপার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এডেসা ও এন্টিয়কসহ অধিকৃত বিভিন্ন এলাকায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ সহজ হয়।

৭. বালিখের যুদ্ধের কারণে এ অঞ্চলের কৌশলগত পরিস্থিতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুদ্ধের পরই এ অঞ্চলে বসবাসকারী আর্মেনীয়রা প্রথমবারের মতো কার্যকর পন্থায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধাচরণের সাহস দেখায়। ক্রুসেডারদের আগমনের পর থেকেই তাদের হাতে বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হলেও আর্মেনীয়দের এতদিন প্রতিবাদের শক্তি ছিল না। এবার ক্রুসেডাররা পরাজিত হওয়ার পর আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিভিন্ন দুর্গ ও

---

৬৭৩. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৪৯।

নগরীর অধিবাসীরা মুসলিম তুর্কিদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে তাদেরকে দুর্গ ও নগরীগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায়। এর মাধ্যমে তারা অত্যাচারী খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের শাসনাধীনে বসবাস করতে চাচ্ছিল। এর অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে আরতাহ দুর্গের ঘটনা। এন্টিয়কের একেবারে সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় দুর্গটির কৌশলগত অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরতাহ দুর্গের আর্মেনীয় নাগরিকরা নরম্যান ক্রুসেডার প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কোনো ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়াই দুর্গটির নিয়ন্ত্রণ আলেপ্পো-অধিপতি রিজওয়ানের হাতে তুলে দেয়। এটিই এ ধরনের ঘটনার একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। একই ধরনের ঘটনা অন্যান্য দুর্গের ক্ষেত্রেও ঘটে।[৬৭৪]

৮. বালিখের যুদ্ধের ফলে এডেসায় ক্রুসেডারদের শাসন-ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যান্য এলাকার আর্মেনীয়দের মতো এডেসার আর্মেনীয় নাগরিকরাও ক্রুসেডার প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এমনকি একপর্যায়ে তারাও সেলজুকদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করতে থাকে। একে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে ক্রুসেডার শাসকশ্রেণির বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এ পরিস্থিতি ছিল নিকট ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের পূর্বাভাস। আশা করা যায় যে, তৎকালীন সমৃদ্ধতম ইসলামি অঞ্চল উত্তর ইরাকের নিকটবর্তী এডেসা রাজ্যের এই পট পরিবর্তন রাজ্যটির ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখবে এবং উত্তর ইরাকের উদ্যমী মুসলিম সন্তানদের নিজেদের দায়িত্ব ও করণীয় নিয়ে ভাবতে উদ্দীপ্ত করবে।

৯. বালিখ-যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কেবল মুসলমানরা নবোদ্যমে অধিকৃত বিভিন্ন ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিল, এমন নয়। ক্রুসেডারদের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ যখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পৌঁছে যায়, তখন ঝানু সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসও পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বাইজান্টাইন সম্রাট তৎক্ষণাৎ দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ

---

৬৭৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫০ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

করেন। তিনি স্থলপথে কিলিকিয়া অঞ্চলে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। বাহিনীটি অতি সহজে তারসুস, আদানা ও মপসুয়েসটিয়াসহ কিলিকিয়া অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নগরীগুলোকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।[৬৭৫] দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বাইজান্টাইন সম্রাট সমুদ্রপথে বাইজান্টাইন নৌবহর প্রেরণ করেন। নৌবহরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লাতাকিয়া নৌবন্দর পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।[৬৭৬] এ ছাড়াও তারা মারকাব (Marqab) দুর্গসহ লাতাকিয়া ও তারতুসের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।[৬৭৭]

১০. বালিখের যুদ্ধে ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে এন্টিয়কের শাসক বোহেমন্ড এমন কয়েকটি কঠিন আঘাতের শিকার হন, যা তার শক্তির ভারসাম্য পুরোপুরি শেষ করে দেয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় অবশেষে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন!

বোহেমন্ডের পতন

বালিখের যুদ্ধে বোহেমন্ড তার বাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হারান। এরপর তিনি হারান এন্টিয়কের উত্তরে অবস্থিত কয়েকটি দুর্গ, নগরী ও জনপদের নিয়ন্ত্রণ। তার প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে এ সময় অতি দুর্বল শাসক রিজওয়ান বিন তুতুশও তার রাজত্বের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালান। এর পরপরই তিনি বাইজান্টাইনদের ক্রমাগত আঘাতের শিকার হন; হাতছাড়া হয়ে যায় পুরো কিলিকিয়া অঞ্চল, হাতছাড়া হয় লাতাকিয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকা। এভাবে একের পর এক সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির শিকার হওয়ায় এ অঞ্চলে বোহেমন্ডের প্রভাব ও মূল্যায়ন বহুগুণে হ্রাস পায়। এতে প্রভাবিত হয়ে বোহেমন্ড এমন এক চারিত্রিক স্খলনের শিকার হন, যার কারণে ক্রুসেডারদের কাছে তার সুখ্যাতি ধুলোয় মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়!

বোহেমন্ডের কাছে মসুলের মুসলিম বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একজন সেলজুক আমির বন্দি ছিল। এ সময় মসুলের শাসক জাকারমিশ বন্দি মুসলিম

---

৬৭৫. Raoul de Cean, p. 712.
৬৭৬. Stevenson: op. cit, pp.79.
৬৭৭. Grousset: Hist des Croisades, 1, p. 410.

আমিরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বোহেমন্ডকে অনুরোধ জানান এবং বিনিময় হিসেবে দুটি প্রস্তাব দেন—১. জাকারমিশ মুসলিম আমিরের মুক্তির পরিবর্তে এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গকে মুক্তি দেবেন। ২. অথবা মুক্তিপণ হিসেবে বোহেমন্ডকে পনেরো হাজার দিনার প্রদান করবেন। বোহেমন্ডের কাছ থেকে এমনটি মোটেও প্রত্যাশিত ছিল না যে, তিনি বল্ডউইনকে মুক্ত করার পরিবর্তে অর্থপ্রাপ্তিকে প্রাধান্য দেবেন। তা ছাড়া এ সময় তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ও বল্ডউইন ডি বুর্গের চাচাতো ভাই ১ম বল্ডউইনের কাছ থেকে একটি পত্র লাভ করেন। পত্রে ১ম বল্ডউইন তাকে বল্ডউইন ডি বুর্গকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ তথ্যটিও প্রণিধানযোগ্য যে, স্বয়ং বোহেমন্ড যখন গাজি বিন দানিশমান্দের কাছে বন্দি ছিলেন, তখন এই বল্ডউইন ডি বুর্গই তাকে উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থায় চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমনকি বোহেমন্ডকে ছাড়িয়ে আনতে এক লক্ষ দিনারের বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ প্রদান করার সময় বল্ডউইন ডি বুর্গ বড় অঙ্কের অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। এখন বন্দি সেলজুক আমিরকে মুক্তিদানের বিনিময়ে বোহেমন্ডকে যে অঙ্ক প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে সে অঙ্ক ছিল কয়েকগুণ বেশি। এই সকল দিকের বিবেচনায় বোহেমন্ডের কাছ থেকে এই সিদ্ধান্তই নিশ্চিত প্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি অর্থগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাবেই রাজি হবেন। কিন্তু সবাইকে হতভম্ব করে বোহেমন্ড বল্ডউইনকে মুক্ত করার পরিবর্তে অর্থের বিনিময়ে বন্দি সেলজুক আমিরকে ছেড়ে দেন! বোহেমন্ডের এই চরম চারিত্রিক হীনতা ও দীনতার কারণে বল্ডউইন ডি বুর্গকে এরপরও বেশ কয়েক বছর বন্দিজীবন কাটাতে হয়।[৬৭৮]

বোহেমন্ডের এমন নিকৃষ্টতর আচরণে ক্রুসেড রাজ্যগুলোতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় ওঠে। একের পর এক বিপদের পর এবার ক্রুসেডার সমাজ হতে বিচ্ছিন্নতা, শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং খোদ এন্টিয়ক রাজ্যের অভ্যন্তরে দ্রুত সংকুচিত পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় বোহেমন্ড এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন পুরো ময়দান ছেড়ে দিয়ে ইউরোপে চলে যাবেন! এই চলে যাওয়া মানে

---

৬৭৮. Runciman: op. cit., 11, p. 45.

ইসলামি প্রাচ্য অঞ্চলে নিজের রাজত্ব ছেড়ে একেবারে চলে যাওয়া নয়। বোহেমন্ড তো এত সহজে নতি স্বীকার করার লোক নন। তিনি চাচ্ছিলেন ফ্রান্স ও ইতালিতে গিয়ে সেখানে সকলকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবেন। বোহেমন্ড উপলব্ধি করেছিলেন যে, রিজওয়ান বিন তুতুশ ভয় পাওয়ার মতো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নন; প্রয়োজনের সময় সহজেই তার দফারফা করা যাবে। তার রাজ্যের প্রকৃত হুমকি আসলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য।[৬৭৯] আর বাস্তবতার বিচারে তার এই উপলব্ধি মোটেও অমূলক ছিল না। অবশেষে বালিখের যুদ্ধের কিছুদিন পর বোহেমন্ড টেনক্রেডকে এন্টিয়কের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজে ইউরোপে চলে যান। টেনক্রেড এবার পরিণত হন এন্টিয়ক ও এডেসা দুই রাজ্যের একক শাসনকর্তায়।[৬৮০]

এভাবেই চরম হিংস্র ও দুর্বিনীত ক্রুসেডার সেনাপতি বোহেমন্ড চলমান সংঘাতের ক্ষেত্র ছেড়ে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যান।

বোহেমন্ডের ইউরোপকাহিনির সংক্ষিপ্ত বিবরণও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাহলে ইতিহাসের এমন উত্তপ্ত একটি অধ্যায় আমাদের অগোচরে থাকবে না। বোহেমন্ড ফ্রান্স ও ইতালিতে গিয়ে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও সৈন্যসমাবেশে সক্ষম হন। তিনি সকলকে এখনই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের লালসার লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেন। তিনি সকলকে বোঝান যে, বাইজান্টাইনরা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিম সেলজুকদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় করছে[৬৮১] এবং ৪৯৪ হিজরি সনে (১১০১ খ্রিষ্টাব্দে) ইউরোপ থেকে প্রেরিত ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর শোচনীয় পতনের পেছনে এই বাইজান্টাইন-সেলজুক সম্পর্কই দায়ী ছিল।

বোহেমন্ডের প্রচেষ্টায় তার নেতৃত্বে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ড ও জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়।[৬৮২]

---

৬৭৯. Stevenson: op. cit., pp. 78.

৬৮০. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৩২৮।

৬৮১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ১০৩. ও Albert d' Aix, p. 651.

৬৮২. Vasiliev: op. cit., II, pp. 410-411.

বোহেমন্ড এন্টিয়ক ছেড়ে আসার তিন বছর পর ৫০০ হিজরি সনে (১১০৭ খ্রিষ্টাব্দে) দুরাস (Durrës) নৌবন্দরে সংঘটিত হয় এক নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ। আড্রিয়াটিক (Adriatic) সাগরের প্রবেশমুখে অবস্থিত নৌবন্দরটিতে বাইজান্টাইনদের অতি সুরক্ষিত একটি দুর্গ ছিল।[৬৮৩] যুদ্ধে বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস বোহেমন্ডের বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। সম্রাট নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পরাজিত বোহেমন্ড ৫০১ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দে) ডেভল (Devol) নগরীতে অত্যন্ত লাঞ্ছনাকর এক আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।[৬৮৪] চুক্তিতে তিনি তিন গুরুত্বপূর্ণ নগরী (তারসুস, আদানা ও মপসুয়েসটিয়া)-সহ পুরো কিলিকিয়া অঞ্চল ও লাতাকিয়া নৌবন্দরে বাইজান্টাইনদের কর্তৃত্ব মেনে নেন এবং স্বীকারোক্তি প্রদান করেন যে, এসব অঞ্চল এন্টিয়ক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। চুক্তিতে বাইজান্টাইন সম্রাট শর্তারোপ করেন যে, তিনি এন্টিয়কের প্রধান গির্জা হতে ক্যাথলিক বিশপকে বরখাস্ত করে সেখানে একজন অর্থোডক্স বিশপ নিযুক্ত করবেন। বোহেমন্ড চুক্তিতে এই অঙ্গীকারও করেন যে, তার ভাগ্নে টেনক্রেড যদি চুক্তির কোনো ধারা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে তিনি টেনক্রেডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করবেন![৬৮৫]

এমন চরম লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে বোহেমন্ড কোন মুখে এন্টিয়কে ফিরে যাবেন! কীভাবে মিলিত হবেন ক্রুসেড অভিযানের সঙ্গীদের সঙ্গে! আর তাই ডেভলের চুক্তির পর তিনি সিসিলি দ্বীপে ফিরে যান এবং সেখানেই তিন বছর নিঃসঙ্গ ও লাঞ্ছিত অবস্থায় জীবন কাটিয়ে অবশেষে ৫০৪ হিজরি সনে (১১১১ খ্রিষ্টাব্দে) পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এভাবেই সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় শেষ হয় বোহেমন্ড-অধ্যায়।[৬৮৬]

আর তাই আমরা দাবি করতে পারি যে, এই বিস্ময়কর যুদ্ধই (বালিখের যুদ্ধ) মূলত বোহেমন্ডের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়েছিল।

---

৬৮৩. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়া*, ১/৩২৯।

৬৮৪. Chalandon: Alexis Comnene, p. 233.

৬৮৫. Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 418.

৬৮৬. Vasiliev: op. cit., II, p. 411.

চলমান ঘটনাপ্রবাহের যেকোনো বিশ্লেষক হয়তো অবাক হয়ে ভাববেন যে, এতগুলো বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল এমন সাধারণ এক যুদ্ধের মাধ্যমে, যার ব্যাপ্তি ছিল মাত্র এক দিন! যুদ্ধটির জন্য মুসলমানদের দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রস্তুতিও ছিল না। ক্রুসেডার বাহিনীর নিহত সৈন্যসংখ্যাও যে খুব বেশি ছিল, তাও নয়—মাত্র বারো হাজার! অথচ ৪৯৪ হিজরি সনে (১১০১ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত তিনটি যুদ্ধে দুই লক্ষের অধিক ক্রুসেড সেনা নিহত হলেও সেই যুদ্ধগুলো এই মানের কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

কী পার্থক্য ছিল উভয় যুদ্ধের মধ্যে?! পার্থক্য এই ছিল যে, বালিখের যুদ্ধে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঝান্ডা উড্ডীন করা হয়েছিল, যুদ্ধ করা হয়েছিল নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, মুসলিম বাহিনী প্রতিনিধিত্ব করছিল ইসলামের। আর তাই মহান আল্লাহ তাআলাও এর ফলাফলে বরকত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব দান করেন।

অপরদিকে মুরসিফানের যুদ্ধ এবং হিরাক্লিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ যদিও আকারে-প্রকারে বালিখের যুদ্ধের চেয়ে বড় ছিল; কিন্তু সেসব যুদ্ধ করা হয়েছিল কেবল রাজ্য, ভূখণ্ড, সম্পদ ও ক্ষমতা রক্ষার লক্ষ্যে। তখন যোদ্ধাদের হৃদয়জগৎ আল্লাহ তাআলার প্রতি নিবেদিত ছিল না; নিবদ্ধ ছিল পার্থিব সম্পদ অর্জনের প্রতি। প্রকৃতপক্ষে লড়াই হয়েছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনে নিজেদের ভাগ নিশ্চিত করার জন্য। বালিখের যুদ্ধে কিন্তু আমরা এমনটি দেখিনি। বরং সেখানে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সুকমান বিন উরতুকের তাকওয়া ও খোদাভীতি, নিষ্ঠা ও নির্মোহতা এবং বিভেদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এমনকি জাকারমিশ যদিও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্তির প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু আপন স্থানে তা-ও বড় কোনো বিচ্যুতি নয়। কারণ, তিনি ও তার বাহিনী সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে শরিক ছিল। আমরা দেখেছি তিনি একজন মুসলিম সেলজুক আমিরকে মুক্ত করার বিনিময়ে মূল্যবান বন্দিকেও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন; যা প্রমাণ করে যে, তার কাছে একজন মুসলিম বন্দির মূল্য ছিল, ছিল উভয় বাহিনীর হৃদ্যতা ও সম্প্রীতির চেতনা। বোহেমন্ড যেমন সম্পদের লালসায় বল্ডউইন ডি বুর্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে উদ্ধারে আগ্রহ দেখাননি, জাকারমিশ তেমনটি করেননি।

আর তাই আমাদের কর্তব্য, কর্মের নিয়ত একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি নিবদ্ধ রাখা, সামর্থ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং ঐক্য ও সম্প্রীতি ধরে রাখা। কর্মের সুফল দান তো আল্লাহর জিম্মায়। তিনি অবশ্যই প্রচেষ্টার বহুগুণ ফল দান করবেন এবং কর্ম-প্রভাবে বরকত দান করবেন। পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান।

সন্ধি ও বিভাজন!

৪৯৬ হিজরি সনে (১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে) বালিখের যুদ্ধে বিজয়ই মুসলমানদের একমাত্র আনন্দদায়ক সংবাদ ছিল না। একই বছর এ অঞ্চলের মুসলমানরা লাভ করে আরেকটি সুখকর সংবাদ। অবশ্য দ্বিতীয় সংবাদটির প্রভাব ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম! এ বছরই পরস্পর বিবাদমান দুই ভাই সুলতান বারকিয়ারুক ও সুলতান মুহাম্মাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। উভয়ে যদিও সমুন্নত চরিত্রগুণের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তাদের পারস্পরিক বিবাদ দিনে দিনে প্রকট রূপ ধারণ করে হানাহানি-সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে এ বছরই তারা একমত হতে সক্ষম হন এবং উভয়ের সন্তুষ্টিতে পারস্পরিক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো সন্ধির ফলাফল ছিল উভয়ের মাঝে রাজ্যবিভক্তি![৬৮৭] নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্ত ছিল বক্র চিন্তা ও ভ্রান্ত নীতি-প্রসূত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

> আর তোমরা সে সকল লোকের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পরস্পরে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। [সুরা আলে-ইমরান : ১০৫]

বারকিয়ারুক ও মুহাম্মাদ তাদের পিতা সুলতান মালিকশাহর রেখে যাওয়া রাজত্ব তিন ভাগে ভাগ করতে সম্মত হন। প্রথম ভাগ শাসন করবেন সুলতান বারকিয়ারুক। তার ভাগে থাকবে ইস্পাহান, পারস্য ও ইরাকের

---

৬৮৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭০-৭১।

অধিকাংশ অঞ্চল। উত্তর ইরাক অবশ্য তার ভাগে থাকবে না। খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ তার অংশেই থাকবে। সুতরাং বাগদাদে জুমআর খুতবায় আব্বাসি খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহর পাশাপাশি সুলতান বারকিয়ারুকের নামও উচ্চারিত হবে।

দ্বিতীয় ভাগ শাসন করবেন সুলতান মুহাম্মাদ। তার ভাগে থাকবে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, দিয়ারে বকর ও মসুল অঞ্চল। অথচ সন্ধির পূর্বে মসুল ছিল বারকিয়ারুকের অধীনে। একে কেন্দ্র করে সামনে বেশ কিছু জটিলতা সৃষ্টি হবে, যার বিবরণ আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব।

তৃতীয় ও শেষ অংশ থাকবে তাদের আরেক ভাই সানজারের হাতে। তিনি শাসন করবেন খোরাসান (পূর্ব ইরান) ও মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চল।[৬৮৮]

দুই ভাই এই সমাধানের ওপর সন্ধি করেন। নিঃসন্দেহে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আমাদের জানা নেই, কী পরিস্থিতির কারণে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ তাদের উভয়কে সদাচার, সমুন্নত চরিত্র ও সুশাসনসহ বিভিন্ন মহান গুণ-বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করা হয়ে থাকে!

অবশ্য ইতিহাসের ধারাক্রম বলে, এই সন্ধিচুক্তির কারণে সকলের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, রাজ্যজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে এবং ইসলামি বিশ্বের এই অঞ্চলে আসন্ন সংঘাত-লড়াইয়ের শঙ্কা দূরীভূত হয়।

এই ছিল আলোচ্য সময়ে ইসলামি বিশ্বের প্রাচ্য অংশের পরিস্থিতি। নিঃসন্দেহে এ পরিস্থিতি ছিল অনেকটাই সুখকর; একদিকে অর্জিত হয়েছিল বালিখ-যুদ্ধের বিজয়, আরেকদিকে সম্পাদিত হয়েছিল দুই ভাইয়ের সমঝোতা-সন্ধি।

শাম অঞ্চলে মুসলমান ও ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি

তবে এ বছর শাম অঞ্চলের পরিস্থিতি মোটেও সুখকর ছিল না; ছিল না এর পরবর্তী বছরগুলোতেও! অবশ্য পূর্বে আমরা শামের যে পরিস্থিতি উল্লেখ করে এসেছি, তাতে এমনটিই ছিল স্বাভাবিক। জ্ঞানচর্চার অনুপস্থিতি, জিহাদি মূল্যবোধের শূন্যতা, জনগণের নেতিবাচক মানসিকতা, শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী আচরণসহ আরও যেসব ব্যাধি

---

৬৮৮. প্রাগুক্ত, ৯/৭১-৭২।

তৎকালীন শাম অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল, তাতে এর ব্যতিক্রম কীভাবেই-বা আশা করা যায়?!

এই দুই বছরে শাম অঞ্চলে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা হলো—

১. ক্রুসেডাররা জেনোভার একটি নৌবহরের সহায়তায় লেবাননে ত্রিপোলির উত্তরে অবস্থিত ব্যাবলস নৌবন্দরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা সেখানকার জনসাধারণকে নিরাপত্তা অঙ্গীকার প্রদান করলেও নগরীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরই বিশ্বাসঘাতকতা করে।[৬৮৯] ব্যাবলস পতনে সহায়তা করায় ক্রুসেডার সেনাপতি ৪র্থ রেমন্ড জেনোভার নৌবহরকে ব্যাবলস অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশের মালিকানা প্রদান করেন। ফলে পরবর্তী সময়ে জেনোভাবাসী ব্যাবলসে ব্যাপক পরিসরে বসতি স্থাপন করে।[৬৯০] ব্যাবলস নগরী দখলের মধ্য দিয়ে রেমন্ড তার স্বপ্নের ত্রিপোলি রাজ্যের কাঙ্ক্ষিত সীমানার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তার পরিকল্পিত ত্রিপোলি রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল তারতুস নগরী, আর দক্ষিণ সীমানা ছিল ব্যাবলস নগরী। ইতিমধ্যে তারতুস ও ব্যাবলস তার দখলে চলে এসেছে; বাকি আছে কেবল প্রধান ও কেন্দ্রীয় নগরী ত্রিপোলির পতন ঘটানো।[৬৯১]

২. এরপর ৪র্থ রেমন্ড ত্রিপোলির সরাসরি সামনে একটি বিরাট দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি দুর্গটির নামকরণ করেন সেন্ট গিল্‌স (Saint Gilles)। আরবি ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে অবশ্য দুর্গটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'সানজিল দুর্গ'। রেমন্ড ত্রিপোলির পতন ঘটানোর কাজে ব্যবহারের জন্য দুর্গটি নির্মাণ করেন। দুর্গ নির্মাণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রেমন্ডের মিত্র বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের একটি নৌবহরের সহায়তায় সাইপ্রাস থেকে আনা হয়।[৬৯২] এ সময় এ অঞ্চলের কোনো মুসলিম নেতাই দুর্গটি ধ্বংস করতে বা নির্মাণকাজে বাধা দিতে অগ্রসর হননি। অথচ ত্রিপোলি ছিল উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে দাক্কাক বিন তুতুশের শাসনাধীন দামেশক ও হিমস রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। ত্রিপোলি

---

৬৮৯. প্রাগুক্ত, ৯/৭২ ও Albert d' Aix, p. 606.

৬৯০. Heyd: op.cit., 1, p.139.

৬৯১. সাইদ আত্তর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২৯০।

৬৯২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৯৫।

থেকে হিমস নব্বই কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে অবস্থিত ছিল, দামেশক ছিল একশ বিশ কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে।

৩. ৪৯৭ হিজরি সনে (১১০৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) ঘটে বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া এক ঘটনা, পতন ঘটে সুরক্ষিত আক্কা নগরীর। পুরো শাম অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত এ নগরীর পতন যেন ছিল অবশিষ্ট নগরীগুলোরও পতনের পূর্বাভাস। তা ছাড়া আক্কার পতনের ফলে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য সমুদ্রপথে সাহায্যপ্রাপ্তির পথ বন্ধ হয়ে যায়। আক্কা নগরীতেও ক্রুসেডাররা প্রথমে জনসাধারণকে নিরাপত্তা প্রদান করলেও পরে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। ইতিপূর্বে ব্যাবলস দখলে সহায়তাকারী জেনোভার নৌবহরটি আক্কা পতনেও ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করে।[৬৯৩] বিনিময়ে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসক ১ম বল্ডউইন নৌবহরটিকে প্রদান করেন আক্কার এক-তৃতীয়াংশ। আক্কা নগরী এবার বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৬৯৪]

৪. বোহেমন্ড ইতালি চলে যাওয়ার পর টেনক্রেড এবার তার নথিপত্র গোছাতে শুরু করেন! তিনি তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করে ৪৯৮ হিজরি সনে (১১০৫ খ্রিষ্টাব্দের বসন্ত কালে) আলেপ্পো-অধিপতি রিজওয়ান বিন তুতুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে টেনক্রেড জয়লাভ করেন এবং আরতাহ দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। যুদ্ধে রিজওয়ান-বাহিনীর তিন হাজার সৈন্য নিহত হয়।[৬৯৫]

৫. ৪৯৮ হিজরি সনেই (১১০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট) মুসলমানরা রামলা অঞ্চলে আরেকটি পরাজয়ের শিকার হয়। ইতিহাসে যুদ্ধটি 'রামলার তৃতীয় যুদ্ধ' নামে খ্যাত। বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আগত উবায়দি বাহিনী এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে

---

৬৯৩. প্রাগুক্ত, ৯/৭২ ও Runciman, II, p. 139.

৬৯৪. Guillaman: de tyr, 1, p. 445.

৬৯৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৮৪-৮৫।

পড়ে।[৬৯৬] সম্ভবত এটিই ছিল উবায়দি প্রশাসন কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।[৬৯৭]

৬. ৪৯৬ হিজরি সনের রমজান মাসে (১১০৩ খ্রিষ্টাব্দে) দাক্কাক বিন তুতুশ ইন্তেকাল করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার আতাবিক[৬৯৮] তুগতেকিন (Toghtekin)। তুগতেকিন ছিলেন দাক্কাকের পিতা তুতুশের একজন ক্রীতদাস।[৬৯৯] তিনি একজন দক্ষ, চৌকস ও অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিলেন। তুতুশ নিজ সন্তান দাক্কাকের পরিচর্যার দায়িত্ব তুগতেকিনকে প্রদান করেছিলেন এবং তাকে আতাবিক (রাজপুত্রের শিক্ষক) উপাধি প্রদান করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে সেলজুক সুলতানদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দুর্বল হয়ে পড়লে আতাবিক উপাধিধারী সেনাপতিগণ চলমান ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে; এমনকি তাদের অনেকে স্বাধীন শাসক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটে; দাক্কাকের মৃত্যুর পর তুগতেকিন হিমস ও

---

৬৯৬. প্রাগুক্ত, ৯/৮৫ ও Gesta Francorum, p. 541.

৬৯৭. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২৪৭।

৬৯৮. 'আতাবিক' একটি তুর্কি শব্দ। তুর্কি 'আতাবিক' শব্দের অর্থ রাজপুত্রের শিক্ষক। সেলজুক সুলতানগণ শুরুতে সুলতান-পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্মানসূচক পদবি হিসেবে 'আতাবিক' উপাধি প্রদান করতেন। পরবর্তী সময়ে সালতানাতের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রশাসক, সেনাপতি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকেও উক্ত উপাধি প্রদান করা হয়। প্রথম আতাবিক উপাধি লাভ করেন সেলজুক সুলতান মালিকশাহর উজির নিজামুল মুলক তুসি।

সেলজুক সুলতানগণ আতাবিক উপাধিধারী অনেককেই বিশাল জায়গির ভূমি প্রদান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেলজুক সুলতানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দুর্বল হয়ে পড়লে আতাবিকদের অনেকেই স্বাধীন রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করতে শুরু করে। অনেকে আবার সেলজুক সুলতানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখলেও মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করত। প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি সম্বন্ধ করে এসব রাষ্ট্র আতাবিক-রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। সুবিশাল সেলজুক রাষ্ট্রের ভাঙনের পেছনে আতাবিকদের আলাদা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। [অনুবাদক]

৬৯৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৪ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/২৪৬। ইবনুল আছির অবশ্য দাক্কাকের মৃত্যুসন উল্লেখ করেছেন ৪৯৭ হিজরি। ইবনুল কালানিসির মতও ইবনুল আছিরের অনুরূপ।

দামেশকের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন।[৭০০] এর মধ্য দিয়ে এই দুই নগরীতে সেলজুক শাসনের পুরোপুরি সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য তুগতেকিন সার্বিক বিচারে দাক্কাকের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি জনগণের সঙ্গে ন্যায়-আচরণ করেন[৭০১] এবং শাসকজীবনে বেশ কয়েকবার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তবে তিনি ও তার বাহিনী চূড়ান্ত কোনো বিজয় এনে দিতে পারেননি। তুগতেকিনের শাসনকে তুর্কমেন (Turkmens) শাসনব্যবস্থার সূচনাকাল গণ্য করা হয়। বায়ান্নো বছর ব্যাপ্ত তুর্কমেন শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে ৫৪৯ হিজরি সনে (১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে)।

৭. ৪৯৮ হিজরি সনের ২ রবিউস সানি (১১০৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) ইন্তেকাল করেন পারস্য ও ইরাক অঞ্চলের সেলজুক সুলতান বারকিয়ারুক। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তার ভাই সুলতান মুহাম্মাদের সঙ্গে সমঝোতা-চুক্তিতে উপনীত হতে পেরেছিলেন, যার বিবরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মৃত্যুর সময় সুলতান বারকিয়ারুকের বয়স হয়েছিল মাত্র পঁচিশ বছর![৭০২] এভাবে নানাবিধ জটিলতা ও সবশেষে ভাইয়ের মৃত্যুর ফলে সুলতান মুহাম্মাদের ক্ষমতা সুসংহত হয়। তিনি এবার একই সঙ্গে নিজের ও ভাই বারকিয়ারুকের রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এর মাধ্যমে পরবর্তী একটানা বারো বছর এ অঞ্চলে ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে।[৭০৩]

৮. ৪৯৮ হিজরি সনেই (১১০৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) বিদায় নেন চলমান ঘটনাপ্রবাহের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ফরাসি সেনাপতি ৪র্থ রেমন্ড! ত্রিপোলি অবরোধের জন্য তিনি যে দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ত্রিপোলিবাসী অবরোধ মোকাবিলা করার জন্য একপর্যায়ে দুর্গটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন একটি জ্বলন্ত কাঠ রেমন্ডের গায়ে এসে পড়ে এবং এর কারণেই

---

৭০০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৪ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৪৯।

৭০১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৪।

৭০২. প্রাগুক্ত, ৯/৭৭।

৭০৩. প্রাগুক্ত, ৯/৭৯-৮০।

তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৭০৪] এভাবেই ক্রুসেডাররা হারায় নিজেদের একজন দুর্বিনীত নেতাকে। রেমন্ড অবশ্য তার অন্যান্য সঙ্গীর ন্যায় জীবদ্দশায় নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারেননি।[৭০৫] মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে যান তার খালাতো ভাই উইলিয়াম জর্ডান (William Jordan)-কে। উইলিয়াম পুরোপুরি রেমন্ডের নীতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হন এবং ত্রিপোলি দখলের লক্ষ্যে অবরোধ অব্যাহত রাখেন। রেমন্ডের ন্যায় তিনিও বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় অব্যাহত রাখেন।[৭০৬]

৯. সুলতান মুহাম্মাদ মসুলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে বারকিয়ারুকের সঙ্গে মিত্রতার দাবিতে মসুলের আমির জাকারমিশ তাতে বাধ সাধেন। এর ফলে মসুলের নেতৃত্ব নিয়ে চরম সংকট দেখা দেয়। যদিও বারকিয়ারুক ও মুহাম্মাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মসুলের কর্তৃত্ব সুলতান মুহাম্মাদেরই প্রাপ্য ছিল; কিন্তু জাকারমিশের যেহেতু স্বাধীন ক্ষমতার প্রতি ঝোঁক ছিল, তাই তিনি নগরীর নিয়ন্ত্রণ সমর্পণে অস্বীকৃতি জানান। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বারকিয়ারুকের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছলে জাকারমিশ মসুলের কর্তৃত্ব সুলতান মুহাম্মাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। অবশ্য এই সমর্পণ ছিল নিতান্তই সাময়িক, যেমনটি আমরা আগামী ঘটনাপ্রবাহে জানতে পারব।[৭০৭]

১০. ৪৯৮ হিজরি সনেই (১১০৫ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানরা হারায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উজ্জ্বল ভূমিকা পালনকারী এক মহান নেতাকে। তিনি হলেন হাসানকেইফের অধিপতি সুকমান বিন উরতুক। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, জাকারমিশের সঙ্গে একজোট

---

৭০৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৯৫-৯৬ ও সিবতু ইবনিল জাওযি, *মিরআতুয-যামান*, পৃষ্ঠা : ৫২৮।

৭০৫. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/২৯১।

৭০৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৯৬ ও Runciman: op. cit., II, p. 62.

৭০৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৯-৮১।

হয়ে বালিখের যুদ্ধে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক মহান বিজয় বাস্তবায়ন করেছিলেন।

তার মৃত্যুর ঘটনাও যথেষ্ট উদ্দীপক ও শিক্ষণীয়। প্রথমে রেমন্ড এবং পরে উইলিয়াম ত্রিপোলি অবরোধ করলে ত্রিপোলির শাসক ইবনে আম্মার সুকমানের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। তখন সুকমান তার বাহিনী নিয়ে ত্রিপোলির সহায়তায় রওনা হন। যদিও ইবনে আম্মার ও তার বাহিনী শিয়া ছিল; কিন্তু সুকমান বিন উরতুক রহ. সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। তিনি দেখেছেন শত্রু এখানে ক্রুসেডার বাহিনী, যারা শিয়া-সুন্নি সকলের শত্রু। আর তাই তিনি ত্রিপোলি থেকে প্রায় ছয়শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাসানকেইফ থেকে বীর-বিক্রমে রওনা হন। সুকমান ডিপথেরিয়া-রোগী ছিলেন। ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তার হঠাৎ হঠাৎ ডিপথেরিয়ার উপসর্গ দেখা দিত। ত্রিপোলির পথে রওনা হয়ে তিনি যখন (ত্রিপোলি হতে একশ বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) কারইয়াতাইন (Quaryatayn) অঞ্চলে পৌঁছেন, তখন তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। যেহেতু এ অবস্থায় তার পক্ষে কিছুতেই যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাই সঙ্গীরা তাকে নিয়ে হাসানকেইফে ফিরে যাওয়ার আবেদন করে। প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলেন, তা আজও ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে—

> “না, আমি পথচলা অব্যাহত রাখব। যদি সুস্থ হয়ে উঠি, তাহলে যে সংকল্প করেছি, তা পূর্ণ করব। আমি চাই না যে, আল্লাহ আমাকে মৃত্যুর ভয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে পিছু হটতে দেখবেন। আর যদি আমার ‘আজাল’ এসে যায়, তাহলে তো আমি জিহাদের সফরে থাকায় শহিদ বিবেচিত হব।”

এরপর সৈন্যরা তাকে নিয়ে ত্রিপোলি অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এর দুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭০৮]

ইতিহাসের হাজারো মেঘে-ঢাকা দুর্যোগ চিত্রের মাঝে এ এক অত্যুজ্জ্বল চিত্র। সুকমান বিন উরতুক রহ. পিছু হটা অবস্থায় আপন রবের সঙ্গে মিলিত হতে চাননি; মিলিত হতে চেয়েছেন সম্মুখ পানে এগিয়ে চলা

---

৭০৮. প্রাগুক্ত ৯/৮২-৮৩।

অবস্থায়। রাব্বে কারিম তাকে আপন সুবিস্তৃত অনুগ্রহে সিক্ত করুন এবং তার এই অগ্রযাত্রাকে তার জান্নাত গমনের অগ্রযাত্রায় পরিণত করুন।

মসুলের গোলযোগ

চলমান বেদনাদায়ক ঘটনাপ্রবাহের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে আমরা এবার মসুলে সৃষ্ট গোলযোগ ও পরিস্থিতির বিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। গোলযোগ, সংঘাত ও সংকটের সূক্ষ্ম বিবরণ ও বিশ্লেষণের প্রতি আমার আগ্রহ নেই; কিন্তু যেহেতু মসুলকেন্দ্রিক এই গোলযোগ ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহে বেশ বড় ধরনের প্রভাব ফেলে, তাই কিছুটা বিস্তৃত পরিসরেই এর আলোচনা করতে হচ্ছে। পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, খোদ মসুল নগরীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অতীতে যেমন মসুল থেকে বিভিন্ন জিহাদি তৎপরতা সূচিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। তৎকালীন মসুলের জনগণ ছিল সজাগ চেতনা ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী। তা ছাড়া মসুলের এই গোলযোগের কারণেই এমন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাবেন, পেছনের ইতিহাসে যাদের বিভিন্ন ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সুলতান বারকিয়ারুকের মৃত্যুসংবাদ জানার পর মসুলের প্রশাসক জাকারমিশ সুলতান মুহাম্মাদের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য ও মিত্রতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জাকারমিশ সুলতান মুহাম্মাদের কাছে রাজস্ব প্রেরণে গড়িমসি করতে থাকেন। এর ফলে সুলতান তার আনুগত্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। সুলতান এ বিষয়ে জবাবদিহি করে পত্র প্রেরণ করলে জাকারমিশ নানা অজুহাত পেশ করতে থাকেন। একপর্যায়ে সুলতান মুহাম্মাদ নিশ্চিত হন যে, জাকারমিশ নিজ জনসমর্থন কাজে লাগিয়ে মসুলের স্বাধীন ও একচ্ছত্র অধিপতি হতে চাচ্ছেন। মসুলে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বাধ্য হয়ে সুলতান তার অন্যতম শক্তিশালী এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। আক্ষেপের বিষয় হলো, সুলতানের প্রেরিত এই সেনাপতি আচার-আচরণে মোটেও ভালো ছিলেন না। তিনি ছিলেন বদমেজাজি ও হিংস্র প্রকৃতির; জনসাধারণ তাকে মোটেও পছন্দ করত না। তুর্কি এই সেনাপতির নাম ছিল 'জাওলি সাকাউ'।

সুলতানের নির্দেশে জাওলি মসুল অভিমুখে অগ্রসর হলে জাকারমিশ তার মোকাবিলায় বেরিয়ে আসেন। ৫০০ হিজরি সনে (১১০৬ খ্রিষ্টাব্দে) দজলার তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে জাকারমিশ পরাজিত ও বন্দি হন। কিন্তু মসুলের জনগণ জাওলির জন্য নগরদ্বার খুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা এবার নিজেদের প্রিয় শাসক জাকারমিশের পুত্র জিনকি বিন জাকারমিশকে নতুন নেতা নির্বাচিত করে। এটি ছিল মসুলের সচেতন জনগণের সমুন্নত ইতিবাচক মনোভাবের অনন্য প্রমাণ। যদিও সুলতান মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়াই মসুলের জন্য শ্রেয়তর ছিল; কিন্তু অসচ্চরিত্র জাওলির কঠোর আচরণ মসুলের জনগণকে এ পথে হাঁটতে বাধ্য করে। এরপর মসুলের জনগণ এই সংকটে সহায়তা লাভের আশায় এক প্রতাপশালী ব্যক্তির কাছে পত্র প্রেরণ করে। প্রতাপশালী সেই ব্যক্তিটি হলেন রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের অধিপতি সুলতান কিলিজ আরসালান![৭০৯]

কিলিজ আরসালানের সামনে তখন মসুল দখল করে নিয়ে আপন রাজ্যপরিধি বিস্তারের পথ সুগম করার মোক্ষম সুযোগ! তিনি তার বাহিনী নিয়ে মসুলে পৌঁছলে জনসাধারণ তাকে স্বাগত জানিয়ে নগরদ্বার খুলে দেয়। মসুলে প্রবেশ করে কিলিজ আরসালান প্রথমে সেখানে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, এরপর জাওলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়েন। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই হলে কিলিজ আরসালান পরাজিত হন। এরপর নিরুপায় হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে তিনি খাবুর নদীতে পড়ে ডুবে যান। বেশ কয়েকদিন পর তার মৃতদেহ ভেসে ওঠে![৭১০]

রাজ্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির লালসা এভাবেই কিলিজ আরসালানকে এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে মসুলে টেনে নিয়ে আসে আর নিজ ভূখণ্ড থেকে দূরের এক নগরীতে তার মৃত্যুর ডাক এসে যায়। এমন এক ভূখণ্ডে তার মৃত্যু হয়, যেখানে তিনি জীবনে এই প্রথম পা রেখেছেন! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

---

৭০৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১০২-১০৩ ও ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৯৮।

৭১০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১০৬-১০৭।

কোনো প্রাণী জানে না আগামীকাল কী উপার্জন করবে এবং কোনো প্রাণী জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।

[সুরা লুকমান : ৩৪]

কত পার্থক্য কিলিজ আরসালানের মৃত্যু ও সুকমান বিন উরতুকের মৃত্যুতে! একজন সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হয়েও ছুটেছেন রাজ্য আরও বড় করার লালসায়, বরণ করেছেন লাঞ্ছনার মরণ; অপরজন ছোট্ট একটি রাজ্যের শাসক হলেও ছুটে গেছেন ক্রুসেডার শত্রুর মোকাবিলায়, বরণ করেছেন শাহাদাতের মৃত্যু!

এরপর নগর প্রতিরক্ষাকারীদের অনুপস্থিতির সুযোগে জাওলি মসুলে প্রবেশ করেন। নগরবাসীর সঙ্গে তিনি চূড়ান্ত কঠোর আচরণ করেন; সেনাদের লেলিয়ে দেন জনতার নিপীড়নে। এরপর ৫০২ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মসুলে নিজের একক আধিপত্য ঘোষণা করেন। তার মতো অসচ্চরিত্র-ধুরন্ধর ব্যক্তির কাছ থেকে এমনটিই ছিল প্রত্যাশিত। বাধ্য হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ মসুলের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে তার আরেক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। এবারের প্রেরিত সেনাপতি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলিম-মুজাহিদ। অনন্যসাধারণ এই অভিজাত তুর্কমেন সেনাপতির নাম মওদুদ বিন তুনতেকিন। তিনি মসুল অবরোধ করলে জাওলি ও তার সৈন্যরা প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাওলি জানতেন যে, মসুলের জনসাধারণ সৎ নেতৃত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তারা তাকে মোটেও পছন্দ করে না। তাই তিনি তাদেরকে নগরপ্রাচীরের কাছে আসতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু জনসাধারণের আত্মমর্যাদাবোধ তো আর মরে যায়নি! একদল লোক গোপনে একজোট হয়ে যেকোনো মূল্যে নগরদ্বার উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, সবাই যখন জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত হবে, তখন সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে তারা একটি প্রহরা-চৌকির কাছে সমবেত হয়ে প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করে তাদেরকে হত্যা করে এবং নগরদ্বার খুলে দিয়ে সুলতান মুহাম্মাদের নামে শ্লোগান দিতে থাকে। সেনাপতি মওদুদের নেতৃত্বে সুলতানের সৈন্যরা দ্রুত অগ্রসর হয়ে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এরপর তারা জাওলির সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অল্প সময়ের মধ্যে নগরীতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তবে জাওলি নিজে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পালানোর সময় তিনি সঙ্গে নিয়ে যান

চার বছর ধরে মসুলে বন্দি মূল্যবান শিকার 'বল্ডউইন ডি বুর্গ'কে! নিঃসন্দেহে জাওলি জানতেন যে, এই বন্দির মূল্য অনেক বেশি; একে নিয়ে দরকষাকষি করা যাবে, বিক্রি করা যাবে উচ্চ মূল্যে![৭১১]

এদিকে তিল-বাশিরের প্রশাসক ও বল্ডউইন ডি বুর্গের প্রধান সহযোগী জোসেলিন ইতিমধ্যে বিশ হাজার দিনার মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া পেয়েছিলেন।[৭১২] তিনি যখন জানতে পারেন যে, বল্ডউইন এখন জাওলির কবজায় আছে, তখন তিনিও বল্ডউইনকে মুক্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা শুরু করেন।

নিঃসন্দেহে পরিস্থিতি চরম জটিলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল!

মসুলের প্রশাসনিক দায়িত্বে এখন মওদুদ বিন তুনতেকিন। জাওলি পালাচ্ছেন বল্ডউইন ডি বুর্গকে সঙ্গে নিয়ে। জোসেলিন চেষ্টা করছেন বল্ডউইনকে মুক্ত করতে। এডেসা ক্রুসেড রাজ্যের ক্ষমতা চার বছর ধরে টেনক্রেডের হাতে।

এডেসা রাজ্যের অধিকাংশ নাগরিক ছিল আর্মেনীয়। টেনক্রেড তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতেন। বোহেমন্ড চলে যাওয়ার পর থেকে টেনক্রেড এন্টিয়কেই অবস্থান করতেন। তিনি তার চাচাতো ভাই রিচার্ড সালের্নো (Richard Salerno)-কে এডেসায় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন।[৭১৩]

এই জটিলতর পরিস্থিতির মধ্যে জোসেলিন জাওলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্রুত বন্দি বল্ডউইনকে নিয়ে দরকষাকষি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ সত্তর হাজার দিনার মুক্তিপণে একমত হয়। পাশাপাশি উভয় পক্ষ একে অপরের সামরিক সংকটে পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করে! অর্থাৎ বন্দিমুক্তির চুক্তি পরিণত হয় যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে![৭১৪]

---

[৭১১]. প্রাগুক্ত, ৯/১২৪-১২৫।

[৭১২]. প্রাগুক্ত, ৯/১২৬।

[৭১৩]. Matthieu d' Edesse (Doc. Arm.1); p. 86.

[৭১৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১২৬।

মুসলিম-ক্রুসেডার মৈত্রি!

মুক্তি পেয়েই বল্ডউইন ডি বুর্গ নিজ রাজ্য এডেসায় ছুটে যান। কিন্তু এডেসার বিপুল সম্পদরাজি ও গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান ততদিনে টেনক্রেডকে এডেসার প্রতি মুগ্ধ করে তুলেছিল। তাই বল্ডউইনকে হতবাক করে দিয়ে টেনক্রেড তার হাতে এডেসার ক্ষমতা সমর্পণে অস্বীকৃতি জানান।[৭১৫] বল্ডউইন ডি বুর্গের সামনে তখন ক্রুসেডার নেতা টেনক্রেডের হাত থেকে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই!

এদিকে জাওলি এ সময় তার উগ্র বাহিনী ও হাতে থাকা প্রচুর অর্থ ব্যবহার করে এ অঞ্চলে নিজের জন্য আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছিলেন। তার লোভাতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় রিজওয়ান বিন তুতুশের শাসিত আলেপ্পো রাজ্যের কিছু এলাকার প্রতি।[৭১৬]

সবকিছু মিলিয়ে এই জটিলতর পরিস্থিতি সকলকে এক আজব যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধের পথে অগ্রসর হওয়া জোটগুলো আরও বিস্ময়কর! ক্রুসেডার নেতা বল্ডউইন ডি বুর্গ ও জোসেলিন জোট করেছেন মুসলিম সেনাপতি জাওলির সঙ্গে! প্রতিপক্ষ আরেক ক্রুসেডার সেনাপতি টেনক্রেড জোট বেঁধেছেন তার পুরোনো শত্রু রিজওয়ান বিন তুতুশের সঙ্গে! জাওলির আসন্ন হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে রিজওয়ানও আগ্রহ নিয়ে টেনক্রেডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন!

এ কোন ধরনের চেতনাশূন্যতা! কোন ধরনের বিবেকহীনতা!

৫০২ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে) ফুরাত নদীর পশ্চিমে অবস্থিত মানবিজ নগরীর কাছে দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বল্ডউইন ও জাওলির সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়, বিজয় লাভ করে টেনক্রেড-রিজওয়ান মিত্রজোট। তবে এন্টিয়কের গির্জাধ্যক্ষ এ সময় পরিস্থিতির সমাধানে হস্তক্ষেপ করেন। ক্রুসেডারদের পারস্পরিক বিভেদ যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয়, এজন্য তিনি এডেসার নেতৃত্ব বল্ডউইনকে ফিরিয়ে

---

৭১৫. ইবনুল আছির উল্লেখ করেছেন যে, টেনক্রেড এ সময় বল্ডউইনের মনস্তুষ্টির লক্ষ্যে তাকে ত্রিশ হাজার দিনার, ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধ-পোষাক ও অন্যান্য বস্ত্র প্রদান করেন। দেখুন : আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১২৬।

৭১৬. setton:op. cit., 1, pp.393-394.

দেওয়ার জন্য টেনক্রেডকে নির্দেশ দেন এবং টেনক্রেডকে এন্টিয়কের দায়িত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেন।[৭১৭]

এডেসায় বসবাসরত আর্মেনীয়দের বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধে পরাজিত বল্ডউইন ও জোসেলিন এডেসায় ফিরতে পারবেন না। এদিকে টেনক্রেডের দুঃশাসনে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া অন্যান্য ক্রুসেডার নেতার শাসনও তো টেনক্রেডের দুঃশাসনের চেয়ে ব্যতিক্রমী কিছু হবে না। তাই বিপুল সংখ্যক আর্মেনীয় নাগরিক এক স্থানে সমবেত হয়ে ক্রুসেডারদের শাসনবলয় থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসার আগ্রহ প্রকাশ করে।[৭১৮] কিন্তু অল্প সময় পরই বল্ডউইন ডি বুর্গ দৃশ্যপটে আত্মপ্রকাশ করেন এবং শাসক হিসেবে এডেসায় ফিরে আসেন। আর্মেনীয়দের জনসমাবেশের কথা জানতে পেরে তিনি তাদের ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে আসীন সকল আর্মেনীয়কে পদচ্যুত করেন এবং নগরীর আর্মেনীয় গির্জাধ্যক্ষকে চোখ উপড়ে ফেলার হুমকি দেন। বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রদান করে গির্জাধ্যক্ষ আপাতত ছাড়া পান। এভাবে এডেসা নগরীর অভ্যন্তরে প্রচণ্ড নির্যাতন-নিপীড়ন চলতে থাকে আর জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।[৭১৯] নিঃসন্দেহে এ পরিস্থিতি রাজ্যটির ভবিষ্যৎ অস্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ত্রিপোলির পতন

এন্টিয়ক-বিশপের নির্দেশ অনুযায়ী টেনক্রেড এন্টিয়কে ফিরে আসেন। এরপর সে বছরই অর্থাৎ ৫০২ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাত থেকে লাতাকিয়া নৌবন্দর পুনরুদ্ধার করেন। এদিকে বল্ডউইন ডি বুর্গ নতুন করে এডেসার শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কাজ শুরু করেন। এ পর্যায়ে আমরা ত্রিপোলি অঞ্চলের পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি বোলাতে পারি; কেননা, এ সময় সেখানকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।[৭২০]

---

৭১৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১২৮-১২৯ ও Albert d' Aix, p. 649.

৭১৮. Matthieu d' Edesse, p. 268.

৭১৯. Grousset: Hist des Croisades, 1.p. 433 & Michel le Syrien, 111. p. 196.

৭২০. Heyd: op. cit., 1,pp. 145-146.

ত্রিপোলিকে ঘিরে ৪র্থ রেমন্ডের খালাতো ভাই উইলিয়াম জর্ডানের নেতৃত্বে কঠিন অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল। ৪৯৫ হিজরি সনে (১১০২ খ্রিষ্টাব্দে) স্বয়ং রেমন্ডই অবরোধ শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে অবরোধের পূর্ণ ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই ছয় বছরে ত্রিপোলি বাইরে থেকে কোনো ইসলামি শক্তির সহায়তা পায়নি; না চারপাশ ঘিরে থাকা কোনো সুন্নি রাজ্য থেকে, না মিশরকেন্দ্রিক শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্য থেকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তৎকালে ত্রিপোলি শিয়া বনু আম্মার কর্তৃক শাসিত ছিল। সে সময় ত্রিপোলির শাসক ছিলেন ফখরুল মালিক ইবনে আম্মার।

দীর্ঘ ও সুকঠিন অবরোধের মুখে অবশেষে ইবনে আম্মার ৫০২ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দে) ত্রিপোলি ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি ত্রিপোলি রক্ষায় সাহায্যপ্রার্থনার জন্য আব্বাসি খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহ ও সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাগদাদে গমন করেন।[৭২১] কিন্তু মাজহাব ও আদর্শগত ভিন্নতার দিক বিবেচনা করে খলিফা ও সুলতান উভয়ে ইবনে আম্মারকে সহায়তা করতে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে গতানুগতিক কিছু সমর্থনসূচক বক্তব্য ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণী শুনিয়ে দিয়ে বিদায় জানান। এভাবে তারা ত্রিপোলিকে ক্রুসেডারদের পদতলে নিষ্পেষিত হওয়ার জন্য ছেড়ে দেন! সন্দেহ নেই, এটা ছিল চিন্তাগত বিচ্যুতি ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকট। কারণ, ইবনে আম্মারকে সহায়তা করা তো প্রকারান্তরে ক্রুসেডারদের দুর্বল করার নামান্তর। যত যাই হোক, ত্রিপোলি একটি মুসলিম নগরী। আমরা তো খলিফা ও সুলতানের কাছে তাদের আকিদা ও বিশ্বাস এবং নীতি ও আদর্শ বদলে ফেলার দাবি করছি না; আমরা প্রত্যাশা করেছি, মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তাদের দুজনের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠবে, নির্যাতিত মুসলিম জনসাধারণের সহায়তায় তারা অগ্রসর হবেন এবং ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় বীরত্ব প্রদর্শন করবেন। কিন্তু এর কিছুই ঘটেনি!

ইবনে আম্মার ব্যর্থ মনোরথে ত্রিপোলিতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি দেখতে পান, ইতিমধ্যে ত্রিপোলি তার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে! না, অবরোধকারী ক্রুসেডাররা দখল করে নেয়নি; ত্রিপোলি চলে গেছে উবায়দিদের নিয়ন্ত্রণে! ইবনে আম্মারের অনুপস্থিতিতে ত্রিপোলিবাসী

---

৭২১. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৬০।

উবায়দি প্রশাসনের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করায় মিশর থেকে কয়েকটি নৌবহর এসে ইতিমধ্যে ত্রিপোলিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।[৭২২]

এত কিছু ঘটে গেছে আর ক্রুসেডার বাহিনী তখনও বাইরে থেকে ত্রিপোলি অবরোধ করে রেখেছে।

এই ঘটনাপ্রবাহের মাঝেই মৃত ক্রুসেডার সেনাপতি ৪র্থ রেমন্ডের পুত্র বারট্রাম (Bertram) তার পিতার রাজ্যের সন্ধানে শাম অঞ্চলে উপস্থিত হন।[৭২৩] এরপর তিনি উইলিয়াম জর্ডানের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিপতি ১ম বল্ডউইন দুজনের মাঝে হস্তক্ষেপ করেন এবং রেমন্ডের অধিকৃত ইসলামি ভূখণ্ড তাদের দুজনের মাঝে ভাগ করে দেন। উইলিয়াম জর্ডান লাভ করেন ইরকা ও তারতুস নগরীর কর্তৃত্ব আর বারট্রাম লাভ করেন তার পিতার নির্মিত সানজিল দুর্গ ও ব্যাবলস নগরীর নিয়ন্ত্রণ। সিদ্ধান্ত হয় ত্রিপোলির পতন ঘটলে তাও বারট্রামের নিয়ন্ত্রণে যাবে।[৭২৪]

এরপর বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ১ম বল্ডউইন ত্রিপোলির পতন ঘটানোর জন্য ইসলামি ভূখণ্ডে অবস্থানরত সকল ক্রুসেড শক্তিকে সমবেত করার চেষ্টা করেন। দীর্ঘকাল পর এই প্রথমবারের মতো বারট্রাম ও উইলিয়াম জর্ডানের বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ১ম বল্ডউইন ও এন্টিয়কের শাসক টেনক্রেডের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় জেনোভা থেকে আগত এক বিশাল নৌবহর। সম্মিলিত বাহিনীর লক্ষ্য একটাই—অটল-অবিচল ত্রিপোলি নগরীর পতন ঘটানো![৭২৫]

অবরুদ্ধ মুসলিম নগরী ত্রিপোলি আসন্ন তুফানের মুখে একাকী-নিঃসঙ্গ। অসহায় জনগণ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ। অল্প সময়ের মধ্যেই উবায়দি প্রতিরক্ষা বাহিনী ও ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের মাঝে সমঝোতা হয়ে যায়! সিদ্ধান্ত হয় উবায়দি বাহিনীকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে, বিনিময়ে তারা ক্রুসেডারদের জন্য নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। পাশাপাশি ক্রুসেডাররা মুসলিম নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা

---

৭২২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১২০-১২১।

৭২৩. Runciman: op. cit., 11, pp. 61: 64-65.

৭২৪. Albert d' Aix, p. 668 & Guillaume de Tyr, p. 466.

৭২৫. আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৫/১৭৯।

প্রদানেরও অঙ্গীকার করে।[৭২৬] এ যেন বাইতুল মুকাদ্দাস চিত্রনাট্যের পুনঃমঞ্চায়ন! উবায়দি প্রতিরক্ষা বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য একটাই— ইসলামি জনপদগুলোর কর্তৃত্ব ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেওয়া!

বাস্তবেও উবায়দি প্রতিরক্ষা বাহিনী নিরাপদে ত্রিপোলি থেকে বেরিয়ে যায়। ৫০৩ হিজরির শেষ দিকে (১১০৯ খ্রিষ্টাব্দে) নির্দিষ্ট করে বললে জিলহজের এগারো তারিখ ঈদুল আজহার দ্বিতীয় দিন ক্রুসেডাররা ত্রিপোলিতে প্রবেশ করে!

বর্বর ক্রুসেডারদের কাছ থেকে যেমনটি প্রত্যাশিত ছিল, তেমনই ঘটে। ত্রিপোলিতে প্রবেশ করেই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তারা প্রচুর মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, অবশিষ্ট জীবিত পুরুষদের বন্দি করে, নারী ও শিশুদের দাসে পরিণত করে এবং ধনসম্পদ লুট করে। ত্রিপোলি ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ইসলামি নগরী। ক্রুসেডাররা ত্রিপোলি থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনের প্রচুর পরিমাণ গ্রন্থ লাভ করে। এমনকি তারা বিভিন্ন ময়দানে একত্র করে অসংখ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি জ্বালিয়ে দেয়।[৭২৭]

একটানা সাত বছরের অবরোধের পর ত্রিপোলির পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামি ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্থ ক্রুসেড রাজ্য। মৃত্যুর পরে হলেও ৪র্থ রেমন্ডের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ত্রিপোলির কর্তৃত্ব লাভ করেন রেমন্ডের পুত্র বারট্রাম। এর মধ্য দিয়ে মুসলিম নগরী ত্রিপোলি প্রবেশ করে এক দীর্ঘ সংকটপূর্ণ স্তরে, যা স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ একশ আশি বছর!

একচ্ছত্র অধিপতি টেনক্রেড!

মুসলমানদের চরম অধোগমন ও অবসন্নতার সুযোগে এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই শামের উপকূলীয় অন্যান্য ইসলামি দুর্গেরও পতন ঘটে। বানিয়াস (Baniyas) ও জাবালা নগরীর পতন ঘটে টেনক্রেডের হাতে। তিনি নগরীদুটিকে এন্টিয়ক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।[৭২৮]

---

৭২৬. Guillaume de Tyr, p. 468.

৭২৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৩৬।

৭২৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৩৭ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৬৩-১৬৪।=

কদিন পরই হাতছাড়া হয় বৈরুত। ৫০৩ হিজরি সনে (১১১০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) রেমন্ড-পুত্র বারট্রামের সহযোগিতায় দীর্ঘ চার মাসের অবরোধ শেষে বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিপতি ১ম বল্ডউইন বৈরুতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দখলের পূর্বেই বৈরুতের মুসলিম নাগরিকদের মাঝে চালানো হয় নৃশংস গণহত্যা।[৭২৯] সবশেষে পতনের শিকার হয় লেবানিজ নগরী সিডন। নরওয়ের রাজার নেতৃত্বাধীন একটি ব্যক্তিগত নৌবহর ও ভেনিসের ডিউকের নেতৃত্বাধীন ভেনিস অঞ্চলের একটি নৌবহরের সহযোগিতায় বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ১ম বল্ডউইন সিডন দখল করে নেন।[৭৩০]

এর ফলে উত্তরে এন্টিয়ক হতে দক্ষিণে জাফা পর্যন্ত শামের উপকূলীয় সবগুলো নগরী ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। এ সকল নগরীর মধ্যে মুসলমানদের হাতে থাকে কেবল আসকালান ও সুর নগরী। নগরীদুটির পতন তুলনামূলক বিলম্বিত হয় এবং তার পূর্ব পর্যন্ত মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে।

অপরদিকে যেসব নগরীর অবস্থান ছিল সমুদ্র-তীর হতে ভেতরের দিকে, সেগুলো সরাসরি ক্রুসেডারদের দখলদারিত্বের শিকার না হলেও আরেক ধরনের লাঞ্ছনা-স্বাদ ভোগ করছিল। যেমন টেনক্রেড আলেপ্পোর পশ্চিমে অবস্থিত আছারিব দুর্গ অবরোধ করেন। আলেপ্পো রাজ্যের অধীনস্থ গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গটির অবস্থান ছিল আলেপ্পো ও এন্টিয়কের পথে।[৭৩১] টেনক্রেড আলেপ্পোর অধিপতি রিজওয়ানকে প্রস্তাব দেন যে, তাকে ত্রিশ হাজার দিনার প্রদান করা হলে তিনি অবরোধ তুলে নেবেন। কিন্তু রিজওয়ান না এমন মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানে রাজি ছিলেন, না টেনক্রেডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি ছিলেন! তাই তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নীরব বসে থাকেন আর দুর্গটিকে আপন পরিণতি বরণের

=ইবনুল আসির বলেছেন, 'টেনক্রেড বানিয়াস ও জুবাইল নগরী দখল করেন।' তবে সঠিক হলো টেনক্রেডের দখলকৃত নগরীটির নাম জাবালা; জুবাইল নয়। জুবাইল (ব্যাবলস) ক্রুসেডাররা দখল করেছিল ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে। এর বিবরণ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

[৭২৯]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৬৭-১৬৮, Michaud: op. cit., 1, pp. 40-44 & Foucher de Charters, p. 416 & Albert d' Aix, p. 671.

[৭৩০]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৩৯ ও Heyd: op. cit., 1, p. 142.

[৭৩১]. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৫-১৫৬।

জন্য ফেলে রাখেন। ৫০৪ হিজরি সনে টেনক্রেড দুর্গটি দখল করে নেন। ক্রুসেডাররা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুই হাজার মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, বাকিদের বন্দি করে।[৭৩২] তবে আছারিব দুর্গের পতন ঘটায় আরও কঠিন এক সংকট সৃষ্টি হয়। আলেপ্পোর নিকটবর্তী এই দুর্গটি ক্রুসেডারদের দখলে চলে যাওয়ায় এবার আলেপ্পোর নিরাপত্তাই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অবস্থানগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ক্রুসেডাররা বারবার আলেপ্পো অবরোধ করে। ফলে আলেপ্পোবাসী কঠিন সংকটে পড়ে যায়। বাইরে ক্রুসেডারদের অবস্থানের কারণে তারা সহজে নিজেদের ক্ষেত-খামার ও ব্যবসাস্থলে যেতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে তাদের অনেকে বাগদাদ ও অন্যান্য নগরীতে চলে যায়। অবশেষে রিজওয়ান টেনক্রেডের সঙ্গে এক আত্মঘাতী চুক্তি করতে বাধ্য হন। তিনি আছারিব দুর্গ ফিরে পাওয়া ব্যতীতই টেনক্রেডকে ত্রিশ হাজার দিনার প্রদান করতে সম্মত হন।[৭৩৩] বরং টেনক্রেড যারদানা (Zardana) নামক আরেকটি দুর্গ দখল করে নেন। এ ছাড়াও চুক্তিতে শর্তারোপ করা হয় যে, রিজওয়ান আলেপ্পোতে বন্দি সকল ক্রুসেডার ও আর্মেনীয়কে মুক্তি দেবেন।[৭৩৪] এভাবে আলেপ্পো-পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে।

আলেপ্পোর মতো একই ঘটনা ঘটে শাইজার অঞ্চলে। শাইজারের আমির সুলতান বিন মুনকিয টেনক্রেডকে জিজিয়া প্রদান করতে শুরু করেন। হামা নগরীর আমির আলি কুর্দিও সন্ধিচুক্তির বিনিময়ে টেনক্রেডকে কর প্রদানে সম্মত হন।[৭৩৫]

এভাবে টেনক্রেড শামের উত্তরাঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতিতে পরিণত হন। ওদিকে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ১ম বল্ডউইন পরিণত হন শামের দক্ষিণাঞ্চল ও ফিলিস্তিনের সর্বোচ্চ নেতায়।

---

৭৩২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪০, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৬ ও Matthieu d' Edesse, I, p. 65.

৭৩৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪১।

৭৩৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৬ ও Albert d' Aix p. 634.

৭৩৫. উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১২০-১২১।

ইতিহাস ও বর্তমানের বিশ্লেষণ

ইসলামি ভূমিতে ক্রুসেড আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর ইতিমধ্যে কেটে গেছে দীর্ঘ তেরোটি বছর। সামগ্রিক চিত্রও আমাদের সামনে অনেকটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। ক্রুসেড ইতিহাসের এ পর্যায়ে এসে আমাদের উচিত ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে একটু বিরতি দিয়ে পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ এবং চলমান পরিস্থিতি থেকে কিছু শিক্ষাগ্রহণ। এরপর আমরা আবারও ফিরে যাব ইতিহাসের ধারাবর্ণনায়; পাঠ করব ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে কী ঘটেছিল।

[এক]

এই তেরো বছরের মাথায় এসে ক্রুসেড রাজ্যগুলো নিজেদের চূড়ান্ত রূপে উপনীত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দশকের পর দশক অতিবাহিত হলেও ক্রুসেড রাজ্যগুলোর আকৃতিতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আসেনি। রাজ্যগুলোর সে সময়ের পরিস্থিতির চূড়ান্ত চিত্র ছিল নিম্নরূপ।

১. **বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য (The Kingdom of Jerusalem)**

ফিলিস্তিন ভূমি ও লেবাননের কিছু অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল ক্রুসেড রাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাস। ক্রুসেড রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র এই রাজ্যটি 'সাম্রাজ্য' পরিচিতি ধারণ করেছিল। এর মাধ্যমে রাজ্যটির প্রশাসন মূলত সকলকে এ দাবিই জানাতে চেয়েছিল যে, বাইতুল মুকাদ্দাস অন্য কোনো রাজ্যের আনুগত্য করবে না; বরং অন্যরাই তার আনুগত্য করবে। আর বাস্তবেও আমরা ভবিষ্যতে এমনটিই প্রত্যক্ষ করব। পরবর্তী সময়ে প্রতিটি ক্রুসেড রাজ্য যদিও স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে; কিন্তু ক্রুসেডারদের বিভিন্ন ইস্যুতে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের মতামতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সময় বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ফরাসি সেনাপতি ১ম বল্ডউইন। ফলে রাজ্যটি পুরোপুরি ফরাসি বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিল। যেহেতু অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের স্বতন্ত্র অবস্থান ছিল, তাই মুসলমানরা নির্বিশেষে সকল ক্রুসেডারকেই ফরাসি, ফ্রাঙ্ক, ফিরিঙ্গি ইত্যাদি (ফরাসি নির্দেশক) নামে অভিহিত করত।

৫০৪ হিজরি সনে (১১১০ খ্রিষ্টাব্দে) বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের সীমানা উত্তরে বৈরুত থেকে দক্ষিণে জাফা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপকূলীয়

অঞ্চল থেকে ভেতরের দিকে রাজ্যটির সীমানা ছিল ফিলিস্তিনের আল-কুদস নগরী পর্যন্ত। অর্থাৎ বৈরুত, সিডন, আক্কা, হাইফা, জাফা, লুদ ও রামলার মতো বেশ কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নগরী সাম্রাজ্যটির অধীনে ছিল। তবে রাজ্যটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পবিত্র নগরী আল-কুদস। নিকট ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যটির পরিধি আরও বিস্তৃত হবে এবং সুর ও আসকালান নগরীর পাশাপাশি নেগেভ (Negev) মরুভূমি অঞ্চল রাজ্যটির অন্তর্ভুক্ত হবে। পরবর্তী ইতিহাস আলোচনায় আমরা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করব।

২. ত্রিপোলি রাজ্য (Country of Tripoli)

ক্রুসেড রাজ্যগুলোর মধ্যে সবার শেষে ৫০৩ হিজরি সনে (১১০৯ খ্রিষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিপোলি রাজ্য। রাজ্যটির নেতৃত্বে ছিলেন রেমন্ড-পুত্র বারট্রাম। অবশ্য পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রথম দিকে রাজ্যটি দু-ভাগে বিভক্ত ছিল। ত্রিপোলি ও ব্যাবলস ছিল বারট্রামের নিয়ন্ত্রণে আর ইরকা ও তারতুস ছিল উইলিয়াম জর্ডানের শাসনাধীন। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে একপর্যায়ে উইলিয়াম জর্ডানের রহস্যজনক মৃত্যু হয়![৭৩৬] মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, উইলিয়ামকে সরিয়ে দিয়ে পুরো রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার লক্ষ্যে বারট্রামই এই হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। যাই ঘটে থাকুক, এভাবে ত্রিপোলি রাজ্য একক-অবিচ্ছিন্ন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজ্যটির সীমানা ছিল উত্তরে (বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত) তারতুস নগরী এবং দক্ষিণে লেবাননের ব্যাবলস নগরী পর্যন্ত। স্বভাবতই রাজ্যের ঘাঁটি ও মূলকেন্দ্র ছিল ত্রিপোলি নগরী।

৩. এন্টিয়ক রাজ্য (Principality of Antioch)

এন্টিয়ক রাজ্যের শাসনভার ছিল নরম্যান সেনাপতি টেনক্রেডের হাতে। রাজ্যটি বিস্তৃত হয়ে দক্ষিণে বানিয়াস নগরী এবং উত্তরে কিলিকিয়া অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। পূর্ব দিকেও এন্টিয়ক রাজ্য যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করে এবং আলেপ্পোর উচ্চ অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এন্টিয়ক বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল ইতালিয়ান নরম্যান গোষ্ঠীয়।

---

৭৩৬. Albert d' Aix p. 669 & Foucher de Chartres, p. 470.

৪. এডেসা রাজ্য (Country of Edessa)

প্রতিষ্ঠাকালের বিবেচনায় ক্রুসেড রাজ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী রাজ্য ছিল এডেসা।[৭৩৭] এ সময় রাজ্যটির শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বল্ডউইন ডি বুর্গ। ফুরাত নদীর তীরবর্তী বর্তমান দক্ষিণ তুরস্ক ও উত্তর সিরিয়ার বিভিন্ন নগরী এডেসা রাজ্যভুক্ত ছিল। মূল এডেসা নগরী ছাড়াও রাজ্যটির আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নগরী হলো সুমাইসাত (Samosata), সারুজ (Suruj) ও আলবেরা (Birecik)। এ ছাড়াও ছিল তিল-বাশির নগরী; যার প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল বল্ডউইনের পর এডেসা রাজ্যের সর্বাধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি জোসেলিন ডি কার্টেনির হাতে।

এভাবেই ইসলামি বিশ্বের বক্ষমূলে চার-চারটি ক্রুসেড কাঠামো মজবুত অবস্থান গড়তে সক্ষম হয়। পরবর্তী দশকের পর দশক রাজ্যগুলো এভাবেই দৃঢ়তার সঙ্গে টিকে ছিল, যেমনটি পরবর্তী ইতিহাস আলোচনায় আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে।

---

৭৩৭. একনজরে ক্রুসেড রাজ্য-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠকাল হলো—

১. এডেসা রাজ্য : রবিউল আউয়াল ৪৯১ হিজরি/ ফেব্রুয়ারি ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

২. এন্টিয়ক রাজ্য : রজব ৪৯১ হিজরি/ জুন ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য : শাবান ৪৯২ হিজরি/ জুলাই ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৪. ত্রিপোলি রাজ্য : জিলহজ্জ ৫০২ হিজরি/ জুলাই ১১০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

[অনুবাদক]



মানচিত্র নং-২২

৫০৩ হিজরি সনে/১১১০ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেড রাজ্যসমূহ

[দুই]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এতক্ষণ আমরা যে পরিস্থিতি তুলে ধরলাম, তা সর্ববিচারেই বর্তমান ফিলিস্তিন-পরিস্থিতির চেয়ে অধিক শোচনীয় ও পীড়াদায়ক ছিল। যেমন :

১. ক্রুসেড আগ্রাসনের দিনগুলোতে সংকটময় পরিস্থিতি কেবল একটি রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চার-চারটি ক্রুসেড রাজ্য।

২. সে সময় জবরদখল কেবল ফিলিস্তিন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া ও তুরস্ক একসঙ্গে ক্রুসেড আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল।

৩. ক্রুসেড আগ্রাসন সংক্ষিপ্ত সময় নয়; দীর্ঘ দুইশ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

৪. বর্তমানে ফিলিস্তিনি নগরীগুলোতে যে দমন-নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, তার তুলনায় তৎকালে অধিকৃত ইসলামি নগরীগুলোতে চালানো গণহত্যার ভয়াবহতা ছিল অনেক গুণ বেশি।

৫. তদ্রূপ আমাদের যাপিত কালের তুলনায় সে কালের মুসলমানদের বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার মাত্রাও ছিল অধিক। আমরা যদি কেবল সিরিয়ার

দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব যে, ক্রুসেড আগ্রাসনের যুগে সিরিয়া আলেপ্পো, হিমস, দামেশক, হামা, শাইজার, বানিয়াসসহ অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

যদিও তখনকার পরিস্থিতি এখনকার তুলনায় এমন ভয়াবহ ছিল; তবুও পরবর্তী ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে আমরা প্রত্যক্ষ করব যে, সেকালের মুসলমানরা বেশ কিছু সময় পরে হলেও বিরাজমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

আর তাই আমাদের বর্তমানের সংকট যেহেতু সে তুলনায় কম জটিল, তা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি ও উত্তরণও আল্লাহর ইচ্ছায় সহজতর হবে। অবশ্যই দীর্ঘ রজনীর আঁধার ভেদ করে সৌভাগ্যের সুহাসিনী ভোর উদ্ভাসিত হবে। ইতিহাস আমাদের এ আস্থাই জোগাচ্ছে।

[তিন]

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, ক্রুসেড আগ্রাসনের সমকালীন মুসলিম প্রজন্ম কিছু চিহ্নিত অন্যায় নিয়মিত করে যাচ্ছিল। সেসব অন্যায়ের খেসারত পরবর্তী সময়ে কেবল তাদেরই দিতে হয়নি, দিতে হয়েছিল দীর্ঘ সময় ধরে পরবর্তী কয়েক প্রজন্মকে।

উদাহরণস্বরূপ ক্রুসেডাররা ত্রিপোলি অবরোধ করার পর সমকালীন মুসলিম প্রজন্ম অবরুদ্ধ নগরীটির সহায়তায় অগ্রসর হতে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছিল। অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়েছিল সাত বছর; কিন্তু কারও পক্ষ থেকে ন্যূনতম উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। এরপর ত্রিপোলির পতন হয়েছিল এবং সেই পতনকাল দীর্ঘায়িত হয়েছিল পরবর্তী একশ পঁচাশি বছর! অর্থাৎ, এক প্রজন্মের উদাসীনতার দায়ভার বহন করতে হয়েছিল পরবর্তী ছয়-সাত প্রজন্মকে। এখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি—ক্ষেত্রবিশেষে একটি অন্যায় এমন ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে যে, মূল অন্যায়ের ক্ষতি ও প্রভাবের তুলনায় সৃষ্ট পরিণতির ক্ষতি ও প্রভাব হয় অনেক গুণ বেশি। আর তাই কখনোই কোনো অন্যায়-অপরাধকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। ত্রিপোলির পতনকালে তৎকালীন মুসলমানরা হয়তো মনে করেছিল যে, এই দুর্যোগ সর্বোচ্চ এক-দুই বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু এর পরিণতি কতটা বিস্তৃত হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চারিত একটি শব্দের পরিণতিও অনেক ভয়াবহ হতে পারে। তাহলে আচরণগত একটি অন্যায় বা অন্যায়ের পর অন্যায় করে যাওয়ার পরিণতি হতে পারে কতটা ভয়াবহ! নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ»

একজন ব্যক্তি কখনো এমন শব্দও বলে ফেলে, যা তার দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নয়; অথচ এর কারণে সে সত্তর বছরের দূরত্ব পরিমাণ জাহান্নামের নিম্নদেশে পতিত হয়।[৭৩৮]

[চার]

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রিজওয়ান ও জাওলির মতো কিছু কিছু মুসলিম নেতা ক্রুসেডারদের সঙ্গে কলঙ্কজনক পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ও করেছিল। একসময় তারা মনে করেছিল যে, নিজ অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সামরিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারলেই মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করা যাবে। এর পর দ্রুতই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, ক্রুসেডাররা পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং প্রথম সুযোগেই সেসব মুসলিম নেতার বিরুদ্ধে চলে গিয়ে তাদের অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে। একসময় তাদের মূল্য ছিল, তাই ক্রুসেডাররাও তাদের কাজে লাগিয়েছিল; এখন আঞ্চলিক রাজনীতির বাজারে তাদের মূল্য নেই, তাই ধরে রেখে কোনো লাভও নেই! আমরা দেখেছি, টেনক্রেড রিজওয়ানের সঙ্গে মিত্রতা ও অঙ্গীকারের কথা কেবল অস্বীকারই করেননি; সসৈন্য আলেপ্পো পৌঁছে গিয়ে নগর অবরোধ করেছেন এবং অনবরত গোলা নিক্ষেপের পাশাপাশি পানাহারদ্রব্য সরবরাহের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি রিজওয়ানকে চূড়ান্ত অপদস্থ করে জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করেছেন এবং সকলের সামনে উপহাস ও লাঞ্ছনার পাত্রে পরিণত করেছেন!

৭৩৮. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২৩১৪, ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদিস নং ৩৯৭০, ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭২১৪, ইমাম ইবনে হিব্বান আল-বুস্তি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৭০৬।

এ জাতীয় নির্বোধ নেতারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা দূরে থাক, কখনো চোখ মেলেও তাকায়নি এই শাশ্বত সত্যের প্রতি—

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করতে চায়, (সে জেনে রাখুক) সমস্ত মর্যাদা আল্লাহরই হাতে। [সুরা ফাতির : ১০]

আমরা তাদেরকে বলব, আল্লাহর কুরআনে ও নবীজির সুন্নাতে যদি আপনাদের শিক্ষাগ্রহণের কিছু না থাকে, তাহলে অন্তত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন! রিজওয়ান ও জাওলিদের এই সুকরুণ পরিণতি তো বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; সুন্নাতুল্লাহ ও আল্লাহ তাআলার শাশ্বত রীতি; বারবার বহুবার ঘটমান অনিবার্য বাস্তবতা!

[পাঁচ]

এই চরম দুর্যোগকালে শাম অঞ্চলের শাসকবর্গ যখন এরূপ পরাভব অবস্থান গ্রহণ করেছিল, তখন অবশ্যই আমরা এ প্রশ্ন তুলতে পারি যে, শামের আলিমসমাজ এ সময় কোথায় ছিলেন?!

তারা অনেকটাই দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন। বরং সুদীর্ঘকাল ব্যাপ্ত এই সংকটের পুরোটা সময় কোথাও এমন কাউকে পাওয়া যায়নি, যিনি জিহাদের ডাক দেবেন, গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলবেন কিংবা ডাক দেবেন স্বাধিকার আন্দোলনের; না দামেশকে, না আলেপ্পোতে, না অন্য কোনো এলাকায়!

আলিমগণ তখন কোথায় ছিলেন?!

প্রকৃত বাস্তবতা আমরা পূর্বেও তুলে ধরেছিলাম যে, শামে সেলজুক শাসনের পূর্বে উবায়দিদের দখলদারিত্বের সময় পুরো শাম অঞ্চলকে আলিমশূন্য করে ফেলা হয়েছিল। প্রচণ্ড আক্ষেপের বিষয় হলো, পরবর্তী সময়ে শামে সেলজুকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শুরুতে তুতুশ বিন আলপ আরসালান এবং তারপর তার দুই পুত্র রিজওয়ান ও দাক্কাকের শাসনামলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হলেও শামের নগরীগুলোর অভ্যন্তরে শিয়া ইসমাইলি-বাতিনি গোষ্ঠীর ব্যাপক অস্তিত্ব রয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে আলেপ্পো ও দামেশকের কথা।

আমরা পূর্বে দেখেছি, আলেপ্পোতে কীভাবে শিয়ারা প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেখানকার শাসক রিজওয়ানকে বাগে এনেছিল। এটি কিন্তু এক আলেপ্পোর চিত্র ছিল না। দামেশকেও ছিল একই পরিস্থিতি! হ্যাঁ, আলেপ্পোতে রিজওয়ান যেভাবে শিয়া ইসমাইলি সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি ও অনুকম্পা প্রকাশ করেছিলেন, দামেশকে তেমনটি ছিল না; কিন্তু দামেশকে সহানুভূতির পরিবর্তে ছিল শিয়া ইসমাইলিদের প্রতি ভীতি ও কাপুরুষতা। আর তাই অবস্থান ভিন্ন হলেও ফলাফল ও পরিণতির বিচারে আলেপ্পো ও দামেশকের পরিস্থিতি ছিল অভিন্ন। গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র ও কূটচালে দিনে দিনে দামেশকে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল দুষ্ট ইসমাইলি সম্প্রদায়। তাদের অনাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে মুসলিম শাসকগণ তাদেরকে সমীহ করে চলত এবং এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির পরিবর্তনে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করত না। ইসমাইলি নেতারা দামেশকের প্রশাসনে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তুগতেকিনের মতো শাসকও তাদের মোকাবিলা করতে পারেননি; বরং তারা যখন সুরক্ষিত নিরাপত্তার মাঝে বসবাসের জন্য বানিয়াস দুর্গের অধিকার দাবি করেছিল, তখন তিনি তাদের দাবি মেনে নিয়ে তাদেরকে দুর্গটির অধিকার প্রদান করেছিলেন। অথচ তুগতেকিনের জিহাদ অনুরাগ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় প্রবল আগ্রহের গুণ ছিল সুবিদিত।[৭৩৯]

তবে তিক্ত বাস্তবতা হলো, দামেশকের অভ্যন্তরে তখনও যেসব সুন্নি আলিম অবশিষ্ট ছিলেন, তাদের না সত্য উচ্চারণ ও দ্বীনি শিক্ষাদানের সামর্থ্য ছিল, না সময়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে নসিহত ও পথ প্রদর্শনের সাহস ছিল। শামে যখন শিয়া বাতিনি আহ্বায়ক বাহরামের আধিপত্য প্রবল হতে থাকে, তার অনাচার ও ভ্রান্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সুন্নি আলিমগণ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?! ঐতিহাসিক ইবনুল কালানিসি রহ. তৎকালীন আলিমদের অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—

৭৩৯. দেখুন: আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৩৫-২৩৬।

"আলিম-উলামা, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও সুন্নি জনগণের হৃদয়জগৎ যেন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তারা বন্দিত্ব ও মৃত্যুর ভয়ে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।"[৭৪০]

হায়!

আলিম যদি ভয় পেয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়, কী হবে পরিণতি!

আলিম যখন অজুহাতে হাত গুটিয়ে নেয়, কী হবে সমাজের!

আলিম যদি পার্থিব মোহে বিকিয়ে দেয় নিজের-সকলের ধর্ম, তাহলে ...!

সম্ভবত এই বিষয়টি অর্থাৎ আলিমসমাজের নীরবতা, মৃত্যুভীতি ও জীবনের মায়া ছিল ক্রুসেডকালের সার্বিক বিপর্যয়ের অন্যতম কার্যকারণ। শুধু ক্রুসেড আগ্রাসনকাল নয়; মুসলিম উম্মাহর যেকোনো পতনকালের দুর্যোগ-দুর্বলতার অন্যতম কারণ এটি। আলিমসমাজ তো নবীগণের উত্তরাধিকারী, তারাই তো উম্মাহর প্রকৃত কান্ডারি। তারাই যদি বিভ্রান্ত হন, পথ হারান, দমে যান, সরে যান; কীভাবে আশা করা যাবে জাতির কল্যাণ, উম্মাহর হিদায়াত?!

[ছয়]

এই বিশ্লেষণ ও ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি ইসলামি ভূখণ্ডের শাসকবর্গ ও আলিমসমাজ সে সময় কতটা নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তৎকালীন মুসলিম জনসাধারণকে দায়মুক্ত মনে করে ক্ষমা করে দেব!

কোথায় ছিল শামের জনগণ?!

কোথায় ছিল আলেপ্পো, দামেশক, হামা ও হিমসের জনতা?!

কোথায় ছিল বৈরুত, সিডন, হাইফা ও আক্কার মুসলিম জনসাধারণ?!

যাদের কেবল দ্বীন ও ধর্ম, মর্যাদা ও সম্ভ্রমই ভূলুণ্ঠিত হয়নি, আক্রান্ত হয়েছিল ধনসম্পদ, সহায়সম্পত্তি, বাসভূমি-ভূখণ্ড সবকিছু, কোথায় ছিল তারা?!

যে জনসাধারণ এমন লাঞ্ছনা বরণ করেও চুপ করে সয়ে যায়, তাদের তো বেঁচে থাকার অধিকারই নেই!

---

৭৪০. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৫১।

জনগণ ছাড়া একজন শাসকের কী শক্তি আছে? রিজওয়ানের মতো অথর্ব শাসকগণ কীভাবে ক্রুসেডারদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিল?! তারা যুদ্ধের ময়দানে একাই লড়ত, নাকি সঙ্গে থাকত বিশাল বাহিনী; বাহিনীর পেছনে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা দায়িত্বে থাকত রাজ্যের আমির-উজিরগণ; সঙ্গে থাকত আলিম-উলামা, কাজি-ফকিহ ও শিক্ষকসমাজ; আর সবার পেছনে সমর্থন জোগাতে থাকত ব্যবসায়ী, কৃষক ও চাকুরিজীবী-সমাজ?! এদের প্রত্যেকের ঘরে কি কন্যা-জায়া-জননী ছিল না?! তাদের একজনও কি শোনাতে পারেনি সত্যের বাণী কিংবা ন্যূনতম এই বিস্ময়ধ্বনি, 'কেন আপনারা এমন করছেন?!'

সমস্যা ও সংকট ছিল সর্বজনীন; অন্যায় ছিল সম্মিলিত। এমন ব্যাপক জাতিগত দুর্যোগ ও ভয়াবহ বিপর্যয় তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সর্বোচ্চ প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের সাধারণ দিনমজুর পর্যন্ত জনগণের সকল স্তরে ব্যাপক অবহেলা ও শিথিলতা দেখা দেয়। অবশ্য আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত সীমিত ব্যতিক্রম সব সময়ই থাকে; তবে তারা যে নিতান্তই অল্প!

[সাত]

পেছনের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখেছি, উবায়দি সাম্রাজ্য চলমান ইস্যু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি বিক্রিই করে দিয়েছিল। রামলাকেন্দ্রিক তিনটি প্রচেষ্টার পর তাদের ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার বা ন্যূনতম নিজেদের পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্যোগ পুরোপুরি থেমে যায়। অবশ্য শিয়া উবায়দি প্রশাসনের কাছ থেকে এমন আচরণই প্রত্যাশিত ছিল! কারণ, ইতিপূর্বে আমরা আল-কুদস ও আক্কা নগরীর প্রতিরক্ষায় তাদের পরাভব মানসিকতা লক্ষ করেছি, দেখেছি ত্রিপোলি-পরিস্থিতিকে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে কাজে না লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে। আমরা আরও প্রত্যক্ষ করেছি আলেপ্পো ও দামেশকে শিয়া ইসমাইলি আলিমদের অবসন্নতা; বরং ইসলামি ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ইসমাইলি বাতিনি চক্রের চরম ভয়ংকর সন্ত্রাসী আচরণ!

এই সবকিছু এ কথাই প্রমাণ করে যে, ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারী বা ভ্রষ্ট চিন্তা লালনকারীরা কখনোই দ্বীনের কল্যাণে কাজ করবে না। নিঃসন্দেহে

আল্লাহর দ্বীন অতি মর্যাদাশীল, মহা মূল্যবান। যুগে যুগে নিষ্ঠাবান ও সচেতন ব্যক্তিরাই বহন করবে দ্বীনের মহান পতাকা।

[আট]

ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেড আগ্রাসনের এই প্রাথমিককালের ইতিহাসে চারিদিকে যখন শুধুই নিকষকালো অন্ধকার, তখনও কিন্তু আলো একেবারে হারিয়ে যায়নি! দুর্যোগের ঘনঘটার মাঝেও হঠাৎ হঠাৎ আমরা এমন কিছু আলোর বিচ্ছুরণ প্রত্যক্ষ করেছি, যা প্রমাণ করে যে, মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে কল্যাণ কখনো বিলুপ্ত হয়ে যায় না, সাহস ও উদ্যম কখনো সমূলে বিলীন হয়ে যায় না। কখনো কখনো হয়তো দুর্বল ও স্তিমিত হয়ে যায়; কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন কখনো হবে না। জীবনপ্রদীপ নিভু নিভু অবস্থায় মুমূর্ষু সুকমান বিন উরতুকের ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় ছুটে চলা এর অন্যতম প্রমাণ। বালিখের যুদ্ধেও আমরা দেখেছি আল্লাহর জন্য লড়াই ও আত্মত্যাগের একঝলক বিচ্ছুরণ। দামেশকের আমির তুগতেকিনও অব্যাহত সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন ক্রুসেডারদের মোকাবিলায়। তুগতেকিনের নেতিবাচক কিছু দিক হয়তো ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন জিহাদ-অনুরাগী, কল্যাণ-কর্মে অগ্রগামী জননন্দিত একজন শাসক। শিয়া ইসমাইলিদের বিষয়ে নীরবতা, তাদেরকে বানিয়াস দুর্গ প্রদানের মতো বড় বড় বিচ্যুতিসহ কিছু স্খলন তার ছিল; কিন্তু এজন্য তিনি অনুতপ্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্র ও পরবর্তী শাসক বুরি বিন তুগতেকিনকে সুন্নি আলিমগণের মর্যাদা সমুন্নত করার এবং জিহাদকে আঁকড়ে ধরার অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।[৭৪১]

দুর্যোগকালের এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তগুলো এমন নির্ভেজাল-কার্যকর দৃষ্টান্ত ছিল না, যার হাত ধরে পরিবর্তন ও বিজয় আসতে পারে। তবে এগুলো ছিল এমন উত্তম দৃষ্টান্ত, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পতাকা সমুন্নত করে গেছে এবং ভিত গড়ে দিয়ে গেছে এমন পূর্ণ নিষ্ঠাবান ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের, যার হাত ধরে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় সূচিত হবে।

---

৭৪১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৮।

[নয়]

একের পর এক মুসলিম নগরীর পতন এবং হাজার-হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যার এসব ঘটনা নিঃসন্দেহে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। তবে এই দুর্যোগই আমাদের এবং সে যুগের জনগণের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচিত করে দিয়েছে। একশ্রেণির শাসক জনগণকে বোকা বানাতে চায়। তারা নিজেদের বাহিনী ও ক্ষমতা, নিকটজন ও আস্থাভাজন এবং প্রচারমাধ্যমকে পুঁজি করে সকলকে বোঝাতে চায় যে, তারা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, কৌশলী রাজনীতি ও দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন করছে এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে, ধর্মের জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও জোর গলায় উচ্চারণ করে! কিন্তু যখন এ ধরনের বেদনাদায়ক ও বিপর্যয়কর দুর্যোগ সংঘটিত হয়, তখন তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়, বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যায়। জনগণ জানতে পারে—কে ধর্মপ্রেমী আর কার সবকিছু ভণ্ডামি! সকলের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়—কে ফিরেশতা চরিত্রের ইনসান, আর কে মানুষরূপী শয়তান! দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের বেদনাদায়ক অনেক প্রভাবের মাঝে সম্ভবত এটিই সবচেয়ে কল্যাণকর প্রভাব ও কার্যকরী শিক্ষা। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন—

﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾

আর তা এজন্য যে, আল্লাহ অপবিত্র (লোকদের)-কে পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেবেন। [সুরা আনফাল : ৩৭]

[দশ]

চলমান ঘটনাপ্রবাহ ও পরিস্থিতির আলোকে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে খুব শীঘ্রই কল্যাণের আলো উদ্ভাসিত হবে এবং তা উত্তর ইরাক থেকে আরও নির্দিষ্ট করে বললে মসুল থেকেই উদ্ভাসিত হবে। ইতিপূর্বে আমরা যেমন মসুল থেকে কারবুগা ও জাকারমিশের নেতৃত্বে কিছু প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেছি, শীঘ্রই আমরা প্রত্যক্ষ করব মওদুদ বিন তুনতেকিনের নেতৃত্বে আরও মহান কিছু

কর্মপ্রচেষ্টা। তারপর দৃশ্যপটে একে একে আবির্ভূত হবেন ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। তাদের হাত ধরে আবারও সূচিত হবে জাতির সগৌরব বিজয়ের ইতিহাস। উম্মাহর এই সাহসী সন্তানগণ সকলেই আত্মপ্রকাশ করবেন উত্তর ইরাক থেকে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে সুনির্দিষ্ট কী কারণে উত্তর ইরাক অঞ্চল এমন কল্যাণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক হতে পেরেছিল। তবে যে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণটির প্রতি আমরা এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, তা হলো—পরিবর্তন অনেক সময় ঘটনাপ্রবাহের অনেক দূরের কোনো স্থান থেকেও সংঘটিত হতে পারে। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে আমরা দেখছি—ক্রুসেডারদের হিংস্র আগ্রাসনে যখন শাম, ফিলিস্তিন ও এশিয়া মাইনর অঞ্চল ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, তখন পরিবর্তনপ্রচেষ্টা সূচিত হয়েছে উত্তর ইরাক থেকে; অথচ তা অধিকৃত অঞ্চল থেকে বহু দূরে অবস্থিত! তাতারিদের ইতিহাসে আমরা অধ্যয়ন করেছি—তাতারিদের প্রলয়ংকরী তাণ্ডবে যখন একের পর এক ইসলামি নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল, তখন প্রতিরোধপ্রচেষ্টা শুরু হয়েছে মিশর থেকে; অথচ তাতারিরা মিশরে প্রবেশই করেনি! আন্দালুসের ইতিহাসে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি—আন্দালুসে যখন ইসলামের নাম-নিশানাই মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন আন্দালুস-পরিস্থিতির সংস্কার সাধিত হয়েছে কুরাইশি ইগল নামে খ্যাত আবদুর রহমান আদ-দাখিলের হাত ধরে; অথচ নিঃসঙ্গ এই উমাইয়া রাজপুত্র এসেছিলেন সুদূর দামেশক থেকে! এমন দৃষ্টান্ত আরও আনা যেতে পারে।[৭৪২]

আর তাই এ জাতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময় আমাদের কর্তব্য—বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন-দৃষ্টি কেবল আক্রান্ত জনপদে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র ইসলামি বিশ্বজুড়ে দৃষ্টি প্রসারিত করা। তখন অবশ্যই আমরা দেখা পাব আলো ও আলোকবর্তিকার! এটিই ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন।

* * *

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

---

৭৪২. বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন : মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত—*তাতারিদের ইতিহাস* ও *আন্দালুসের ইতিহাস*। [অনুবাদক]

নোট

কেন পড়বেন 'ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস'

- ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস কেবল ইসলামি ইতিহাস নয়; বরং মানবেতিহাসেরই একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের বিবরণ। ইসলামি ইতিহাসের এক-সপ্তমাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এই ইতিহাস।
- ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানব ক্রুসেড যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস।
- ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা বিবাদমান পক্ষগুলোর নীতি-আদর্শ পর্যবেক্ষণ করতে পারব; উপলব্ধি করতে সক্ষম হব মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ইউরোপীয়দের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও পটভূমি।
- আমাদের বর্তমান কালের এবং আগামী পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যের কার্যকারণসমূহ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চিত করেই যথেষ্ট সহায়ক বিবেচিত হবে।

—ড. রাগিব সারজানি

B0061
ISBN
9 789848 012536

মাকতাবাতুল হাসান